

প্রথম প্রকাশ
২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৮৩

প্রকাশক
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ-৬৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রক :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিণ্টিং
১/১ বি, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০০৬

প্রচ্ছদ :
খালেদ চৌধুরী

আমার প্রথম শিক্ষাগুরু

ঠাকুরমা

প্রয়াত ইন্দুবালা মজুমদার

স্মরণে

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনা সংগ্রহ
(১ম ও ২য় খণ্ড)
সোমেন চন্দের বন্যা
বাংলা ব্যকরণ অভিধান
বন্দীহত্যা বন্দীমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ
রাজনু
কিশোর কথাসরিৎসাগর
বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা
ন্যাংটা রাজার কীর্তি
রবীন্দ্র বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী
সাণ্ডারল্যাণ্ড ও শৃঙ্খলিত ভারত
মার্কসবাদের মণিমুক্তো

নিবেদন

'এক্ষণ' পত্রিকায় রামগোপাল সান্যালের পুনর্মুদ্রিত হরিশ জীবনী পড়ে হরিশচন্দ্র সম্পর্কে আমার কৌতূহল জাগ্রত হয়। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত হরিশের ইংরেজী রচনা সংকলন সেই কৌতূহলে নতুন মাত্রা যোগ করে। এমন সময় অগ্রজপ্রতিম সুজিত আচার্য হরিশের নির্বাচিত রচনা সংকলন নতুন করে প্রকাশ করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। সংবাদপত্রে এই মর্মে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়। নানা কারণে সে চেষ্টা অবশ্য সফল হয় নি।

বাংলা দেশের রাজনৈতিক চেতনার ইতিহাসে হরিশচন্দ্রের ভূমিকার যথাযথ পর্যালোচনা প্রচলিত ইতিহাস গ্রন্থগুলির মধ্যে আমি দেখতে পাই নি। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারও সে কথা স্বীকার করেছেন। আমাকে লেখা তাঁর পত্রের প্রাসঙ্গিক অংশ ভিন্ন পাতায় উদ্ধৃত করেছি। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও আমাকে হরিশচন্দ্রের জীবন ও ভাবনা বিষয়ক গ্রন্থ-রচনায় উৎসাহ দিয়েছিলেন। দীর্ঘ ছয় সাত বৎসর পরিশ্রমের পর হরিশ সম্পর্কে নানা তথ্য আমি সংগ্রহ করি। পাণ্ডুলিপি পাঠ করে প্রকাশক বন্ধু মজহারুল ইসলাম সরকারী অনুদানের জন্য জমা দেবার পরামর্শ দেন। ১৯৮২ সালে পঃ বঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর প্রস্তাবিত গ্রন্থের জন্য অনুদান মঞ্জুর করেন।

গ্রন্থটি মুদ্রিত হবার পূর্বে ড. অরুণকুমার বসুর আনুকূল্যে 'সমতটে', শ্রীপরিতোষ পালের আনুকূল্যে 'সত্যযুগে', শ্রীঅনুনয় চট্টোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে 'নন্দনে', শ্রীদিব্যজ্যোতি মজুমদারের আনুকূল্যে 'পশ্চিমবঙ্গে' হরিশ সম্পর্কে আমার কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রখ্যাত লেখিকা, আকাশবাণীর বেঙ্গলি স্পোকন ওয়ার্ডের পরিচালিকা শ্রীমতী কবিতা সিংহ হরিশ সম্পর্কে আমার একটি কথিকা প্রচারের সুযোগ করে দেন। এঁদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

তথ্য সংগ্রহ ও গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত ও সাহায্য করেছেন ড. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. মহাদেবপ্রসাদ সাহা, ড দেবীপদ ভট্টাচার্য, ড. ক্ষেত্র গুপ্ত, ড. রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, ড. মঞ্জু দত্তগুপ্ত, ড. প্রদীপ সিংহ, অঞ্জন চক্রবর্তী, প্রবীর সামন্ত, তাপস হালদার, তাপস ঘোষ, সোমনাথ মজুমদার, সৌম্যেন্দ্র বসু, চিত্ত মণ্ডল, নিমাই ঘোষ, দয়াময় বিশ্বাস, অমরনাথ করণ, সুব্রত রাহা, আজিজুল হক, প্রণব বিশ্বাস, বদরুল হাসান। এঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বর্ধমান জেলা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, বিশেষত অগ্রজপ্রতিম শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার ও গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুটের গ্রন্থাগারকর্মীদের সাহায্যের জন্যও আমি কৃতজ্ঞ।

যেহেতু হরিশচন্দ্র ইংরেজী ভাষাতেই প্রবন্ধ রচনা করেছেন এবং তাঁর রচনাকর্ম দুষ্প্রাপ্য, তাই আমি ইংরেজী উদ্ধৃতি একটু বেশি ব্যবহার করেছি, এই আশায় যে এর ফলে পাঠক তাঁর মূলরচনা ও রচনাশৈলীর সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হতে পারবেন।

দিলীপ মজুমদার

৭২, পর্ণশ্রী পল্লী
কলিকাতা—৭০০ ০৬০
২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৮৩

SELECTIONS
FROM THE
WRITINGS
OF

HURRISH CHUNDER MOOKERJI

COMPILED FROM
THE HINDOO PATRIOT

EDITED BY
NARES CHANDRA SEN-GUPTA, M. A., B. L.

CALCUTTA :
PRINTED BY :
T. C. DASS AT
THE CHERRY PRESS
Dhurrumtolla Street

নরেশ সেনগুপ্ত সম্পাদিত হরিশের ইংরেজী রচনা সংকলনের টাইটেল পেজ

Inscriptions on the memorial obelisk of Hurrish Chunder Mookerji at Bhowanipur.

SACRED TO THE MEMORY

OF

HURRISH CHUNDER MOOKERJI

Who, as Editor of *The Hindoo Patriot*,
As a guiding spirit of the British Indian Assocition,
And in connection with various movements of his time,
Rendered conspicuous Services to the country
By his able and disinterested discussion of public Affaris;
Who waged war against wrong and Vindicated Justice
With a rare courage, Honesty and Independence,
Who in a critical Period of Transition
Gave counsels of wisdom to the Rulers and interpreted their policy,
Who was a Father to the Aggrieved Poor
And never denied them any personal help in his power
Who lived a life of
Self-Sacrifice and heroic Devotion to Duty;
Who was at once
A Tribune of the People and a pillar of the Empi
This monument is erected
By his grateful countrymen with funds raised
By public subscription.

Born 1824 }
Died 1861 } **at Bhowanipur, Calcutta.**

স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

যিনি "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রিকার সম্পাদক ও "বৃটিশ ইণ্ডিয়ান" সভার অধিনায়ক ছিলেন এবং স্বসমকালে বহুবিধ বিষয়ের আন্দোলন প্রসঙ্গে দক্ষতা সহকারে ও নিঃস্বার্থভাবে বিচার-বিতর্ক দ্বারা স্বদেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন ;

যিনি অসামান্য সাহস, সত্যনিষ্ঠা ও স্বাধীনতার সহিত অন্যায় পক্ষের পরাজয়ে প্রবৃত্ত হইতেন ও ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করিতেন ;

যিনি বিদ্রোহসঙ্কুল সংকট সময়ে রাজপুরুষগণকে সৎপরামর্শ দিয়াছিলেন ও রাজনীতির প্রকৃত অভিপ্রায় সাধারণের গোচর করিয়াছিলেন ;

যিনি উৎপীড়িত দীন দরিদ্রের পিতৃ স্বরূপ ছিলেন এবং তাহাদের সহায়তা করিতে সাধ্য পক্ষে কখনই বিমুখ হইতেন না ;

যিনি স্বীয় জীবনে স্বার্থত্যাগ ও কর্তব্য পরায়ণতার উজ্জ্বল আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন ;

যিনি একাধারে প্রজাবৃন্দের শরণ্য পৃষ্ঠপোষক ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবলম্বনীয় স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন ;

সেই মহাপুরুষের স্মৃতি চিহ্ন

এই কীর্তিস্তম্ভ

তদীয় চিরকৃতজ্ঞ স্বদেশবাসিগণ কর্ত্তৃক সাধারণের প্রদত্ত অর্থ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইল

কলিকাতা ভবানীপুরে

সন ১২৩১ সালে তাঁহার জন্ম ও

সন ১২৬৮ সালে মৃত্যু হয়।

হিন্দু পেট্রিয়টের ভূতপূর্ব সম্পাদক

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী

রামগোপাল সান্ন্যাল প্রণীত ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ।

সূচী

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

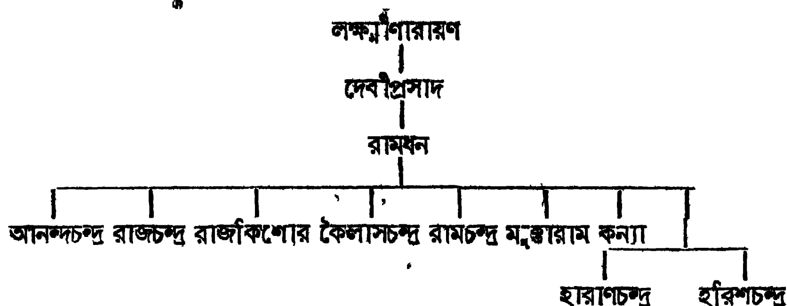
চতুর্দশ অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

জীবনবৃত্ত

১৮২৪ সালের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল) কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে 'রাঢ়ীয়শ্রেণীয় ব্রাহ্মণকুলে ফুলিয়া কুলীনবংশে' হরিশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রামধন মুখোপাধ্যায় ও মাতার নাম রুক্মিণী দেবী।[১]

হরিশের বংশলতিকা এই রকম ঃ



রামধন তিনটি বিবাহ করেন। প্রথমা পত্নীর গর্ভে আনন্দচন্দ্র, রাজচন্দ্র, রাজকিশোর ও কৈলাশচন্দ্র—এই চার পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে এক কন্যা এবং রামচন্দ্র ও মুক্তারাম নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। রামধনেব তৃতীয়া পত্নী রুক্মিণী দেবী। ইঁনি কলকাতার ভবানীপুরবাসী ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। এঁর গর্ভে দুটি সন্তান জন্মে। কুলীন বংশে হরিশচন্দ্রের জন্ম বলে একদা 'ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকা তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছিল ঃ "A Hindu among the nations, a Brahmin among the Brahmins, and a Foola among the Koolins."[২] হরিশচন্দ্রের উত্তর জীবনে অবশ্য কৌলীন্যের গোঁড়ামি কোথাও দেখা যায় নি।

হরিশের পিতা, পিতামহের পূর্বনিবাস ছিল বর্ধমান জেলার মেমারির উত্তর-পূর্বে তিন ক্রোশ দূরে শ্রীধরপুর গ্রামে [অধুনা বর্ধমান জেলা পরিষদের উদ্যোগে হরিশের নামে একটি রাস্তা ও হরিশ একাডেমী নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে] হরিশের যখন মাত্র ৬ মাস বয়স তখনই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। এদেশের কুলীন সন্তানদের সনাতন প্রথানুসারে তিনি মাতুলালয়েই

প্রতিপালিত হন। হরিশের দুই জন মাতুল—বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ও দেবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের নাম হরিশজীবনীকার উল্লেখ করেছেন।

মাতুলালয়ে হরিশরা অনাদৃত বা উপেক্ষিত ছিলেন—না—মাতুলালয়ের আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য ছিল সে বিষয়ে স্পষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তবে দেখা যায় যে, অত্যন্ত হীনাবস্থায়, দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে দিনাতিপাত করতে হয়েছে হরিশকে। এই সংগ্রামশীল মানসিকতা অবশ্য তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে সহায়ক হয়েছিল। শ্রমনিষ্ঠার শিক্ষাও তিনি এখান থেকেই লাভ করেছিলেন।

পাঁচ বৎসর বয়সে হরিশ স্থানীয় গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় মাতৃভাষা শিক্ষা করেন। সাত বছর বয়সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হারাণচন্দ্রের কাছে তাঁর ইংরেজী অক্ষর পরিচয় হয়। এরপর তিনি ভবানীপুর ইউনিয়ন স্কুলে ভর্তি হন। দারিদ্র্যবশতঃ স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিনা বেতনে পড়ার অনুমতি দেন। ছাত্রাবস্থায় লেখাপড়ার প্রতি তিনি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করেন। বিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে শিক্ষকদের তিনি এমন কঠিন প্রশ্ন করতেন যে তাঁদের সাবধান হয়ে সে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হত। গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন—"An insignificant village school which subsisted on the philanthropy of certain high officials imparted the rudiments of an English education to the man who at a maturer age wrote the English language with the fluency of a native and the strength and vigor of a university man. At school the precocius infant—gave promise of the splendid man. There was not a subject in the carriculum which the youth had not mastered to the extent at least of his tutor's capacity to teach him. It is said that one of his native masters stood in such an awkward dread of his pupil's cross questionings that he was put to the serious necessity of carefully preparing the lessions which he taught and even then there were time in which the boy suggested a more correct analysis of a difficult passage."[৩] তথাপি শিক্ষকদের পতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করার পরেও শিক্ষকের প্রতি তাঁর ভক্তি কেমন অক্ষুণ্ণ ছিল তার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন রামগোপাল সান্যাল, "কিন্তু শিক্ষকগণের প্রতি তাঁহার যে প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল সে শ্রদ্ধা ভক্তি তাঁহার নাম ও পদবৃদ্ধি হইলেও কখন কমে নাই। রেবরেণ্ড পিফার্ড তাঁহার একজন শিক্ষক ছিলেন। একদা বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের বাটীতে সি. পিফার্ডের [কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার পিফার্ড-এর সন্তান] সহিত হরিশের দেখা হয়। পিফার্ডের কথা

শুনিয়া তাঁহার চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। তিনি বাল্যজীবনের কথা স্মরণ করিয়া পিফার্ডের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।"[৫]

বাল্যে হরিশ সাহসী ও বলবান ছিলেন। একদা এক মাতাল গোরা তাঁদের স্কুলের কাছে দোরাত্ম্য শুরু করে এবং স্কুলের কোন কোন ছাত্রের উপর উৎপাত করে। হরিশ অতি দ্রুত অন্যান্য সহপাঠীদের জোটবদ্ধ করে ঘটনাস্থলে যান এবং মাতালটিকে স্থানত্যাগে বাধ্য করেন। এই ঘটনার উল্লেখ করে গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন—"We cite these little incidents as illustrative of the vigor of mind which distinguished the subject of this memoir at an age at which native youths are lost amidst pigeons and play".[৫]

ভবানীপুর ইউনিয়ন স্কুলে হরিশ ৬/৭ বছর পড়াশোনা করেন। তারপর তাঁকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করতে হয়। অনুমিত হয়, এসময়ে মাতুলালয়ের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে, তাছাড়া জ্যেষ্ঠ হারাণচন্দ্রও তখনো কোন কর্মসন্ধান করতে পারেন নি। তাই অর্থোপার্জনের জন্য হরিশকে চাকুরির সন্ধানে প্রবৃত্ত হতে হল। কিন্তু হরিশের মত 'অজ্ঞাতকুলশীলের' পক্ষে চাকুরি জোগাড় খুব সহজসাধ্য ছিল না। ফলে তাঁকে ভিন্ন পথ অবলম্বন করতে হয়। অন্যের দরখাস্ত ইত্যাদি লিখে তিনি পরিবারের ভরণপোষণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। রামগোপাল সান্যাল লিখেছেন ঃ

"Hurish chunder recived a scanty education at school which, adverse circumstances compelled him to leave, at the comparatively early age of fourteen; and that his real education commenced afterwards when he entered the arena of the world. On the 'broad stage of the world', where he afterwards came to play on ever memorable part, be first appeared both as a diligent and laborious student, and an Omedwar, as a candidate for an appointment in the Government or a mercantile office. When he left school in search of an employment, he begged for a common clerkship, but he had the mortification to find his school-passport at his merit ridiculed by the heads of offices. Born of a poor parent, having no influential friend to back him, he at last betook himself to the precarious profession of a writer of petitions, bills and letters, which brought him, no doubt, a stray rupee now and then, but the paltry income derived from this source was not enough for his purpose".[৬]

এই সময়ে তাঁর সাংসারিক অবস্থা কি রকম শোচনীয় ছিল তার বর্ণনা

দিয়েছেন শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। হরিশের ঘনিষ্ঠ জন শম্ভুচন্দ্র এই অবস্থার কথা হরিশের মুখেই শুনেছিলেন। শম্ভুচন্দ্র তাঁর 'মুখার্জীস ম্যাগাজিন' পত্রিকায় ১৮৬২ সালে লিখেছিলেন, "একদিন বর্ষাকালে আকাশ ঘনঘটায় আবৃত, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল, পথে লোক বাহির হইতে পারিতেছিল না। এমন সময়ে হরিশ্চন্দ্রের গৃহে তন্ডুলকণামাত্র ছিল না। ঘরের বাহির হইয়া কোন প্রতিবেশীর বাটীতে যাইয়া পিতলের থালা সম্বলমাত্র বন্ধক দিয়া যে চাউল খরিদ করেন, তাহাও কঠিন হইল! হরিশ মনে মনে কতই দুঃখ করিতে লাগিলেন, এবং অনাহারে ক্লিষ্ট মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন, হঠাৎ ঐ সময়ে তাঁহার দ্বারদেশে একটি সম্ভ্রান্ত জমীদারের মোক্তার উপস্থিত হইলেন। মোক্তারবাবু কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া আসিয়াছিলেন। হরিশকে তিনি ঐ সকল কাগজ ইংরেজীতে অনুবাদ করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং পুরস্কারস্বরূপ দুই টাকা প্রদান করিলেন। হরিশ ঐ দুই টাকা দুই স্বর্ণমুদ্রাজ্ঞানে গ্রহণ করিয়া আহার্যদ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া সে দিনের অন্নকষ্ট নিবারণ করিলেন।"[৭] এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করার জন্য ভাষার উপর দখল সহজ সিদ্ধান্ত। সুতরাং উপরের ঘটনা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে দারিদ্র্যের তাড়নায় বিদ্যালয় ত্যাগ করতে বাধ্য হলেও হরিশ ভাষাচর্চা পরিত্যাগ করেন নি। তাছাড়া, দরখাস্ত ইত্যাদি রচনার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে সম্পাদকীয় কার্যেরও হাতেখড়ি হচ্ছিল তাঁর।

'মাতার অনুরোধে' হরিশকে স্বল্প বয়সে বিবাহ করতে হয়। তাঁর প্রথমা পত্নী মোক্ষদাদেবী, ইঁনি বালী উত্তরপাড়ার গোবিন্দচন্দ্রের কন্যা। প্রথমা পত্নীর গর্ভে 'হরিশের ১৬ বৎসর বয়সের সময়' তাঁর এক পুত্র জন্মে। কিন্তু ঐ পুত্র তিন বৎসর বয়সে 'কালগ্রাসে পতিত হয়'। এরপর তাঁর প্রথমা পত্নীরও মৃত্যু হয়। এর কিছুদিন পরে হরিশ 'মাতা ও মাতুলের অনুরোধে পুনরায় দার পরিগ্রহ করেন।' হরিশের দাম্পত্য জীবনের কোন প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে, হরিশের জীবনীকার রামগোপাল স্যান্যাল ইংরেজী ভাষায় লিখিত জীবনচরিতে এ সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন। রামগোপাল জানিয়েছেন যে তিনি হরিশের সহকর্মী কালীচরণ সোমের মুখে শুনেছেন যে হরিশের পারিবারিক শান্তি ছিল না—"enjoyed very little of domestic peace in his life."[৮] তবে, এজন্য হরিশের পত্নী কতখানি দায়ী তার স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। বরং এক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে তাঁর মাতার ভূমিকার কথা রামগোপাল লিখেছেন। তাঁর বক্তব্য, রুক্মিণীদেবী ঝগড়াটে মহিলা ছিলেন এবং "sometimes outraged the feelings of her son and disturbed the peace of the family."[৯] অথচ রামগোপালের ঐ গ্রন্থে হরিশ সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসুর যে বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে তাতে দেখা যায় রাজনারায়ণের মতে হরিশের মাতা অত্যন্ত দয়ালু মহিলা ছিলেন—নীল আন্দোলনের সময় হরিশের বাড়িতে যে সব কৃষকরা আসতেন তিনি তাঁদের নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াতেন।[১০]

রামগোপালের মতে পারিবারিক অশান্তির ফলে হরিশ মদ্যপানে আসক্ত হন। সেই সঙ্গে অবশ্য রামগোপাল একথাও উল্লেখ করেছেন যে সে সময়ে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে মদ্যপান ছিল একটা সাধারণ রীতি। কালক্রমে এই মদ্যাসক্তি সীমাশাসনের গন্ডীও অতিক্রম করেছিল। রামগোপালের ভাষায় "sometimes in its use he ran into excess"[১১] গিরিশচন্দ্র ঘোষের জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষও বলেছেন যে অত্যাধিক মদ্যাসক্তি তাঁর মৃত্যুর কারণ।[১২] রাজনারায়ণ বসু বলেছেন—একবার হরিশের সঙ্গে যখন তাঁর 'ধর্মতত্ত্বদীপিকা' নিয়ে কথা হচ্ছিল সেই সময়ে, "He told me that he did not know that a man breaks down so early as thirty-five (he was of that age at the time) in Bengal. but his decline is to be attributed more to his free indulgence in the wine cup and his excessive mental exertion, than to the climate of our country."[১৩]

প্রায় ১৪ বৎসর বয়সের সময় হরিশ টলা কোম্পানীর (Messrs Tullub and company) অফিসে মাসিক ১০ টাকা বেতনে বিল লেখকের কাজে নিযুক্ত হন। ঐ কোম্পানী নীলামদার ছিল, 'তাঁহাদিগের অফিস এখনকার (১৮৮৭) করেন্সী আফিসের নিকট সংস্থাপিত ছিল।' কিছুদিন এখানে কাজ করার পরে হরিশ তাঁর বেতনবৃদ্ধির জন্য কোম্পানীর কাছে প্রস্তাব করেন। কিন্তু কোম্পানী সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। হরিশের কাছে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারটি অসম্মানজনক বলে মনে হয়। রামগোপাল লিখেছেন, "With a true Brahminical spirit of self-abnegation which was the leading and by far the most brilliant characteristic in his life, he jostled on and suffered all the miseries and privations of an adverse fortune till providence, in his ineffable mercy, contrived means to relieve his distress."[১৪] রামগোপালের উক্তি যে অত্যুক্তি নয়, আত্মসম্মানবোধ ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা যে তাঁর চরিত্রে সহজাত ছিল তার প্রমাণ আমরা অন্যত্র পাই। রাজা প্রতাপসিংহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানে [হিন্দু পেট্রিয়ট ও হরিশচন্দ্র অধ্যায় দ্রষ্টব্য] অথবা আর্চিবল্ড হিলসের সঙ্গে আপোষহীন সম্পর্কে [নীল বিদ্রোহ ও হরিশচন্দ্র অধ্যায় দ্রষ্টব্য] তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলেছেন যে টলা কোম্পানীর কাজে উৎকোচাদির সুযোগ ছিল। হরিশ যদি অসৎ প্রকৃতির হতেন তাহলে অসৎ উপায়ে তিনি এখান থেকেই অর্থ উপার্জন করতে পারতেন, মাইনে না বাড়ালেও ক্ষতি হত না। কিন্তু সে পথের পথিক হরিশ ছিলেন না। তাই বাধ্য হয়ে তিনি টলা কোম্পানীর কাজ পরিত্যাগ করেন।[১৫]

ফ্রামজি বোমানজী তাঁর হরিশজীবনীতে লিখেছেন যে ১৮৪৮ সালে হরিশ

সৈনিক ব্যয়ের অডিটারের অফিসে [Military Auditor General's office] চাকুরীর লাভ করেন। রামগোপাল সান্যালের বাংলা হরিশ জীবনীতে অবশ্য বলা হয়েছে যে ১৮৪৭ সালে হরিশ এই চাকুরি লাভ করেন। বোমানজী বলেছেন এই অফিসে মাসিক ২৫ টাকা বেতনে যে কেরানীর পদ খালি হয় তাতে নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। হরিশ পরীক্ষা দেন এবং কৃতকার্য হয়ে ঐ চাকুরি লাভ করেন। "This was indeed the turning point of his life."[১৬] এই সময়ে ঐ অফিসে ডেপুটি অডিটর ছিলেন কর্ণেল চ্যাম্পনীজ [Colonels Champneys] ও অডিটার জেনারেল ছিলেন কর্ণেল গোল্ডী [Colonels Goldie]। চ্যাম্পনীজ ও গোল্ডী হরিশের বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতায় আকৃষ্ট হন এবং স্বল্পদিনের মধ্যে তাঁর সুহৃদ ও শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠেন। কৃষ্টদাস পাল বলেছেন যে চ্যাম্পনীজ ও গোল্ডী— "discovered his latent powers, intelligence, and extraordinary business capacity, and never failed to encourage him with friendly advice, reward and hope." হরিশের বেতনও এঁদের জন্যই ২৫-৫০-১০ -২০০ ও শেষে ৪০০ টাকা হয়। 'ইতিপূর্বে ঐ আফিসে ১০০ টাকা বেতনের চাকরী প্রায়ই ইংরাজ ও ফিরিঙ্গিদিগকে দেওয়া হইত।' গিরিশচন্দ্র ঘোষও বলেছেন যে বেঙ্গল আর্মির মধ্যে সবচেয়ে মহৎ এবং উদার মনোভাবাপন্ন মানুষ হলেন কর্ণেল গোল্ডী—"No sneaking partialities obstructed the wide action of that splendid mind which directed the military economy of the indian empire with a master's hand"[১৭]

কর্ণেল গোল্ডীই তাঁকে সামান্য কেরানী থেকে অডিটরের পদে উন্নীত করেন। কর্ণেল চ্যাম্পনীজের সঙ্গে হরিশের বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বন্ধুমহলেও যে তিনি চ্যাম্পনীজের প্রশংসা করতেন এবং তাঁর প্রতি তাঁর অপরিমেয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন তার সাক্ষ্য দিয়েছেন রামগোপাল ঘোষ। রামগোপাল বলেছেন যে একবার তিনি হরিশকে চাকুরি ত্যাগ করে তাঁর মত ব্যবসার পথ গ্রহণ করতে বলেন। কিন্তু হরিশ এতে অসম্মত হন, হরিশ বলেন, "that his master had been kind to him."[১৮] রামগোপাল সান্যাল লিখেছেন—"কর্ণেল চ্যাম্পনীজের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ছিল। একদা পণ্ডিত শম্ভুনাথের বাটীতে হরিশ কতিপয় বন্ধুগণসহ আইন পর্যালোচনায় কালাতিপাত করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার বন্ধুগণ হরিশের আইনজ্ঞানে পরিদর্শিতা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া তাঁহাকে কেরানীগিরি ছাড়িয়া উকিলের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে বলেন। তিনি তদুত্তরে বলেন যে, কেরানীগিরি করিয়া তাঁহার অনেক সময় থাকে এবং সেই সময় মধ্যে দরিদ্র লোকদিগের জন্য দরখাস্ত লেখা ও সাধারণ হিতকর কার্যে ব্যাপৃত থাকা যায়। আর তিনি বন্ধুদিগকে বলেন যে, কর্ণেল চ্যাম্পনীজ তাঁহার দুরবস্থায় এত উপকার করিয়াছেন যে, তিনি যতদিন জীবিত থাকিবেন,

ততদিন ঐ কর্ম পরিত্যাগ করিবেন না। সেই সময়ে হরিশ কৃতজ্ঞতায় উদ্দীপ্ত হইয়া কর্ণেল চ্যাম্পনীজের নানা প্রশংসা করিয়াছিলেন। হরিশের সমকালবর্তী লোকদিগের মধ্যে কেবল সিমলার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্তবাবু ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ ও আর দুই একটি ছাড়া অন্য কেহ এখন [১৮৮৭] জীবিত নাই। ক্ষেত্রবাবু মিলিটারি আফিসে কর্ম করিতেন। তিনি আমাদিগকে বলেন যে, হরিশ কখন অতি সামান্য কর্মচারীকেও অসম্মানসূচক কথা বলেন নাই। তাঁহার শরীরে রাগ ছিল না। যিনি নিজের সম্মানের প্রতি নিয়ত দৃষ্টি রাখেন, তিনি অন্য ব্যক্তির প্রতি কখনও অসম্মান করিতে পারেন না। হরিশ এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। অতি সামান্য কর্মচারী তাঁহাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আহ্লাদের সহিত কথা বলিয়া দিতেন। ক্ষেত্রবাবু বলেন, একদা আর. এইচ. হলিংবেরী [ঐ আফিসের রেজিস্টার] হরিশের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ইংরাজীতে (Look at the man) অর্থাৎ 'মিনসের রকম দেখ' এই কথা প্রয়োগ করেন। হরিশ সেই সময়ে ইহার কোন উত্তর না দিয়া পরে কর্ণেল চ্যাম্পনীজের কাছে আপনার কর্ম পরিত্যাগপত্র পাঠাইয়া দেন। কর্ণেল হরিশকে নানাপ্রকার বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া বলেন যে, তুমি কাগজপত্র কর্ণেল রামজের নিকট না পাঠাইয়া আমার নিকট পাঠাইবে। কর্ণেল চ্যাম্পনীজ অনুসন্ধানের পূর্বেই জানিয়াছিলেন যে, হলিংবেরী এই দোষে দোষী, ইহা জানিতে না পারিয়া রামজে সাহেবকে উল্লেখ করিয়া হরিশের রাগ শান্ত করিলেন। হরিশকে আফিসের সাহেবরা সকলেই সম্মান করিতেন এবং জানিতেন এই স্বাধীনচেতা ব্রাহ্মণ অপমান সহ্য করিবার লোক নহে।"[৯]

মিলিটারি অডিটার অফিসের চাকুরি পরিত্যাগ না করার পেছনে চ্যাম্পনীজের প্রতি হরিশের কৃতজ্ঞতা প্রত্যক্ষ সত্য সন্দেহ নেই, কিন্তু এই ঘটনায় হরিশের দূরদৃষ্টি ও তাঁর জীবনের লক্ষ্যও আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়। অর্থই তাঁর জীবনের ধ্যানজ্ঞান ছিল না। তাঁর বাস্তববুদ্ধি, আইনজ্ঞান, ইংরেজীভাষার উপর দখল—কেবলমাত্র সংকীর্ণ উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত থাকলে তাঁকে বিত্তবান করে তুলতে সাহায্য করত। রামগোপাল ঘোষ তো বলেছিলেন যে প্রথম শ্রেণীর সরকারী উকিল হওয়ার যোগ্যতা তাঁর ছিল। তথাপি হরিশ ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির অভিপ্রায়ে মত্ত না হয়ে চেষ্টা করেন—'to make himself useful to his country.' হলিংবেরী সাহেবের ব্যাপারে হরিশের যে স্বাধীনচিত্ততার প্রকাশ দেখা গেছে তার দৃষ্টান্ত তাঁর জীবনে অন্যত্রও দেখা যায়। রাজনারায়ণ বসু এরকম আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন: একদিন হরিশ ও তাঁর এক বন্ধু ট্রেনে করে কোথাও যাচ্ছিলেন। ট্রেনের কামরায় দুজন মুখোমুখী দুটি সিটে বসেছিলেন। হরিশের পাশে এক শ্বেতাঙ্গ সৈনিক বসেছিলেন। সৈনিকটি হরিশের বন্ধুর দিকে পা ছড়িয়ে বসেন। সরাসরি প্রতিবাদ না করে হরিশ তাঁর বন্ধুকে নিজের সিটে আসতে বলেন এবং নিজে তাঁর সিটে গিয়ে সৈনিকটির দিকে তাঁর পা মেলে ধরলেন। এমন পর্বে যেতে

নকলভাব তিনি দেখান যে তিনি যেন বাংলার লাট সাহেব। ফলে সৈনিকটির যোগ্য শিক্ষা হয় এবং পরের স্টেশনে এই বলে গজগজ করতে করতে তিনি নেমে যান—'Let me be damned if I ever enter a railway carriage without a pair of pistols in my pocket."[২০] হরিশের মৃত্যুর পর রামগোপাল ঘোষ তাঁর বক্তৃতায় এরকম আর এক ঘটনার উল্লেখ করেন। 'হিন্দু পেট্রিয়টে' রামগোপালের সেই বক্তৃতার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়—"Mr. Montrion here related, in corroboration of the testimony borne by Babu Ramgopal Ghose to the deliberation, and selfsacrificing character and habits of Hurish chunder. A circumstance which occured some years ago, when an honorable and lucrative but secondary position was offered to him in connection with the public press, and the speaker had pointed out that, having created a field and kingdom for himself (Hindoo patriot) he should not forsake it to become even the prime Minister of another sovereign, and that a day, afterwords Hurish chunder accosted him with the phrase 'you have conquered'—and he accordingly remained at his post. The speaker remarked, that Hurish chunder was not, as many have been, made by or for an occasion, he was equal to all occasions. Those who observed him closely, could not but acknowledge, that his superiority was intrinsic and must have shown itself at any time and in any place. 'If you plant an oak in a garden of cucumbers, it will still grow up an oak and spread aloft its branches.[২১] বিদ্যালয়গত শিক্ষার সুযোগ হরিশ খুব বেশি পান নি। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে লেখাপড়ার চর্চা তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন। টলা কোম্পানীতে প্রথম চাকুরি পাবার পর, অবস্থার কিছু সচ্ছলতা হওয়াতে তিনি কলিকাতা লাইব্রেরীতে (মেটকাফ্ হল) প্রত্যহ কার্যসমাপনান্তে নিয়মিত পুস্তকাদি পাঠ করতেন। ঐ লাইব্রেরীতে তাঁকে মাসিক ২ টাকা করে চাঁদা দিতে হত। হরিশের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাজকিশোর বাবুর সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে তিনি মাত্র ৫ মাসের মধ্যে ৭৫ ভল্যুম এডিনবরা রিভিউ (Edinburgh Review) পাঠ করেন। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ও বলেছেন যে, হরিশ ৩। ৪ বার এডিনবরা রিভিউ পাঠ করেন। অফিসের ছুটি হবার পর তিনি সোজা ঐ লাইব্রেরীতে চলে আসতেন এবং সেখানে ২। ৩ ঘণ্টা নিয়মিত পড়াশুনো করতেন। কর্ণেল চ্যাম্পনীজ এবং কলকাতার তদানীন্তন ইনকাম ট্যাক্সের কমিশনার এবং কর্ণেল গোল্ডীর কাছ থেকে তিনি পাঠযোগ্য গ্রন্থাদি সংগ্রহ করতেন। সে সময়ে

আলেকজাণ্ডার ডাফ সাহেবর বক্তৃতা ইংরেজী শিক্ষিত যুবসমাজে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। অফিসের কাজ শেষ করে ক্ষুধাতৃষ্ণা সহ্য করে হরিশ সেই সব বক্তৃতা শুনতে যেতেন।—"Such was his inextinguishable hankering after knowledge that he often times walked from Bhowanipur to the cornwallis Square, a distance of about 4 miles, after his office hours, to hear the lectures of Dr. Duff" তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির কথাও বলেছেন তাঁর জীবনচরিতকার।

আইন সম্পর্কে তাঁর নিপুণ জ্ঞান ছিল। পরবর্তীকালে হাইকোর্টের বিচারক শম্ভুনাথ পণ্ডিতের বাড়িতে এক সভা ছিল, সেই সভায় হরিশ উত্তমরূপে আইনের পর্যালোচনা করতেন। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সমকক্ষ হবেন বলে হরিশ বিশেষ যত্নের সঙ্গে আইন শিক্ষা করেন। প্রথম প্রথম প্রসন্নকুমার হরিশের কথায় ততটা মনোযোগ দিতেন না কিন্তু আইন সম্বন্ধে হরিশের বিচক্ষণতায় কালক্রমে তাঁর ঔদাসীন্য দূর হয়ে যায় এবং—"When in 1852 he became a member of the British Indian Association, he learnt all the Regulation Laws in order to be able to cary on discussion with Babu Prasanna kumar Tagore and Mr. W. Montriou, the Father of the calcutta Bar."[২৩] বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশানের সভ্যরা তাঁর ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা ও আইনজ্ঞানের জন্য তাঁকে একবার প্রতিনিধিরূপে বিলাতে পাঠাবার কথাও চিন্তা করেন। সেই চিন্তা অবশ্য শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি।

অত্যন্ত সুরসিক ছিলেন হরিশচন্দ্র। হিন্দু পেট্রিয়ট থেকে জানা যায় যে ইংরেজ সম্পাদকদের সঙ্গে তর্ক বিতর্কে স্বল্প কথায় তিনি তাঁদের বিদ্রূপ করে তর্কস্থলে জয়লাভ করতেন। ["Anglo—Indians at the time of the Mutiny used to abuse the natives very grossly and characterised their conduct as 'Asiatic perfidy'. Hurish silenced them with a spicy remark in the Hidoo patriot, 'Jesus was an Asiatic"[২৪]] হরিশ তামাকপ্রিয় ছিলেন। যাত্রাগান শুনতেও তিনি ভালবাসতেন, 'নটের অপেক্ষা নটীর ক্রীড়ায় তিনি অধিক আমোদ বোধ করিতেন।' মন্মথনাথ ঘোষ লিখেছেন যে হরিশের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের গভীর হৃদ্যতা ছিল। হরিশ প্রায়ই তাঁর বাড়িতে যেতেন। এবং যাত্রা শুনুনির প্রতি গিরিশের আসক্তি নিয়ে ঠাট্টা করতেন। গিরিশও হরিশের বাড়িতে যেতেন। দুজনের সাধারণ বন্ধু ছিলেন অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিশ যাঁকে ঠাট্টা করে বলতেন 'দুর্বল সিং।'[২৫]

রামগোপাল সান্যাল তাঁর বাংলা হরিশ জীবনীতে হরিশ সম্পর্কে আরও কয়েকটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। নিম্নে সেগুলি উদ্ধৃত হচ্ছে ঃ

"শ্রদ্ধাস্পদ ধার্মিকপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু রামতনু লাহিড়ী মহাশয় আমাদিগকে

বলেন যে, একদা বাগ্মী রামগোপাল ঘোষের বাটীতে হরিশের নিমন্ত্রণ হয়। তথায় প্যারীচাঁদ মিত্র ও তাঁহার ভ্রাতা কিশোরীচাঁদ মিত্র ও অন্যান্য ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। হরিশকে রামগোপাল বড় স্নেহ ও আদর করিতেন। এই সময়ে হরিশ অত্যন্ত সুরাপানে আসক্ত হইয়াছিলেন। এই কথা রামগোপাল জানিতে পারিয়া সকলের সমক্ষে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন যে তোমার জীবন বড় মূল্যবান, তুমি এরূপ সুরাসক্ত হইলে বেশীদিন বাঁচিবে না। হরিশ রামগোপালকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় মান্য করিতেন। তিনি এই ভর্ৎসনা বাক্যে অসন্তুষ্ট না হইয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে, আপনাকে আমি বড় ভাইয়ের ন্যায় মান্য করি; আপনি আমার দোষের কথা না বলিলে আর কে বলিবে। কথাপ্রসঙ্গে রামগোপাল বাবু হরিশকে বলিলেন যে এই মজলিসে এমন একজন লোক আছেন যে তাঁহার চরণামৃত খাওয়া যাইতে পারে। তিনি রামতনু বাবু।

"কৃষ্ণনগর কলেজের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু হরিতারণ ভট্টাচার্য্য বলেন যে একদা কোন এক বাগান বাটীতে প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় বলেন যে মেকলের লেখার পারিপাট্য বড় সুন্দর। হরিশ বলেন যে গিবনের লেখা মেকলের অপেক্ষা আরও সুন্দর। হরিশ আপন মত সমর্থনার্থে গিবনের সমস্ত ইতিহাস মুখস্ত এত অনর্গল বলিতে লাগিলেন, যে সকলেই অবাক হইয়া রহিলেন।

"চুঁচুড়ার শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ সরকার বলেন যে হরিশ অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্নান ও আহারাদি কার্য্য করিতেন। ৮/১০ মিনিটের মধ্যে তাঁহার স্নান ও আহারাদি হইত। বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একথা স্বীকার করিয়া বলেন যে হরিশের সহিত একত্রে আহার করিতে বসিয়া তিনি বড় অপ্রস্তুত হইতেন। শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা ছোট আদালতের ভূতপূর্ব জজ) বলেন যে, যে সময়ে লর্ড ডালহৌসী অযোধ্যা রাজ্য খাস করিয়া লেন, তখন হরিশ ইহার ঘোর প্রতিবাদ করেন! লর্ড ডালহৌসী হরিশের লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ফ্রেডারিক হালিডেকে (বঙ্গের লাট সাহেব) অনুরোধ করেন যে হরিশকে কোন উচ্চতর পদে প্রদান করিয়া তাঁহার মুখ বন্ধ করা ভাল।

"বাবু কালীচরণ সোম বলেন যে পারিবারিক সুখে হরিশ অনেক পরিমাণে বঞ্চিত ছিলেন। সময়ে সময়ে বাটীতে তাঁহার মাতা ও অন্যান্য ব্যক্তির সহিত কথান্তর হইত। তাঁহার জননী আধপাগলা স্ত্রীলোক ছিলেন, অল্প কথাতেই রাগ করিয়া হাঁড়িকুঁড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন। হরিশের প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁহার মনের শান্তি নষ্ট হয়। দ্বিতীয় বিবাহ মাতার ইচ্ছানুসারে ভাল ঘরে ও ভাল কন্যার সহিত হয় নাই। সুতরাং এইসকল কারণে তিনি পারিবারিক সুখ হইতে অনেক পরিমাণে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। কালীচরণবাবু বলেন যে, সময়ে সময়ে হরিশ পরিবারস্থ ব্যক্তির উপর অসন্তুষ্ট হইয়া কলিকাতার ভাড়াটিয়া বাটীতে থাকিবার জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন। একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে থাকিতে হইলে উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির যে সহিষ্ণুতা ও নিঃস্বার্থপরতা গুণ দেখাইতে হয় হরিশ তাহা দেখাইয়াছিলেন। হরিশের নিজের খাওয়া পরার

বিষয়ে কোনোই আড়ম্বর ছিল না। কিন্তু নিজ সহোদর ভ্রাতা হারাণবাবুকে তিনি বাবুগিরিচালে চলিতে দিতেন। মাতার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় স্নেহ ও ভক্তি ছিল। সময়ে সময়ে তাঁহার অনুরোধে আপন বাটীতে দুর্গাপূজা করিতেন। ১৮৬১ খৃঃ হরিশ অত্যন্ত পীড়িত হইলে তিনি প্রতিদিন, কাতর ও ক্ষীণ শরীরে অফিসে যাইয়া কর্ম্ম করিতেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ হরিশের স্মরণার্থ সভায় বক্তৃতার সময় বলেন যে মৃত্যুকালে হরিশ বলিয়াছিলেন, যে 'বাঙ্গালী আপন জীবন উৎসর্গ করিয়া কর্ত্তব্যকার্য্য সাধন করিতে পারে এই দৃষ্টান্ত ইংরেজদিগকে দেখাইবার জন্য পীড়ার সময়েও ছুটি লইবার জন্য প্রয়াস পান নাই।' মণ্ট্রিও সাহেব উক্ত সভায় বলেন যে একদা হরিশকে একটি উচ্চপদ দিবার প্রস্তাব হয়। উহাতে মণ্ট্রিও সাহেব হরিশকে বলেন যে 'রাজ্যের প্রধান মন্ত্রিত্বপদ পাইলেও, তুমি নিজে যে রাজ্য (অর্থাৎ, পেট্রিয়ট) সৃষ্টি করিয়াছ তাহা তোমার ত্যাগ করা উচিত নহে।'

"মণ্ট্রিওর কথানুসারে তিনি দুই একদিন এ বিষয় ভাবিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, মহাশয়ের কথা আমি গ্রাহ্য করি, আমি পেট্রিয়ট পরিত্যাগ করিব না।' বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ হরিশের স্মরণার্থ সভায় যে বক্তৃতা করেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রদান করা গেল। হরিশের সহিত তাঁহার প্রায় ১০ বৎসর আলাপ হইয়াছিল। প্রথম আলাপের সময় তিনি হরিশকে অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোক বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন—

"প্রসন্নকুমার ঠাকুর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন সভার কার্য্য পরিত্যাগ করিলে হরিশ তাঁহার স্থলবর্তী হইয়া উক্ত সভার দরখাস্তাদি লেখা ও অন্যান্য কার্য্য কঠোর পরিশ্রমে ও বিশেষ পারদর্শিতার সহিত সম্পন্ন করিতেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ ও এদেশীয়দের মধ্যে ঘোর মনান্তর জন্মিয়াছিল। তিনি এই সময়ে বিদ্রোহ শান্তি ও ইংরাজ রাজার প্রতি জনসাধারণের ভক্তি যাহাতে অচল থাকে তাহার জন্য লেখনী চালাইয়াছিলেন। তিনি যে কেবল খবরের কাগজ লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন তাহা নহে। যে কোন দরিদ্র ব্যক্তি তাঁহার নিকট দুঃখ জানাইত হরিশ তাহাকে অর্থ দ্বারা হউক, কিম্বা অন্য উপায়ে সাহায্য করিতেন। দরিদ্রের জন্য দরখাস্ত লেখা ও দরিদ্রের হইয়া বড় মানুষদিগের বাটী গিয়া সাহায্য যাচ্ঞা করায় তাঁহার সমস্ত সময় ক্ষেপণ হইত।

"একদা বিলাতে এদেশীয়দিগের প্রতিনিধিস্বরূপ হরিশকে পাঠাইবার প্রস্তাব হইয়াছিল। হরিশের ইচ্ছা থাকিলেও সামাজিক প্রথা ও বন্ধনবশত বিলাত যাইতে পারেন নাই। যদিও তিনি ব্যবসায়ী উকিল ছিলেন না তথাপি তিনি ওকালতী করিলে হাইকোর্টের একজন প্রধান উকীল হইতে পারিতেন। একদা তিনি [রামগোপাল ঘোষ] হরিশকে ওকালতী কিম্বা বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে বলিলেন। তিনি তদুত্তরে বলেন যে কর্ণেল চ্যাম্পনীজ তাঁহার এত উপকার করিয়াছেন যে তিনি চাকরী পরিত্যাগ করিবেন না। ওকালতী কিম্বা ব্যবসায়ী হইলে তাঁহার সময় ঐ সকল কার্য্যে ক্ষেপণ করিতে হইবে। 'আমার ধন নাই, সুতরাং ধন দ্বারা দরিদ্রের উপকার করিতে পারি না, কিন্তু আমার সময় ও পরিশ্রম দ্বারা তাহাদের উপকার সাধন করিতে পারি।'

"রামগোপালবাবু উক্ত বক্তৃতায় বলেন যে ১৮৫৩ খৃঃ যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে চার্টার পুনঃপ্রদত্ত হয় তখন এদেশীয়রা উহাতে আপত্তি করেন। কলিকাতা হইতে পার্লামেণ্ট সভায় এক আবেদনপত্র প্রেরিত হয়। ঐ পত্র হরিশের "স্বহস্ত রচিত" হরিশ হিন্দু পেট্রিয়টে কোম্পানীর হস্ত হইতে মহারাণী স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করা ভাল ইহা দেখাইবার জন্য যে সকল প্রবন্ধ লেখেন তাহা এখন আর পাওয়া যায় না। এই সকল প্রবন্ধ ও আবেদনপত্র এত বিশদরূপে লিখিত হইয়াছিল যে ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষীয়েরা ইহার ভূয়সী প্রশংসা করেন।"[২৬]

টীকা

১—এক্ষণ, পৌষ-মাঘ, ১৩৭৭। ১৮৮৭ সালে রামগোপাল সান্যাল রচিত হরিশ জীবনীর পুনর্মুদ্রণ।

২—A General Biography of Bengal celebrities. R. G. Sanyal, edited by Swapan Majumdar. P—51—2

৩—Mookerjee's Magazine, June, 1861

৪—এক্ষণ, ঐ, পৃঃ ৬—৭

৫—Mookerjee's Magazine, ঐ।

৬—A General Biography...ঐ, P—53

৭—এক্ষণ, ঐ, পৃঃ ৭০

৮—A General Biography...P—58

৯—ঐ

১০—ঐ, P—83

১১—ঐ, P—58

১২—Selections from the writings of Girish Chandra Ghosh, edited by M. N. Ghosh.

১৩—A General Biography...P—83

১৪—ঐ, P—54

১৫—Mookerjee's Magazine, ঐ।

১৬—Lights and shades of the East (1863) by Farmji Bomanji.

১৭—Mookerjee's Magazine, ঐ।

১৮—Hindoo Patriot, 12 7. 1861

১৯—এক্ষণ, ঐ, পৃঃ ৮—৯

২০—A General Biography..., P—82-3

২১—Hindoo Patriot, 12. 7. 1861

২২—A General Biography..., P—57

২৩—Bengal, Past and Present, April—June, 1914, P—284-89

২৪—রাজনারায়ণ বসুর উক্তি।

২৫—Life of Girish Chandra Ghosh. M. N. Ghosh. P—89

২৬—এক্ষণ, ঐ, পৃঃ ৪৫—৭

হরিশের মৃত্যু ও স্মৃতি রক্ষা

নীল কমিশনে জবানবন্দী দেওয়ার পর মাত্র ১ বৎসর জীবিত ছিলেন হরিশচন্দ্র। শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়েন তিনি। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে আর্চিবলড হিলস তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন মানহানির। মামলা চালানোর জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। অথচ হরিশ রিক্তবিত্ত। এই মামলা তাঁর মানসিক পীড়ারও কারণ হয়। "The consequencè was that the planters got a decree against him form the Subordinate Judge of Alipur, and his house was attached and put to the auctioneers hammer. All this took place immediately after his death, but he knew all this before he shuffled of the mortal coil"[১] এর সঙ্গে অবশ্য শারীরিক পীড়াও ছিল। কালীচরণ সোম বলেছেন যে, বহুদিন হতে হরিশের কাশির অসুখ ছিল! কঠোর শ্রম ও অন্যান্য কারণে হরিশের ক্ষয়কাশ জন্মায়। তাঁর হাঁপানির অসুখও ছিল। এর জন্য "মাতার অনুরোধে" তিনি গলায় মাদুলী ধারণ করেন।[২] রাজনারায়ণ বসু বলেছেন যে মদ্যপানই হরিশের অকাল মৃত্যু ডেকে আনে, "His decline is to be attributed more to his free indulgence in the wine cup and his excessive mental exertion than to the climate of our Country."[৩] মন্মথনাথ ঘোষও বলেছেন মদই হরিশকে ৩৭ বৎসর বয়সে মৃত্যুর জগতে নিয়ে গেছে, আর মদ না ছুঁয়েও গিরিশ ৪০ বছরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন।[৪] পীড়িতাবস্থায় ডাক্তার এডওয়ার্ড গুডিভ ও নীলমাধব মুখোপাধ্যায় তাঁর চিকিৎসা করেন। রমাপ্রসাদ রায় মৃত্যুর পূর্বে চিকিৎসার জন্য হরিশকে তাঁর আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতে এনে রাখেন। কিন্তু মৃত্যুর দিন দুই পূর্বে তাঁর জীবনের আশা নেই—ডাক্তাররা এরূপ অভিমত প্রকাশ করলে তাঁকে তাঁর ভবানীপুরের চালপটির বাড়িতে এনে রাখা হয়। ১৮৬১ সালের ১৪ই জুন শুক্রবার হরিশের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যু ও রেভারেণ্ড লং সাহেবের কারাবাস উপলক্ষ করে লোককবির কণ্ঠে উত্থিত হয় বেদনাগীতি :

নীল বাঁদরে সোনার বাংলা
করলে এবার ছারখার।
অসময়ে হরিশ মলো, লঙ-এর হ'ল কারাগার,
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার।[৫]

হরিশের মৃত্যুর পর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে শোক জ্ঞাপন করা হয়। আমরা সোমপ্রকাশ, ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া, ফোনিক্স ও মুখার্জীস ম্যাগাজিন থেকে কিছু কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করছি।

ক. Phoenix

On Friday the 14th instant at his residence in Bhowanipore died Hurish chunder Mookerjeē, late Hindoo Patriot.

For the calamity which has befallen the Hindoo nation our sincerest condolence is offered, though it will no wise mitigate the severity of the blow or deprive it of the magnitude and poignancy of a national affliction. In the prime of life, with his task only begun, not finished, the most remarkable Bengallee of the age has gone to his eternal repose, leaving no one to succeed to the inheritance of glorious usefulness to his people. We mean no disparagement to the educated sections of native society when we say that in the path struck out for himself by the deceased he stood single and alone, and had single handed to fight the great fight to which he had consecrated himself. Well, therefore, may their grief be intensified by the sense of abandonment of their leadership by the only spirit in the circumstances of the times fit to be entrusted with it. So strangely had this race been disunited and denationalized by centuries of foreign domination, that the very name of patriotism was unknown among them, while constitutional resistance to oppression and wrong doing, on the part of those who possessed, or who usurped authority was not to be thought of, for a moment.

Hurish was the first native who taught his countrymen the dignity of an attitude at once firm but respectful towards Government on the one hand, and non-official European class on the other, with both of whom they were daily brought into relations of mutual benefit and assistance. Such was the moderation of his tone, and general good sense of his writings, that they had a most wholesome influence on the counsels of Government, and commanded the admiration of all not directly interested in the perpetuation of fraud and injustice. In his hands the Hindoo patriot has been the vehicle of loyalty towards a Government wisely heedful of popular opinion as reflected in its pages, and such we hope it will never cease to be.

Of his part during the Indigo Dispute there is no man of honor, who values, above all things the rights of human beings before the supposed advantages of private enterprise, but will speak in unqualified praise. What Government could not or would not interfere to effect, what the whole landed aristocracy of Bengal was too frightened to attempt, was accomplished through the energy of one man acting on the willingness of the people. It is a record full of the profound truth that neither gold nor the power of fighting men can further the cause of popular belief, but the inborn capacity of the people to help themselves. Tell them they have rights which are wrongfully withheld from them, and they strive with a God-given energy of the Earth to which they belong, till they are free. It was as impossible to hold the ryot in chains after he had been told he was no man's slave as it is impossible to hold Italy in Slavery, even though all Europe were banded for it. Hurish chunder Mookerjee received no education, and commenced life in indifferent circumstances. But there was stuff in the man not to be put down by the accident of poverty, and patient industry, united to intellectual capabilities of a very high order, won for him a distinguished position in the service of Government, as well as in the general society of his countrymen. His house was the resort of all who had advice or assistance to ask for, and both were given with a liberality which left him little time for his own proper avocations, and scant means of private hoarding. It will rest with the native community whom he signally served, without fee or reward, for so many years. Whether his family is to be well looked after. A high caste Brahmin, his name adds one more to the list of Indian Reformers of the Brahminical tribe, who must take the lead of all other tribes in every moment of an intellectual natur..

Of course the memory of such a man cannot be allowed to pass away with the present generation, and we shall be glad to see our native friends bestiring themselves suitably in the matter."

খ. সোমপ্রকাশ

"বঙ্গভূমি অনেক বুদ্ধিমান সন্তান প্রসব করেন। কিন্তু তাঁহার সহজাত একটি আলস্য দোষ আছে। অনেকে সেই আলস্য দোষে আক্রান্ত হইয়া অকর্মণ্য হইয়া যায়, মাতৃকার্য করিয়া উঠিতে পারে না। হরিশবাবু বঙ্গভূমির সেই অকর্মণ্য সন্তানদলের অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন না। তিনি বঙ্গভূমির অনেক কার্য করিয়াছেন। যে যে পথ অবলম্বন করিয়া শ্রীবৃদ্ধি বঙ্গভূমে প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহার প্রেরিত হিন্দু পেট্রিয়ট তাহার অন্যতম। তিনি হিন্দু পেট্রিয়ট প্রচার করিয়া হিন্দু জাতির বহুতর শ্রেয়ঃ সাধন করিয়া স্বপত্রের অন্বর্থতা সম্পাদন করিয়াছেন।......"[৭]

গ. The Friend of India

"The death of Hurris Chunder Mookherjea, the Editor of the Hindoo patriot, a well-known weekly paper published in the suburbs of calcutta, should not pass unnoticed. Devoted to the interests of the Bengal Zeminders and equally opposed to the whole class of non-official Europeans, Hurris Chunder conducted the controversies that have raged in Calcutta since 1857 with no little unscrupulous ability. He shewed a singular command of the English language in all he wrote. In other circumstances, freed from the shackles of caste and Brahminical prejudice, such a man would have been a distinguished social and political Reformer. As it was, he continued a clerk in a Government office and was merely a clever partisan."[৮]

ঘ. Mookerjee's Magazine.

"A thunderbolt has fallen upon native society. Hushed is every voice and fixed is every eye. The friend of the poor and the mentor of the rich, the spokesman, the patriot, the brave heart that defied danger and battled foremost in the strife of the politics has been swept away like a vision from our aching eyes. In the prime of his youth and the full splender of his intellect, while yet the Indigo riot was bending before the sun and invoking blessing on the head of his deliverer, and the country from one end to the other was ringing with jubilee, the stroke of death fell heavily upon the land and its pride and its ornament disappered in a cloud of glory. Our loss is great. We were only just putt-

upon the land and its pride and ornament disappeared in a cloud of glory. Our loss is great. We are only just putting forth the buds and the blossoms of a healthy existence. From the darkness of ages we were only faintly emerging into light, groping our way through a ehoking mass of prejudices and struggling feebly through earnestly through obstruction and difficulty. We had only recently learnt the value of political liberty. The heads of our people had banded together for the noble of representation calm, sustained, and irresistible representation. They assumed an attitude of dignified remonstrance which the ruler could not help respecting. Hurris Chunder Mookerjea was the soul of this movement. He supplied the spirit, the energy, the breadth of view and the raciness of logic which raised the British Indian Association to the position of a power in the state. His earnest mind was incessantly at work digesting the past and probing the future. Placed by fortune in a retired grade of life he worked up his way to the topmost ranks of society which he ruled by the sheer force of his intellect. He had established a dictatorship in the realm of thought to which the richest ahd the best did homage."[৯]

হরিশের মৃত্যুর পর ১৮৬১ সালের ১২ই জুলাই বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের গৃহে হরিশ স্মরণার্থে এক সভা হয়। রমানাথ ঠাকুর এই সভার সভাপতি হন। সভায় রামগোপাল ঘোষ প্রস্তাব করেন,—"হরিশের অকাল ও খেদজনক মৃত্যুতে বঙ্গীয় সমাজের বিশেষ ক্ষতিবোধে এই সভায় সভ্যেরা অত্যন্ত দুঃখিত হৃদয়ে তাঁহার জন্য আক্ষেপ করিতেছেন। হরিশচন্দ্র এই দেশের মঙ্গলের জন্য যে তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা ও শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহাও স্বীকার করিতেছেন।"[১০] এই প্রস্তাব সমর্থন করেন রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল। দ্বিতীয় প্রস্তাব করেন কিশোরীচাঁদ মিত্র : "হরিশের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া তদ্দারা কমিটির ইচ্ছানুসারে কোন স্কুলে তাঁহার নামে ছাত্রবৃত্তি দেওয়া যাইবে, কিংবা উক্ত কমিটির ইচ্ছা হইলে অন্য প্রকার স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপন করা যাইবে।"[১১] এই প্রস্তাব রাজেন্দ্রলাল মিত্র সমর্থন করেন। এই সভার রিপোর্ট হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশিত হয়।[১২]

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ঐ সভায় প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার মণ্টিও সাহেব বক্তৃতা করেন। নবাব আবদুল লতিফও ঐ সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে হরিশের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন যে, হরিশ যে কেবল হিন্দুহিতৈষী ছিলেন তা নয় মুসলমান

ও খ্রিস্টান প্রভৃতি সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষই তাঁর আদরের পাত্র ছিলেন। তিনি সমস্ত মানবজাতির প্রকৃত বন্ধু ছিলেন।[১৩]

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভায় হরিশ স্মৃতি স্মরণার্থ ও 'চিহ্ন স্থাপনের জন্য ধন সংগ্রহার্থ" যে সমিতি স্থাপিত হয়, তার সভ্যদের নাম :

কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর, প্রতাপনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, রমাপ্রসাদ রায় বাহাদুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, রমানাথ ঠাকুর, যাদবকৃষ্ণ সিংহ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দিগম্বর মিত্র, তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, মৌলবী আবদুল লতিফ, চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, জগদানন্দ মুখোপ্রাধ্যায় ও কৃষ্ণদাস পাল [১৪]

হরিশের মৃত্যুর পর কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর স্মৃতিরক্ষা তহবিলে ৫০০০ টাকা দান করেন এবং "হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক মৃত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ কোন বিশেষ চিহ্ন স্থাপন জন্য বঙ্গবাসিদিগের প্রতি নিবেদন" নামক নিম্ন পুস্তিকা প্রণয়ন করে সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ করেন।

মৃত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের

স্মরণার্থ কোন বিশেষ চিহ্ন স্থাপন জন্য

বঙ্গবাসিবর্গের নিকট নিবেদন

"বঙ্গবাসিগণ! আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে তোমাদিগের একজন পরম প্রিয়চিকীর্ষু বান্ধব ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। ভারতভূমি তাঁহার অকাল মৃত্যুতে যত অপার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, ত্রিংশৎ সালের ভয়ানক জলপ্লাবনে, বিগত বিদ্রোহে ও বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে তত ক্ষতি স্বীকার করেন নাই। তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার যত উন্নতি সাধন করিয়াছেন, সতীদাহ নিবারণে রাজা রামমোহন রায়, বিধবাবিবাহ প্রচলনে বিদ্যাসাগরও তত উপকার সাধন করিতে পারেন নাই। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় বিদ্রোহসময়ে কেবল তাঁহার একমাত্র অসাধারণ অধ্যবসায় ও ধীশক্তিগুণে জলধিজলমগ্নোন্মুখ বাঙ্গালিসম্মান সংরক্ষিত হইয়াছিল। যদি সে সময় তিনি না থাকিতেন, যদি সে সময় তাঁহার লেখনী নিরীহ বঙ্গবাসিবর্গের অনুকূলে চালিত না হইত তাহলে আজি আর বঙ্গদেশের দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকিত না। যখন বিদ্রোহসময়ে হৃতসর্ব্বস্ব, বিগতবান্ধব, বৈরনির্য্যাতনাক্রান্তচিত্ত ইংলণ্ডীয়েরা নির্ব্বোধ সিপাহিদিগের সহিত বাঙ্গালি-দিগকেও কলঙ্কিত করিতে সমূহ চেষ্টা করিয়াছিল, যখন উদ্বন্ধনে প্রাণদণ্ড ভিন্ন বাঙ্গালিদিগের আর অন্য গতি ছিল না, তখন কেবল একমাত্র তিনিই অগ্রসর হইয়া আমাদিগের চিরপরিচিত সম্মান রক্ষা করেন ; সেই বীভৎস সময় আজিও স্মরণ হইলে পাষাণহৃদয়ও কম্পিত হয়।

"তখন ধনমত্ত ধনিগণ দাম্ভিকতা পরিহারপূর্ব্বক সম্পদসুলভ সুখভোগে বিরত হইয়া অন্তঃপুরে নিজ গৃহিণীর অঞ্চলদেশ আশ্রয় করিয়াছিলেন! সেই ভয়ানক দুর্ব্বিপাকে তিনি ভিন্ন আর কেহই অগ্রসর হন নাই।

"তিনি যে শুদ্ধ বিদ্রোহে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন এমত নহে। ইংরাজি ১৮৫৩ সালে যখন পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিরে চার্টর প্রদত্ত হয়, সে সময় ভারতবর্ষীয়েরা কোম্পানির রাজ্য শাসন বিপক্ষে পার্লিয়ামেণ্টে আবেদন করেন, ঐ আবেদনপত্র তৎ কর্ত্তৃক প্রস্তুত হয়, উহা তাঁহার স্বহস্তলিখিত এবং ঐ প্রস্তাবে তাঁহার এত দূরে গুণগরিমার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল যে, ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষেরা মুক্তকণ্ঠে ঐ আবেদনের শত শত বার প্রশংসা করিয়াছিলেন ;— তাহাতে ভারতবর্ষীয়েরা প্রার্থনাধিক ফল লাভ করেন ; সেবারে এই নিয়মে পুনর্ব্বার চার্টার প্রদত্ত হইলে যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কিঞ্চিৎ মাত্র দোষ দেখিলেই কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাদিগের হস্ত হইতে ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিবেন। ১৮৫৫ সালে লার্ড ডেলহাউসি লক্কৌ গ্রহণ করণে মানস প্রকাশ করিলে, তিনি ভিন্ন সকল সম্পাদকই তাঁহার মতে অনুমোদন করিয়াছিল ; তিনি অতি যথার্থ যুক্তির সহিত ডেলহাউসির অন্যায় মতের সমালোচন করিয়াছিলেন। এমন কি, তৎসময়ে তিনি তদ্বিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকটন করেন, ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগেরও তাহাতে লজ্জিত হইতে হইয়াছিল। তিনি কহিয়াছিলেন, যদি লক্কৌ প্রদেশ শুদ্ধ অবিচার দোষে ইংলিস অধিকারভুক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে ইঁহারাই যে সুবিচার দ্বারা প্রজা রঞ্জন করিতেছেন তাহার প্রমাণ কি। পৃথিবীর সমুদায় প্রদেশেই বহু কাল পরম্পরায় এই রূপ রীতি প্রচলিত আছে এবং তাহাই স্বভাবসিদ্ধ যে, দেশের কতক অংশ রাজার পরম মিত্র আর কতক গুলিন বিলক্ষণ বিপক্ষ সুতরাং যদি ইংরাজদিগের বলবান্ বিপক্ষ নিকটে থাকিত তাহা হইলে ইহাদিগকেই অবিচারক বলিয়া ভারত-সাম্রাজ্য হস্তগত করিয়া লইত। প্রতিবাসী নিজ পরিবারবর্গের প্রতি অত্যাচার করিলে যদি প্রতিবাসিবর্গের তাহারে শাসন করিবার নিয়ম থাকে, যদি ধনবান্ প্রতিবাসী নিজ ধনের ব্যবহার উত্তম রূপে না করিলে তদপেক্ষা বলবান্ প্রতিবাসীর, তাহার সমুদায় ধন গ্রহণ করিবার নিয়ম থাকে, তাহা হইলে লক্কৌ রাজ্য অবিচারদোষে আত্মসাৎ করা অবিধেয় হয় নাই। এতদিনে সাধারণে একটি নূতন নিয়ম সংস্থাপিত হইল ; যদি কাহারও বিবিধ ফলসম্পন্ন একটি মনোহর উদ্যান থাকে, যদি তাহার অধিকারী উহার উত্তম রূপে ব্যবহার করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি ঐ উদ্যানে বঞ্চিত হইবেন এই আমাদিগের সুসভ্য ব্রিটিস্ সমাজের সনাতন মত।

"১৮৫৯ সালের ১০ আইন কেবল তাঁহার একমাত্র পরিশ্রম, যত্ন ও অধ্যবসায়ে প্রচলিত হয় তাহার কোন কোন ভাগে বঙ্গবাসি ৩ কোটি লোক স্বাধীন প্রায় হইয়াছে। জমিদারদিগের প্রজাগণের উপর আর তাদৃশ প্রভুত্ব নাই ; জমিদার মনে করিলেই প্রজাবর্গকে তাঁহার কর্ম্মালয়ে আসিতে হইবে, তিনি শান্তিরক্ষকের অজ্ঞাতসারে প্রজার ধান্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারিবেন এবম্প্রকার বহুবিধ অনিষ্টকর নিয়ম একেবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে।

"সাধারণ সম্প্রদায় ইংরাজদিগের পরামর্শে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপকসমাজে কত বার কত প্রকার ভয়ানক রাজবিধির পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি অতীব সাবধানে প্রার্থিত বিধির সংস্কার, সংশোধন ও পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিয়াছেন। রাজদ্বারে বাঙ্গালিগণ তাঁহা দ্বারা যত উপকার লাভ করিয়াছেন, চিরজীবন বিনিময়েও তাহা পরিশোধ্য নহে।

"বঙ্গবাসিগণ! তোমাদিগের সেই মহোপকারী বান্ধব এক্ষণে বিগতজীবিত হইয়াছেন, আর তিনি তোমাদিগের উপকার সাধনে সমুদ্যত হইতে সমর্থ হইবেন না আর তাঁহার লেখনী জন্মভূমির হিত সাধনে প্রধাবিত হইবেক না; এক্ষণে আর তিনি নাই! প্রিয় আত্মীয়বিরহে আপনারা যতদূর দুঃখভারগ্রস্ত হন, প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী-বিরহে আপনারা যতদূর সন্তাপিত হইয়া থাকেন, প্রার্থনার প্রত্যাশাস্বরূপ সংসারসোপানে পদার্পণোদ্যত একমাত্র প্রিয় সন্তান বিয়োগে যত-দূর দুঃখ প্রাপ্ত হইবেন; হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে আপনাদিগের ততোধিক দুঃখ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য! ঋণভারগ্রস্ত হতভাগ্য বণিক যদি সর্ব্বস্ব বিনিময়ে বাণিজ্যদ্রব্য সহিত অর্ণবপোতমধ্যে জলধিজলে মগ্ন হয় হয়, যদি বহুপরিবারসম্পন্ন গৃহীর ভরণ পোষণের একমাত্র উপায়বৃত্তি বিহীন হয়, তাহা হইলে তাহারা যত ক্ষতি স্বীকার না করে, বাঙ্গালিসমাজ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি স্বীকার করিবেন! তিনি বাঙ্গালিসমাজের অলঙ্কার ছিলেন; বঙ্গদেশ তাঁহা হইতে যত প্রত্যাশা করিতেন, সিপাহিরক্ষিত ঐশ্বর্য্যমত্ত ধনিদ্বারে তত প্রত্যাশা করেন নাই! তিনি অন্ধ তমসাচ্ছন্ন হিরণ্য খনির একমাত্র দীপশিখাস্বরূপ সুকোমল বনলতার সুবর্ণ পুষ্পস্বরূপে বাঙ্গালিসমাজের শোভা সম্পাদন করিয়াছিলেন।

"আজিও সে দুর্নিমিত্ত সমূহরূপে রহিত হয় নাই; এখনও হতভাগ্য প্রজাবর্গ নীলকরহৃতসম্পত্তি হইয়া চতুর্দ্দশ পুরুষাধিকৃত সুখসংসার পরিহারপূর্ব্বক দীন বেশে ভ্রমণ করিতেছে—ভয়ানক আত্মহত্যা,—ঘৃণাবহ বলাৎকার আজিও রহিত হয় নাই কিন্তু তন্নিবারণের সোপান কে আবিষ্কৃত করিল?" কেবল সেই হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র লেখনীগুণে সদয়হৃদয় রাজপুরুষেরা করুণ রসপরবশ হইয়া নীলকরদিগের ভয়ানক অত্যাচার নিবারণার্থ কমিটি নিযুক্ত করিলেন; তৎ কর্ত্তৃক তত্ত্বানুসন্ধানে কত অত্যাচার তোমাদিগের শ্রুতিগোচর হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। কেবল তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তিগুণে কত অচতুরা গৃহস্থবল্লা সতীত্বস্বরূপ বিমল সুখানুভোগে সমর্থা হইয়াছে।

"হায়! পাষাণহৃদয়েও যে সকল কর্ম্ম সম্পাদিত হওয়া দুরূহ; বিজ্ঞানবিহীন পশুচক্ষে যাহাও ঘৃণাকর বিবেচিত হয়; এই সুসভ্য শ্বেত জাতিদিগের এমনি অপার মহিমা যে; অনায়াসে সরল হৃদয়ে সম্পাদন করিয়া থাকেন!!!

"হাঁ! নীলহলকর্ষিত প্রজাগণ! তোমরা যাঁহার একমাত্র অধ্যবসায় ও যত্নে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছ; যিনি তোমাদিগের বরদ দেবতার ন্যায় অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছেন, নিজ ব্যয়ে তোমাদিগের হিত সাধন করিয়াছেন; সেই সদয়হৃদয় গুন-

নিধান আর জীবিত নাই, তিনি আর কিছু দিন জীবিত থাকিলে তোমরা প্রার্থনাধিক ফল লাভে কৃতার্থ হইতে পারিতে কিন্তু তিনি যে প্রকার সুদৃঢ় সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন তাহাতে আবালবৃদ্ধবনিতারে তাঁহার গুণে বদ্ধ থাকিতে হইবে।

"নিজকৃত কর্ম্ম দ্বারা গৌরব লাভ করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না ; স্বকীয় সৎ কর্ম্মের পরিচয় প্রদান করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না বলিয়াই তৎকৃত উপকাররাশি আজিও অনেকের অবিদিত রহিয়াছে নতুবা তিনি বঙ্গদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালির যত উপকার সাধন করিয়াছেন এত দিন কোন বঙ্গপুত্র দ্বারা তাহা সাধিত হয় নাই ! তিনি ১২৩১ সালে কুলীন ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া নিজ ৩৭ বর্ষ বয়ঃক্রমে সাত বর্ষ সময়মধ্যে বঙ্গদেশের সমূহ শ্রী বৃদ্ধি করেন।

"গৌরব গ্রহণ, রাজদ্বারে সম্মান বা স্বদেশীয়ের নিকট সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া এক দিনের নিমিত্ত তাঁহার মনে উদিত হয় নাই! জন্মভূমির হিতানুষ্ঠানে কায়মনোবাক্য ও জীবন পর্য্যন্ত সংকল্প করিয়াছিলেন ; বাঙ্গালিসমাজে এবম্প্রকার লোক কয়জন জন্মিয়াছে ? যিনি যে পরিমাণে বঙ্গদেশের শ্রী বৃদ্ধি করিয়াছেন, আমি প্রায় সকলেরই চরিত্র লক্ষ্য করিয়াছি ; সুতরাং সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় যেরূপ নিঃস্বত্বে ভারতবর্ষের শ্রী সাধনে উদ্যত হইয়াছিলেন, কোন মহাত্মা সে প্রকার মন প্রাপ্ত হন নাই ! অনেকে জানিত না, হরিশ্চন্দ্র বাবু হিন্দুপেট্রিয়ট সম্পাদন করেন ; এবং তৎকর্ত্তৃক বঙ্গদেশের শ্রী বৃদ্ধি হইতেছে, এমন কি তাঁহারে কখন নিজ মুখেও তাহা স্বীকার করিতে শ্রবণ করা যায় নাই! যদি হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বঙ্গদেশে জন্ম গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে এত দিন আমাদের দুঃখের আর পরিসীমা থাকিত না, শৃগাল কুক্কুরও আমাদিগের দুঃখাংশ গ্রহণে সম্মত হইত না। আমরা এত দিনে আফ্রিকার ক্রীতদাসাপেক্ষায় সমধিক দুঃখনীরে নিমগ্ন হইতাম।

"পূর্ব্বে রাজশাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা, তাহারি সমালোচনা করা এবং কি প্রকার নিয়মে হতভাগ্য প্রজাবর্গের শ্রীবৃদ্ধি হইবে তাহার সদুপায় নির্দ্দেশ করার রীতি বাঙ্গালিদিগের নিকট নিতান্ত অপরিচিত ছিল ; কোন বাঙ্গালিই সাহস করিয়া রাজবিধি বিরুদ্ধে লেখনী চালন করেন নাই এবং নির্দ্দিষ্ট নিয়মের সংশোধনার্থ সদুপায় নির্দ্ধারণে অসমর্থ ছিলেন কিন্তু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় উল্লিখিত বিষয়ে প্রথমে হস্তক্ষেপ করিয়া বাঙ্গালিদিগের উন্নতি সাধনে যত্নবান হইয়াছিলেন, তিনি যে সমস্ত সদুপায় নির্দ্ধারণ করিতেন, কি ব্যবস্থাপকসমাজ কি ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষ তাহা সাদরে গ্রাহ্য করিয়াছেন। শ্বেতপূজক ইয়ং বেঙ্গলদিগের যে প্রকার আপার মহিমা কিন্তু হরিশ্চন্দ্র বাবু তৎসহবাস সত্ত্বেও তাহাদিগের অনুসরণ করেন নাই। তিনি সাহেবদিগের এক-দিনের জন্য তোষামোদ করেন নাই। পরনিন্দা, হিংসা, অযথা কথা ও পরানিষ্ট চেষ্টা তাঁহারে স্পর্শও করিতে পারে নাই। তিনি স্বদেশীয় ভ্রাতৃবর্গের উন্নতি দেখিলে পরম পরিতোষপ্রাপ্ত হইতেন ; স্বদেশীয়বর্গের দুঃখ দর্শনে তাঁহার

কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হইত। যাহাতে ক্রমে বাঙ্গালিরা রাজ্যশাসনভারের অংশ—প্রাপ্ত হইয়া ইংলণ্ডের ন্যায় স্বাধীনতন্ত্রভুক্ত হয়, ইহাই তাঁহার চিরপ্রার্থিত অভিলাষ ছিল; তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা বিদ্যাবলে অবশিষ্ট সাধারণ সম্প্রদায়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন; অপর সমাজস্থ মনুষ্যগণ যেমন ব্রাহ্মণের অধীন ছিল এবং ব্রাহ্মণেরাই যে প্রকারে সামান্য সমাজের শাসন করিতেন; সেইরূপ জমিদারবর্গে প্রজাগণের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন। প্রজাগণ তাঁহার মতেই মত প্রদান করে এবং সকলে তাঁহারেই একমাত্র প্রিয়চিকীর্ষু জ্ঞানে তাহার উপর আপনাদিগের সমুদায় প্রিয় কার্য্যের ভারার্পণ করত নিশ্চিন্ত হয়; জমিদার সরল হৃদয়ে পক্ষপাতরহিত হইয়া নিয়ত তদধীনস্থ প্রজাবর্গের শুভানুধ্যান করেন! তাহা হইলে ক্রমে ভারতবাসীরা ইংলণ্ডের প্রজাগণের ন্যায় স্বাধীনতাসুখ ভোগে সমর্থ হইবে। তাঁহার ইচ্ছা ছিল না যে, মগ বা চিনারা ভারতবর্ষ জয় করত ইংরাজদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলে আমরা সুখী হইব অথবা বাঙ্গালিরা যুদ্ধে ইংরাজদিগকে পরাজিত করিলেই স্বাধীন হইব। স্বাধীনতা যে কি এবং তজ্জনিত সুখ কি প্রকারে সম্ভোগার্হ তাহা হরিশ বাবুই বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন। যদি ক্রমে কর্ত্তৃপক্ষ ভারতবর্ষীয়দিগকে উপযুক্ত বিবেচনায় রাজ্যশাসনে অংশ প্রদান করেন, যদি আমরা পার্লিয়ামেণ্টে আপনাপন জন্মভূমির হিত বাসনার পরামর্শে রত হই, তাহা হইলেই আমরা স্বাধীন বলিয়া পরিচিত হইলাম। হায়! যিনি এই সমূহ মঙ্গলময় উপায় উদ্ভাবন করেন, এক্ষণে সেই গুণনিধান, হতভাগ্য বঙ্গবাসীর অদৃষ্টদোষেই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন; এক্ষণে তৎকৃত উপকারের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যদি হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় রোমে বা গ্রীসে, এথেন্সে অথবা ইজিপ্টে জন্ম গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে আজি তাঁহার মৃত্যুতে সংসার শোকচিহ্নে অঙ্কিত হইত। প্রশস্ত প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি ও সুবিস্তৃত মণ্ডপ সমূহ তাঁহার স্মরণার্থ নির্ম্মিত হইত, প্রকাশ্য স্থলে তাঁহার গুণগরিমা অনিয়ত সঙ্গীত হইত; তিনি জীবিতাবস্থায় পিতৃতুল্য সম্মান পাইতেন ও দেহাবসানে দেবতার ন্যায় পূজিত হইতেন। কিন্তু যে দেশে উপকার স্বীকার করা সুদূরপরাহত, দুর্ভাগ্যক্রমে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সেই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

"বঙ্গদেশের ব্রাহ্মগণ! এই বার তোমাদিগকে সম্বোধনে উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইয়াছি, তোমাদিগের সহৃদয় বান্ধব হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন; এক্ষণে তাঁহার স্মরণার্থ কোন বিশেষ চিহ্ন স্থাপন করণ জন্য তোমাদিগের সাধ্যানুসারে সাহায্য করা উচিত। সামান্য পৌত্তলিকদিগের ন্যায় তোমাদিগের সংসারের অধিক অর্থ ব্যয় হয় না; তোমরা শুদ্ধ ঈশ্বরের প্রীতির উদ্দেশে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া থাক; পৌত্তলিক কর্ম্মকাণ্ডের সংস্রব রাখ না সুতরাং দেবপূজক উৎসবপ্রিয় বাঙ্গালি হইতে ব্রহ্মজ্ঞানীর সংসার অতি সুলভে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, তন্নিমিত্ত এতাদৃশ অসদৃশ সৎ সংকল্পে

তোমাদিগকেই বিশেষ সাহায্য করিতে হয়, বলিতে গেলে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্ম ধর্ম্মের একজন প্রকৃত আচার্য্য ছিলেন—তাঁহার যত্নেই—তাঁহার পরিশ্রমেই ভবানীপুরে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম নীত ও উপাসনার্থ সমাজমন্দির নির্ম্মিত হয়—তাঁহার স্বদেশহিতচিকীর্ষাগুণে সাধারণে যে পরিমাণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে, তোমাদিগের তদপেক্ষা শত গুণে শোক প্রকাশ করা বিধেয়।

"প্রিয়চিকীর্ষুর স্মরণচিহ্ন স্থাপন করিলে পৌত্তলিক ধর্ম্মের উৎসাহ প্রদান করা হয়, বোধ করি ব্রাহ্ম ধর্ম্মে এরূপ লিখিবে না।

"এক্ষণে তাঁহারে চিরস্মরণীয় করণার্থ ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতার প্রাণপণে কায়মনোবাক্যে সাহায্য করা কর্ত্তব্য ; যদি আমাদের রামমোহন রায়ের নিকট, বিদ্যাসাগরের নিকট, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বিধেয় হয় তাহা হইলে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট শত গুণে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কলিকাতা নগরীয় ঐশ্বর্য্যমত্ত ধনিগণ! একবার স্বদেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টি রোপণ কর। গৃহপতি মদ্যপ ও লম্পট হইলে সংসার যেরূপ বিশৃঙ্খল হয়—তোমাদিগের ঐশ্বর্য্যমত্ততায় বঙ্গদেশের তদনুরূপ দুর্দ্দশা ঘটিতেছে। সাধারণহিতকরী কার্য্যে যদি তোমরা কায়মনে সাধ্যানুসারে সাহায্য না করিবে, যদি তোমরা শ্রেষ্ঠত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া দুরবস্থা মোচনে সচেষ্ট না হইবে তাহা হইলে চিরদিনেও ভারতের সুখ সৌভাগ্যের উন্নতি হইবে না। তোমরা অতুল ধন প্রাপ্ত হইয়াছ তৎসকলই সাধারণহিত কার্য্যে ব্যয় কর আমার এরূপ প্রার্থনা নহে, যদি তোমাদিগের স্মরণমাত্র থাকে যে স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে অযত্ন করা,—সমাজের উন্নতিতে উপহাস ও মঙ্গলময় কার্য্যে ব্যয় না করা ; ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্ট পদার্থ মনুষ্য নামধারীর উচিত নহে—তাহা হইলে বিজ্ঞানবিহীন বন্য মর্কটে ও ঐ ধনীতে বিশেষ কি; তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবেক। যদি তোমরা বিশ্রাম সুখশয্যায় শায়িত হইয়া নিজ নিজ অবস্থা বিষয়ে চিন্তা কর, যদি তোমরা এক দিনের জন্যও ভাবিয়া দেখ যে, ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া এত অতুল ধনের অধিপতি হইয়া জন্মভূমির কি উপকার সাধন করিলাম, কয়জন অনাথ তোমাদের সাহায্যে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া মনুষ্য নামে পরিচয় দানে সমর্থ হইতেছে? কয়জন বিধবা তোমাদিগের উদ্যোগে পুনর্ব্বার পতি প্রাপ্তে বিবিধ দুষ্কৃতি হইতে মুক্ত হইয়াছে? স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে কোন্ বিখ্যাত ধনি কয় টাকা ব্যয় করিয়াছে? তোমরা মৃত পিতা মাতার শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষ্যে, পুত্র কন্যার বিবাহ সময়ে ধন ব্যয় করিয়া থাক সে কেবল প্রশংসা লাভের একমাত্র উপায়, তাহাতে তোমাদের লাঙ্গুল আরও ফুলিয়া উঠে এবং শ্রীরামচন্দ্রের মত আত্মবিস্মৃত হও, তোমাদিগের আত্মবিস্মৃতি, সামান্য লোকদিগের যাতনার কারণ মাত্র।

"তোমরা স্থির করিয়াছ যে, তোমরা হনুমানের ন্যায় অমর, কখনই মরিবে না—চিরকাল বালাখানায় বৈঠকখানায়—বাগানে সুখে বিহার করিবে, স্বদেশের শুভ চিন্তায় বিব্রত হওয়া, তাহার শ্রীসাধন কার্য্যে ব্যয় করা মুর্খের কার্য্য সুতরাং এবিষয়ে তোমাদিগের অপেক্ষা নীলকার্য্যের প্রজাগণে অধিক সাহায্য

করিবে—কৃষকের সরল হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে পরিপূর্ণ। আজি যদি সোনা-গাজীর খোঁড়া ব্রহ্মের শ্রাদ্ধ হইত বা পাগলা ছিরুর সপিণ্ডন হইত তাহা হইলে তোমরা সাহায্য করিতে পথ পাইতে না; আজি আস্তাবল বা হোটেলরক্ষক কোন ফিরিঙ্গী মরিলে সাধ্য মতে সাহায্য করিতে। তোমরা চালচিত্রের অসুরের মত সুদৃশ্য দর্শনীয় নতুবা পদার্থে তৃণ হইতেও নিকৃষ্ট। এক্ষণে উপসংহার সময়ে বঙ্গদেশবাসীদিগের নিকট আমার নিবেদন এই, যে মহাত্মা তোমাদিগের এত উপকার সাধন করিয়াছেন, যদ্দ্বারা অনেক বিষয়ে তোমরা প্রাপ্তকাম ও পূর্ণমনোরথ হইয়াছ; যিনি নিজ ধীশক্তিবলে সানশোধিত মণির ন্যায় মেঘত্যক্ত দিনকরের ন্যায় স্তবকত্যক্ত পুষ্পের ন্যায় বাঙ্গালিসমাজ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহারে চিরস্মরণীয় কর।

"নীলকরহৃতসর্ব্বস্ব বঙ্গদেশীয় প্রজাগণ! আমি বঙ্গদেশীয় কি ধনবান্ কি গৃহস্থ সকলকে উপেক্ষা করিয়া প্রথমে তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দি, দেখিও কৃষকের কোমল হৃদয়ে যেন অকৃতজ্ঞতা স্পর্শ করিতে না পারে। যে মহাত্মা তোমাদিগের জীবনপ্রদান করিয়াছেন; যাহা হইতে তোমরা যম-যাতনাপেক্ষা গুরুতর ক্লেশে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছ; সুদ্ধ যাহার একমাত্র যত্নে তোমাদিগের সর্ব্বস্ব রক্ষিত হইয়াছে; সতীগণে সতীত্ব রক্ষায় সমর্থ হইয়াছে; অকালমৃত্যু, উদ্বন্ধনে প্রাণনাশ গ্রামদাহ রহিত হইয়াছে। ভারত-বর্ষের যেরূপ ভাগ্যদেবতা সহায়েও তোমাদিগের যে দুরবস্থার অপনোদন না হইত একা হরিশ্চন্দ্রের দ্বারা তাহা পরিপূর্ণ হইয়াছে সুতরাং তাঁহারে —অভীষ্ট দেবতার ন্যায় পিতার ন্যায় ও প্রাণদাতার ন্যায় স্মরণ করা কর্ত্তব্য। আমার আর অধিক বলা প্রয়োজনাভাব, যদি তোমরা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কৃত উপকারে কৃতজ্ঞ না হও তাহা হইলে তোমরা কি বলিয়া মুখ দেখাইবে বলিতে পারি না এবং পরিণামে তোমাদের যে কি দুর্দ্দশা হইবে তাহারও ইয়ত্তা করা যায় না।"

সারস্বতাশ্রম
১৭৮২ *শকাব্দাঃ

* ইহা ১৭৮৩ শক হইবে

সংবাদপত্রের রিপোর্ট থেকেই দেখা যাবে যে হরিশ স্মৃতিরক্ষার কাজ বিশেষ অগ্রসর হয় নি। ১৮৬১ সালের ৯ ই নভেম্বর স্মৃতিরক্ষা সমিতির অন্যতম সদস্য কালীপ্রসন্ন কার্যনির্বাহক সমিতির কাছে এক পত্রে প্রস্তাব করেন যে যদি হরিশের কোন স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে তিনি তাঁর সুকিয়া বাগান অঞ্চলের দুই বিঘা জমি দান করতে সম্মত। পত্রে তিনি প্রস্তাব করেন যে হরিশ স্মৃতিমন্দিরে গ্রন্থাগার স্থাপিত হতে পারে, সেখানে নিয়মিত বিবিধ বিষয়ে বক্তৃতার আয়োজন করা যেতে পারে। তিনি কিছুটা ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, "A public building of this description has long been a desideratum, and we would but ill serve the public interests did we miss this opportunity of supplying it. I need hardly add that nothing could be a more fitting testimonial to the memory of the lamented deceased than this, who, be it remembered, was a staunch and earnest friend to the promotion of worthy intellectual and social intercourse among our countrymen."[১৫] বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে কালীপ্রসন্নের প্রস্তাব ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে কাজ কিছুই হয় নি। মন্মথনাথ ঘোষ লিখেছেন—"হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পনের বৎসর পরে হরিশচন্দ্র ফাণ্ডের সংগৃহীত ১০, ৫০০ সার্দ্ধ দশ সহস্র মুদ্রা বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভার গৃহনির্মাণ কার্যে ব্যয়িত হইয়াছিল, এবং আজিও এই সভাগৃহের নিম্নতলে কতকগুলি কীটদষ্ট গেজেট, রিপোর্ট ও সংবাদপত্রে পরিপূর্ণ পূতিগন্ধময় অন্ধকারকক্ষের সম্মুখে একখানি ক্ষুদ্র প্রস্তরফলকে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় লাইব্রেরী, এইবাক্য কয়টি ক্ষোদিত আছে। ইহাই ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিকের, সর্বশ্রেষ্ঠ স্বদেশ প্রেমিকের স্মৃতিচিহ্ন বলিয়া নির্দিষ্ট হইতেছে। বাঙালীর জাতীয় কলঙ্কের এরূপ নিদর্শন আর কোথাও আছে কি ?"[১৬] কেন হরিশ স্মৃতিমন্দির হল না তার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে রামগোপাল সান্যাল বলেছেন,—"After a lapse of full 16 years, a dark room in the lower floor of the building of the British Indian Association was solemnly inaugurated and declared as 'Hurish Chunder Library.' The truth of the matter is that some of the influential members of the Association who had contributed handsomely to the fund, contrived in collusion with Babu Kristo Das Pal, to appropriate the entire fund to the erection of the building of the Association, and a nominal memorial was raised, to the great shame of the entire Bengalee nation."[১৭] এই একই ব্যাপার আমরা লক্ষ্য করি হরিশের জীবনী রচনার ক্ষেত্রেও। ১৮৬১ সালের ৩ রা অক্টোবর 'হিন্দু পেট্রিয়টে' এই মর্মে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় যে, হরিশের জীবনী রচনা করবেন শম্ভুচন্দ্র

মুখোপাধ্যায়। কিন্তু সে জীবনী রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায় না। হরিশচন্দ্রের প্রথম জীবনচরিতকার রামগোপাল সান্যাল। ১৮৮৭ সালে তাঁর বাংলা ভাষায় লিখিত হরিশ জীবনী প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "আজ প্রায় ২৭ বৎসর হইল, বঙ্গের শিরোভূষণ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। এ পর্যন্ত তাঁহার জীবনী ইংরাজীতে কিম্বা বাঙ্গালায় কেহই লিখিতে প্রয়াস পান নাই।" ১৮৮৯ সালে রামগোপাল "A general Biography of Bengal celebrities" গ্রন্থেও হরিশজীবনী সম্পর্কে আলোচনা করেন। ফ্রামজি বোমানজিও ইংরেজীতে হরিশচন্দ্রের জীবনী রচনা করেন।

টীকা

১—Reminiscenes and Anecdotes of great men of India. R. G. Sanyal, P-82
২—এক্ষণ পৌষ-মাঘ ১৩৭৭, পৃঃ ৪২
৩—Reminiscenes and Anecdotes of...P-83
৪—Life of Girish chandra Ghosh. M. N. Ghosh. P—89
৫—যশোর খুলনার ইতিহাস, পৃঃ ৭৮৫
৬—The phoenix, 17. 6. 1861
৭—সোমপ্রকাশ, ১৭, ৬. ১৮৬১
৮—The Friend of India 20. 6. 1861
৯—Mookerjee's Magazine, June, 1861.
১০—এক্ষণ, ঐ, পৃঃ ৪৩
১১—ঐ
১২—Hindoo Patriot, 17. 7. 1861.
১৩—এক্ষণ, ঐ, পৃঃ ৪৩-৪
১৪—মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ। মন্মথনাথ ঘোষ।
১৫—মহাত্মা কালীপ্রসন্ন, ঐ, পৃঃ ৩৩
১৬—ঐ, পৃঃ ৩৩-৪
১৭—Reminiscenes and Anecdotes of..., P. 34.

দ্বিতীয় অধ্যায়

হিন্দু পেট্রিয়ট ও হরিশচন্দ্র

ক.

ভারতবর্ষের সাংবাদিকতার ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন যে, ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের সময় থেকেই ভারতবর্ষে যথার্থ সাংবাদিকতার সূত্রপাত হয়। তবে একথাও তিনি স্বীকার করেছেন যে, আঁগামেমননের আগেও যেমন জেনারেল ছিলেন, তেমনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগেও এদেশে সংবাদপত্রের সুযোগ্য সম্পাদকের অভাব ঘটেনি।[১] বিদেশী লেখকের এই মন্তব্য বাংলাদেশ সম্পর্কে খুবই সত্য। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই এদেশে সাংবাদিকতার সূত্রপাত হয়েছে। সমাচার দর্পণ, সংবাদ কৌমুদী, সমাচারচন্দ্রিকা, বঙ্গদূত, সংবাদ প্রভাকর, জ্ঞানান্বেষণ, সংবাদ রত্নাবলী, সংবাদদিবাকর, সংবাদ গুণাকর, সংবাদ ভাস্কর, সংবাদ রসরাজ প্রভৃতি পত্রিকার নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে বাংলাদেশে সংবাদপত্রের নূতন গতিবেগ সূচিত হয়। দেশীয় মানুষদের প্রতি ইংরেজ শাসকদের ঘৃণা, বিচারাদির ক্ষেত্রে দেশীয় মানুষদের প্রতি অবিচার এই সমস্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইতিমধ্যে শিক্ষার বিস্তার এবং রাজনৈতিক চেতনার জাগরণের ফলে বিদেশীদের নিপীড়ন ও অবিচার সম্পর্কে বাঙালী সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। সমকালীন সংবাদপত্রগুলিতে তারই প্রতিফলন পড়ে। ১৮৪০ থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যবর্তী সময়ে যে সমস্ত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলির মধ্যে অবশ্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলি ততখানি আলোচিত হত না, যতখানি আলোচনা থাকত ধর্মবিতর্ক সম্বন্ধে। এই সময়কালে গ্রাম বাংলার বিভিন্ন স্থানেও সংবাদপত্রের প্রকাশ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।[২]

১৮৪২ সালের 'স্বল্পজীবী বিদ্যাদর্শন' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর ছিলেন পত্রিকাটির উদ্যোক্তা। বাংলা ভাষাচর্চা এবং সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণ এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য ছিল পত্রিকাটির। ১৮৪৩ সালে ১৬ই অগস্ট প্রকাশিত হয় 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা। মূলত ব্রাহ্মধর্মের প্রচার পত্রিকাটির উদ্দেশ্য হলেও ধর্মীয় আলোচনা ছাড়া এই পত্রিকায় সামাজিক—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। সামাজিক আদর্শ হিসাবে 'তত্ত্ববোধিনী' গ্রহণ করেছিল দেশপ্রেমকে। জাতীয় প্রগতির ক্ষেত্রে, পত্রিকার মতে, দেশপ্রেম অপরিহার্য। বিদেশীর অন্ধ অনুকরণ নিন্দিত হয়েছিল এই পত্রিকায়। অবশ্য অন্ধদেশপ্রেমও পত্রিকা কর্তৃক সমর্থিত হয়নি। মিশনারীদের বিরুদ্ধেও এই পত্রিকা আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করেছিল। সমকালীন জ্ঞানারুণোদয়, ধর্মরাজ প্রভৃতি পত্রিকাও মিশনারীদের

বিরুদ্ধে এবং ইংরেজ সরকার কর্তৃক মিশনারীদের সমর্থনের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছিল। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় কৃষকদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শিত হয়। কৃষকদের দুঃখ দারিদ্র্যপূর্ণ অবস্থা সম্পর্কে ধারাবাহিক রচনাও এতে প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকা সামাজিক সংস্কার কার্যকেও মদত জুগিয়েছিল।

১৮৪৭-৪৮ সালে সংবাদজ্ঞানাঞ্জন, রঙপুর বার্তাবহ, সংবাদ দিগ্বিজয়, সংবাদ মনোরঞ্জন, আক্কেল গুড়ুম, সংবাদজ্ঞানরত্নাকর, সংবাদ মুক্তাবলী, সংবাদ কৌস্তুব, জ্ঞানচন্দ্রোদয় ইত্যাদি পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত পত্রিকায় রাজনৈতিক সামাজিক বিষয়েরও কিছু কিছু আলোচনা থাকত। ১৮৪৯ সালে জয়কালী বসু কর্তৃক প্রকাশিত 'মহাজন দর্পণ' প্রথম বাণিজ্য সংক্রান্ত সাময়িক পত্র! ১৮৪৯ সালে ব্ল্যাক এক্ট আন্দোলন সুরু হয়। 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রিকাটি এই আন্দোলন সম্পর্কে বিবিধ রচনাদি প্রকাশ করে। এই পত্রিকায় ব্ল্যাক এক্ট আন্দোলনে দেশীয়দের ব্যর্থতার কারণ হিসাবে রাজনৈতিক অনৈক্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে আরো বহু সাময়িক পত্রিকার উদ্ভব ঘটে সামাজিক সংস্কারের প্রেরণাতেই। সর্বশুভকরী পত্রিকা, জ্ঞানারুণোদয়, সুলভ পত্রিকা সামাজিক সংস্কারকে মদত জুগিয়েছিল। ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী' পত্রিকায় সামাজিক সংস্কার এবং শিক্ষাবিস্তারের উপর রচনাদি প্রকাশিত হয়। জ্ঞানারুণোদয় পত্রিকায় বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশিত হয় তীব্র সমালোচনা। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি কিভাবে দেশীয় জনগণকে শোষণ করছে তার বিস্তৃত বিবরণ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে।[৪] নবীনচন্দ্র আঢ্যের বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা ছিল বৃটিশ শাসনের আর এক সমালোচক। এই পত্রিকায় লেখা হয় যে, হিন্দু রাজাদের আমলে প্রাচীন ভারত ছিল সম্পদশালী, বিদেশী শাসন-শোষণে সম্প্রতি তার জীর্ণদশা উপস্থিত হয়েছে। বিদেশী বণিকদের অর্থনৈতিক শোষণের ফলে দেশের মানুষ আজ অনাহারে ধুঁকছে।[৫] ১৮৫৬ সালে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে কর্তৃক প্রকাশিত অরুণোদয় পত্রিকাটিতে কোম্পানির শাসন সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। পরিহাস করে পত্রিকায় লেখা হয়, বণিক সন্তানরা শোষণ লুণ্ঠনের মাধ্যমে রাজ-সন্তানে পরিণত হয়েছে।[৬] ১৮৫৫ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত প্রকাশিত পত্রিকার তালিকা হল: জ্ঞানবোধিনী, বঙ্গবার্তাবহ, এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ, মজিলপুর পত্রিকা, উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা, সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা, সর্বার্থ প্রকাশিকা, লোকলোচন চন্দ্রিকা ইত্যাদি। ১৮৪০ থেকে '৫৭র মধ্যে বাংলা সংবাদপত্রের জগতে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল একথা ঠিকই, কিন্তু এগুলি জনমতের বাহন কতখানি হয়ে উঠেছিল তা আলোচনার বিষয়। পত্রিকা-গুলির প্রচার সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। জেমস্ লঙ্ প্রদত্ত নিম্ন তালিকাটি সেই কথাই প্রমাণ করে।[৭]

বিবিধার্থ সংগ্রহ	...	৯৫
উপদেশক	...	২০০
ভাস্কর	...	৪০০
জ্ঞানোদয়	...	১৫০
ধর্মরাজ	...	৫০০
সুলভ পত্রিকা	...	৮৫০
সাধুরঞ্জন	...	৮০০
প্রভাকর	...	৮০০
নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা	...	২৫০
পূর্ণচন্দ্রোদয়	...	৪০০
রসরাজ	...	১৫০
সত্যার্ণব	...	৪০০
তত্ত্ববোধিনী	...	৭৫০
বার্তাবহ	...	১০০
জ্ঞানারুণোদয়	...	৩০০
সংবাদ সাগর	...	২০
সমাচার চন্দ্রিকা	...	৩৫০

১৮৫০ সালে জেমস লঙ এই তালিকা তৈরী করেছিলেন। এর দশ বছর পরে ১৮৬০ সালে ইন্ডিগো কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে জেমস লঙ অবশ্য স্বীকার করেছিলেন যে, ইতিমধ্যে দেশীয় সংবাদপত্রের প্রচার বৃদ্ধি ঘটেছিল। কমিশনের সামনে তিনি নিম্ন তালিকাটি পেশ করেন।[৮]

সাল	প্রচার সংখ্যা
১৮২৬	৮, ০০০
১৮৫৩	৩০০, ০০০
১৮৫৭	৬০০, ০০০

এবার আমরা বাঙালি কর্তৃক সম্পাদিত ইংরেজি পত্রিকার কথা আলোচনা করব। ১৮৩০ সালে এ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশনের সভাপতি ডিরোজিওকে সামনে রেখে সমিতির সদস্যরা Parthenon নামক একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ভারতবর্ষে বৃটিশের স্থায়ীভাবে বসবাস, বিচারাদালতে অনাচার এবং অবিচার, স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি কয়েকটি সমকালীন বিতর্কমূলক বিষয় সম্পর্কে পত্রিকাটিতে রচনাদি প্রকাশিত হয়। কিন্তু কলেজের অধ্যক্ষসভা ছাত্রদের রাজনীতিক ও সামাজিক বিষয়ের আলোচনা সহ্য করতে পারেন নি। সহ-সভাপতি ডঃ উইলসনকে দিয়ে দ্বিতীয় সংখ্যা Parthenon মুদ্রিত হলেও তার প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই রকম স্বাধীন মতামত প্রকাশ ও আচার আচরণ প্রচলিত ব্যবস্থার বিরোধী হওয়ায় ছাত্রদের বিশেষ নির্যাতন ভোগ করতে হয়। এরই ফলশ্রুত স্বরূপ ১৮৩১ সালে ২৫শে এপ্রিল

ডিরোজিওকে বিতাড়িত হতে হয় হিন্দু কলেজ থেকে।[৯] ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুর Indirn Reformer নামক একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর এবং শ্যামাচরণ ঠাকুর ছিলেন এই পত্রিকাটির সত্বাধিকারী। পত্রিকাটিতে প্রথম প্রথম নানাবিষয়ে রচনাদি প্রকাশিত হত। পত্রের শেষে থাকত সম্পাদকীয় মন্তব্য। এছাড়াও সম্পাদক নিজে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করতেন। রামমোহন রায়ের আদর্শ এবং বিভিন্ন বিষয়ের মতামত এইসব আলোচনার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, স্বাধীন জাতি সমূহের আদর্শে স্বাধীনতা এবং সত্যের জন্য আকাঙ্খা পত্রিকাটিতে প্রতিফলিত হত বলে এটি নব্য বাংলার প্রগতিশীল সম্প্রদায়ের মুখপত্র রূপে গৃহীত হয়। প্রসন্নকুমার ঠাকুর এই পত্রিকার মাধ্যমে তৎকালীন জাতীয় সমস্যাগুলিরও আলোচনা করেছিলেন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদি রাজদ্রোহমূলক ছিল বলে সমকালীন ইংরেজ পরিচালিত ইংরেজি পত্রিকাগুলি মন্তব্য করে।* প্রসন্নকুমার জমিদার হলেও কিছুদিন তিনি সরকারী নিমক মহালে চাকুরীজীবী ছিলেন। অথচ স্বাধীনভাবে সংবাদপত্র সম্পাদনা করতে হলে সরকারের সঙ্গে আর্থিক সংশ্রব রাখা বাঞ্ছনীয় নয়। বিশেষতঃ যখন Reformer পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ হতে থাকে তখন প্রসন্নকুমার সরকারী পদে বেশিদিন অধিষ্ঠিত থাকা সমীচীন বোধ করেন নি।[১০] Reformer—এর মত অনুরূপ আর একটি পত্রিকার নাম Bengal Recorder. রামগোপাল ঘোষ সম্পাদিত ১৮৪২ সালে প্রকাশিত এই পত্রিকাটি প্রথমে মাসিক পরে পাক্ষিক ও সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয়। এই পত্রিকাটিও ছিল সেকালের প্রগতিশীল সম্প্রদায়ের মুখপত্র। ১৮৪২ সালে নব্যবঙ্গ সমাজের আর একজন প্রধান নেতা তারাচাঁদ চক্রবর্তী quill নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। যোগেশচন্দ্র বাগল জানিয়েছেন যে, ১৮৪৩ সালের নভেম্বর মাসে অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য Bengal Spectator পত্রিকাটি তুলে দিতে হয়। কিন্তু রাজনীতি চর্চার জন্য সংবাদপত্র ছিল প্রয়োজনীয়। তাই খুব সম্ভব এই সময় Quill পত্রিকা প্রকাশ করে তারাচাঁদ এই অভাব মিটিয়ে ছিলেন।[১১] অথচ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ১৮৪২ সালকেই Quill পত্রিকা প্রকাশের তারিখ বলে উল্লেখ করেন।[১২] পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এই পত্রিকা সম্পর্কে লিখেছিলেন—"তিনি (তারাচাঁদ) The quill নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিতেন। এবং তাহাতে গবর্ণমেণ্টের রাজকার্যের দোষগুণ বিচার করিতেন। তাহা গবর্ণমেণ্ট কর্তৃ ব্যক্তিগণের অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।"

১৮৪২ সালে নব্যবঙ্গদলের আর একটি মুখপত্র Bengal Spectator প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশিত হয়। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রবর্তনে দেশ থেকে কুসংস্কার দূর হবে বলে পত্রিকাটি মনে করে। ১৮৪৩ সালের ৫ আইনের বলে দাসত্বের নিষেধকরণকে পত্রিকাটি স্বাগত জানায়। জমিদার এবং তালুকদারের নানাবিধ

শোষণের বিরুদ্ধেও পত্রিকায় ধারাবাহিক লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ভুক্তরা এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শোষিত শ্রমিকদের পক্ষেও এ পত্রিকা দাঁড়িয়েছিল। ভারতবর্ষ থেকে দূরে অবস্থিত কলোনি অঞ্চলে শ্রমিকদের নিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে এবং কুলিদের নির্বাচন পদ্ধতির বিরুদ্ধে পত্রিকাটিতে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়। এই পত্রিকা শাসন-কার্যের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষীকরণকে সমর্থন জানায়। ১৮৩৩ সালের সনদে অবশ্য বলা হয়েছিল যে, জাতিবর্ণ নির্বিশেষেই শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করা যাবে। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সনদের এই নির্দেশকে খুব মান্য করেন নি। শাসন ব্যাপারের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি শ্বেতাঙ্গরাই অধিকার করতেন। স্পেকটেটার এই বৈষম্যের তীব্র প্রতিবাদ করে। এই পত্রিকার মতে রাজস্ব-সংগ্রহ, বিচারালয় স্থাপন এবং শান্তি শৃংখলা রক্ষার জন্য পুলিশ বাহিনী নিয়োগই সরকারের একমাত্র কাজ নয়, দেশীয়দের পর্যাপ্ত শিক্ষাদানও তার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। প্রয়োজনমুখী শিক্ষার উপর পত্রিকাটি গুরুত্ব আরোপ করে, কারণ এইরূপ শিক্ষার ফলেই বাঙালি ব্যবসায়ে স্বাধীনভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবে এবং অর্থনীতিকভাবে স্বয়ম্ভর হতে পারবে।[১৩]

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার জানিয়েছেন যে, ১৮৩৯ সালে কলকাতায় ২৬টি ইউরোপীয় সম্পাদিত পত্রিকা ছিল। এরমধ্যে ৬টি ছিল দৈনিক। ১৮৫১ সালের পূর্বে আরো কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে ENGLISH MAN এবং FRIEND OF INDIA বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু দু একটি ব্যতীত এ সমস্ত পত্রিকাতে ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হত। ডঃ মজুমদার লিখেছেন…

"১৮৫৩ সনে প্রকাশিত Hindoo Patriot নামক সাপ্তাহিক পত্রিকাতে বাংলার নবজাগ্রত রাজনীতির চেতনার উন্মেষের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমে (১৮৪৯) কলিকাতায় একটি সম্ভ্রান্ত ঘোষ পরিবারের তিন ভ্রাতা Bengal Recorder নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিন চারি বৎসর পরে স্বনামধন্য হরিশচন্দ্র মুখার্জী ইহাঁর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন ও ইহার নাম হয় Hindoo Patriot। সম্পাদক ও রাজনীতিক নেতা হিসাবে উনিশ শতকের ইতিহাসে হরিশচন্দ্র মুখার্জীর নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

"এই পত্রিকার প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে দেশের স্বার্থ এবং যে সমুদয় রাজনীতিক ও সামাজিক কুব্যবস্থা দেশের বর্তমান দুর্দশার কারণ, নিরপেক্ষভাবে তাহার বিচার ও প্রচার করা। আরও বলা হইয়াছে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ভারত শাসনে নূতন সনদ দেওয়ার উপলক্ষে যে আলোচনা ও তর্ক বিতর্কের সূত্রপাত হইয়াছে তাহার ফলে যাহাতে ভারতের শাসনের সংস্কার হয় সেজন্য ভারতবাসীর পক্ষ হইতে উপযোগী যুক্তি উপস্থাপিত ও সমর্থন করা এবং এ সম্বন্ধে যতটুকু সাধ্য চেষ্টা করা প্রত্যেক ভারতবাসীরই

কর্তব্য। এই পত্রিকাখানি দেশের শাসন সংস্কার ও নানাবিধ দুঃখ দুর্দশা দূর করার কার্যে কি পরিমাণ সাহায্য করিয়াছিল এই গ্রন্থের নানা স্থানে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে।"[১৪]

খ.

হিন্দু পেট্রিয়টের জন্মের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন হরিশ জীবনীকার রামগোপাল সান্যাল। শ্রীসান্যাল-এর সব মন্তব্যকে অবশ্য পরবর্তীকালে সকলে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে নিতে পারে নি। শ্রীসান্যাল হিন্দু প্যাট্রিয়টের জন্মের কি বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন প্রথমে তা উদ্ধৃত করা যাক: কলকাতার বড়বাজারের কালাকার স্ট্রীট জনৈক মধুসূদন রায়ের একটি প্রেস ছিল। একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করার চিন্তা এক সময় তাঁর মাথায় আসে। ১৮৫৩ সালের প্রথমদিকে এই প্রেস থেকেই হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রথমে পত্রিকায় তিনজন সম্পাদক ছিলেন। এই তিনজন হলেন সিমলা অঞ্চলের ঘোষ ভ্রাতৃত্রয়—শ্রীনাথ ঘোষ, গিরিশ ঘোষ এবং ক্ষেত্রনাথ ঘোষ। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই তিনজন সম্পাদককে প্রথমদিকে সাহায্য করতেন। তিন চার মাস বাদে হরিশচন্দ্রের উপরই সমূহ দায়িত্ব পড়ে। সেকালে সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যাপারে নানা অসুবিধা দেখা দিত। প্রথমতঃ, সংবাদপত্রের পাঠক কম ছিল, দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষিত লোকেরা দেশীয় লোকেদের দ্বারা সম্পাদিত সংবাদপত্র পাঠ করার ব্যাপারে অনীহ ছিল। তাছাড়া হিন্দু পেট্রিয়টের অফিস ছিল বড়বাজারের এক গলিতে। যাতায়াতের অসুবিধাও ছিল এর একটা মস্ত কারণ। এই কারণেই কিছুকাল পরে ১২ নং রাধাবাজার স্ট্রীটে পেট্রিয়টের অফিস স্থানান্তরিত হয়। হরিশচন্দ্র এ সময় পত্রিকাটিকে দাঁড় করানোর জন্য অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করেছিলেন। বিনা পারিশ্রমিকে তিনি পেট্রিয়ট সম্পাদনা করতেন। অফিস স্থানান্তরিত হবার পরেও পত্রিকার কোন উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল না। লাভ তো দূরের কথা, উৎপাদন ব্যয়ে ঘাটতি থাকত। হরিশচন্দ্র ভবানীপুরবাসী ছিলেন। প্রত্যহ রাজাবাজারে আসা এবং রাত্রিযাপন করা তাঁর পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছিল। পত্রিকার অবস্থার অবনতি দেখে মধুসূদন রায় হরিশচন্দ্রের নিকট প্রেস ও পত্রিকাখানি বিক্রয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। হরিশচন্দ্র এ প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেন। বহু কষ্টে অর্থ সংগ্রহ করে প্রেস ও পত্রিকার স্বত্ব তিনি ক্রয় করেন। এরপর তিনি ভবানীপুরে নিজের বাড়ির কাছাকাছি কালীঘাট রাস্তার উপরে মৌলভি হবিবুল হোসেনের প্রাসাদের বিপরীত দিকে একটি বাড়ি লিজ নিয়ে প্রেস স্থাপন করেন। ভ্রাতা হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামেই তিনি প্রেস পত্রিকাখানি ক্রয় করেছিলেন। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন উমাচরণ দে। পত্রিকার বাৎসরিক চাঁদা ছিল দশ টাকা। তখনও কিন্তু ১০০ জনের বেশী গ্রাহক পত্রিকায় ছিল না। প্রেস স্থানান্তরিত করার ফলে অবশ্য কিছুটা সুবিধা হয়। ১৮৫৩ থেকে ৫৫ পর্যন্ত হরিশচন্দ্র বহু অর্থ এবং সময় ব্যয় করে পত্রিকা পরিচালনা করেছিলেন। হিন্দু পেট্রিয়ট দেশের মঙ্গলসাধনে ব্রতী হল বটে, কিন্তু তার আয় থেকে কিছুতেই ব্যয় পোষাত না। অন্যের

সাহায্য নিয়ে পত্রিকা চালাতে হরিশচন্দ্র নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি বলতেন কাগজের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে পরপ্রত্যাশী হওয়া ভাল নয়, তৎকালীন প্রসিদ্ধ জমিদার পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ হিন্দু পেট্রিয়টের দুরবস্থা দেখে অর্থ সাহায্য করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু হরিশ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এদিকে হিন্দু পেট্রিয়টের মুদ্রণ দিন দিন খারাপ হতে থাকে। অক্ষর পুরাতন হওয়ায় তার ছাপও ভাল হত না। হিন্দু পেট্রিয়ট সময় সময়, বিকৃতভাবে খারাপ কাগজেও ছাপা হতে থাকে। তখন বাধ্য হয়ে হরিশ রাজা প্রতাপচন্দ্রের সাহায্য গ্রহণ করেন।

রামগোপাল সান্যাল লিখেছেন যে, ১৮৫৪ সালে হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজে হরিশচন্দ্র হিন্দু ও ইউরোপীয় সভ্যতার তুলনা করে পাণ্ডিত্যপূর্ণ দীর্ঘ এক প্রবন্ধ রচনা করেন। এতে হরিশ এত পাণ্ডিত্য এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন যে, তৎকালীন ইংরেজ সম্পাদকেরা এই প্রবন্ধের সমুচিত উত্তরদানে অসমর্থ হয়েছিলেন। এই প্রবন্ধটিতে ইউরোপীয় সভ্যতার যে সমস্ত দোষ আছে বিশদ-রূপে তা বর্ণনা করা হয় এবং হিন্দুদের যে 'অর্ধসভ্য' বলে সময় সময় সাহেবরা কটূক্তি করতেন তারও উত্তর প্রদান করা হয়। আর একবার হরিশ বাঙালির ধর্মঘট এবং ইংরেজ মজুরদের 'চক্রান্ত প্রণালী' বা Strike—সম্বন্ধে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। এই প্রবন্ধে তাঁর পাশ্চাত্য ও এদেশীয় সমাজনীতি সম্পর্কে বিশদ অভিজ্ঞতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সময় লর্ড ডালহৌসী ভারতের গবর্ণর জেনারেল ছিলেন। ১৮৫৬ সালে তিনি অযোধ্যা রাজ্য অধিগ্রহণ করেন। অত্যাচারী দেশীয় রাজার অধীনে থাকা অপেক্ষা ইংরেজ শাসনে প্রজার বেশি সুখলাভ হবে এই ছিল ডালহৌসীর অধিগ্রহণের ধুয়া। ইতিপূর্বে ১৮৪৯ সালে সেতারার রাজা অপত্যশূন্য হয়ে প্রাণত্যাগ করলে তাঁর মৃত্যুকালীন দত্তকপুত্র গ্রহণ করবার উইল রদ করে এ রাজ্য বৃটিশ রাজ্যভুক্ত করে নেওয়া হয়। ১৮৫৪ সালের ঝান্সি রাজ্য এবং তারপরে নাগপুর রাজ্য এইভাবে গ্রাস করা হয়। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় হরিশচন্দ্র এই সকল কাজের দোষ দেখিয়ে ডালহৌসীর শাসনপ্রণালীর অনিষ্টকারিতা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করেই হিন্দু পেট্রিয়টের খ্যাতি সমধিক বিস্তৃত হয়। রামগোপাল লিখেছেন, "The outbreak of the Mutiny marked a fresh departure in the career of the Hindoo Patriot. It was during this time that it first asserted itself and was universally acknowledged."

এই সময় থেকেই কৃষ্ণদাস পাল, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিরা পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। হিন্দু পেট্রিয়ট বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের নীতি এবং উদ্দেশ্যকেও প্রচার করতে থাকে। ১৮৫৯ সালে হরিশচন্দ্র কলেরা রোগাক্রান্ত হন। ফলে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং কৃষ্ণদাস পাল যৌথভাবে পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শম্ভুচন্দ্র সহকারী সম্পাদক

হিসাবে কাজ চালাতে থাকেন এবং কৃষ্ণদাস পাল সপ্তাহে একটি করে প্রবন্ধ লিখতে থাকেন।[১৫]

Reis and Rayot—পত্রিকায় হিন্দু পেট্রিয়টের নিম্ন জন্ম-কাহিনী বিবৃত হয়েছে ঃ

১৮৫৩ সালে বড়বাজারের মধুসূদন রায় ঘটনাচক্রে একটি প্রেসের মালিক হন। এই প্রেস থেকেই একটি ইংরেজি সংবাদপত্র প্রকাশ করার ইচ্ছায় তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীনাথ ঘোষ এবং ক্ষেত্রনাথ ঘোষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। মধুসূদন রায়ের প্রস্তাবে ঘোষ ভ্রাতৃত্রয় সম্মত হন। তখন 'বেঙ্গল রেকর্ডার' পত্রিকার জায়গায় রায়-প্রস্তাবিত এই নতুন পত্রিকাটিকে স্থাপন করার সিদ্ধান্ত হয়। ১৮৫৩ সালের জানুয়ারি মাসের কোন এক সন্ধ্যেবেলায় ক্ষেত্রর বৈঠকখানায় ঘোষ ভ্রাতৃত্রয় সমবেত হন। নতুন পত্রিকার নাম হিসাবে গিরিশ প্রস্তাব করেন Hindoo Standard. শ্রীনাথ প্রস্তাব Hindoo Gentleman. এরপরে আকস্মিকভাবে ক্ষেত্র Hindoo Patriot—নাম প্রস্তাব করেন। তখন সকলে ক্ষেত্রর প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। পত্রিকার প্রথমাবস্থায় হরিশচন্দ্র এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন না। Indian Mirror পত্রিকার একটি পত্রে অবশ্য জনৈক গোবিন্দচন্দ্র ধর লিখেছিলেন যে, পাথুরিয়াঘাটার আঢ্যি পরিবারের লোকেরাই হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা প্রকাশ করেন। আঢ্যি পরিবারের সন্তানদের মত হরিশচন্দ্র ওরিয়েন্টাল সেমিনারির ছাত্র ছিলেন। তিনি পরে এই পত্রিকায় যোগ দেন।[১৬]

কৃষ্ণদাস পাল গিরিশচন্দ্রের শোকসভায় হিন্দু পেট্রিয়টের জন্মের ইতিহাস নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করেন ঃ

চাটার্ড আন্দোলনের সময় কলকাতার জনৈক মধুসূদন রায়ের মাথায় হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা জাগে। তারপর তিনি পত্রিকা পরিচালনার ক্ষেত্রে ঘোষভ্রাতাদের আমন্ত্রণ জানান এবং সম্পাদকীয় কার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। ঘোষ ভ্রাতারা এতে সম্মতিজ্ঞাপন করেন। মধুসূদন রায় তাঁকে বলেন যে, হরিশচন্দ্র হিন্দু পেট্রিয়ট নাম দেন এবং তিনি প্রথম এর দায়িত্বপূর্ণ সম্পাদকপদে নির্বাচিত হন। সম্পাদকীয় কার্যের যোগ্যতা হরিশচন্দ্রের ছিল, রাজনীতিজ্ঞানও তাঁর প্রখর ছিল। গিরিশচন্দ্র এই সুযোগ্য বন্ধুর অধীনে সানন্দে কাজ করতে রাজী হন।

Bengalee পত্রিকার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার প্রথম দিকে হরিশচন্দ্র মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন না, গিরিশচন্দ্র তখন মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন।[১৭] মন্মথনাথ ঘোষ 'বেঙ্গলি' পত্রিকার বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। হরিশচন্দ্র প্রথম দিকে হিন্দু পেট্রিয়টের মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন···ভিন্ন একটি পত্রিকায় প্রকাশিত মধুসূদন রায়ের এই বক্তব্যকে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। তাঁর মতে ১৮৫৩ সালের ৬ই জানুয়ারি বৃহস্পতিবার হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। গিরিশচন্দ্রই ছিলেন পত্রিকার প্রথম সম্পাদক।[১৮]

নিজের এই বক্তব্যকে সমর্থন করার জন্য তিনি বেঙ্গলি, ইন্ডিয়ান মিরার, ন্যাশনাল পেপার প্রভৃতি পত্রিকার বক্তব্য উদ্ধৃত করেন। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর এই সমস্ত পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে যে রচনাদি প্রকাশিত হয় সেগুলিতে বলা হয় যে, গিরিশচন্দ্রই হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন, হরিশচন্দ্র পরে পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত 'রিফ্রেক্টার' পত্রিকাতে গিরিশচন্দ্র সম্পর্কিত নিবন্ধেও বলা হয় যে, গিরিশচন্দ্রই হিন্দু পেট্রিয়টের জনক এবং তিনি আহবান করে আনেন তাঁর সুযোগ বন্ধু হরিশচন্দ্রকে।

মন্মথনাথ ঘোষ আরও জানিয়েছেন যে, গিরিশচন্দ্রের নেতৃত্বে হিন্দু পেট্রিয়ট কয়েক বছর চলার পর হরিশচন্দ্রই পত্রিকার দায়িত্বশীল সম্পাদকের পদে যোগদেন। মন্মথনাথ কৈলাসচন্দ্র বসুর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন আপন বক্তব্যের সমর্থনে।

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনচরিতকার হিন্দু পেট্রিয়টের জন্মবৃত্তান্তের নিম্ন বিবরণ দিয়েছেন ঃ

বেঙ্গল রেকর্ডার পত্রিকার চিতাভস্ম থেকে হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার জন্ম হয়। এই সংস্থার মালিক লাভজনকতা দেখতে না পেয়ে প্রেসটি বিক্রয় করতে মনস্থ করেন। হরিশচন্দ্র, যিনি তখন এই পত্রিকায় প্রবন্ধাদি রচনা করতেন, তিনি প্রেস কিনতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মিলিটারী অডিটার জেনারেলের বিরাগভাজন হতে পারেন, এই ভেবে হরিশচন্দ্র তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা হারাণচন্দ্রের নামে প্রেসটি ক্রয় করেন ১৮৫৪ সালে। কিন্তু পত্রিকার সামগ্রিক সম্পাদকীয় কর্ম হরিশচন্দ্রই পরিচালনা করতেন।[১৯] শম্ভুচন্দ্রের জীবনচরিতকারের এই বিবরণের সত্যতা মন্মথনাথ ঘোষ স্বীকার করে নিতে পারেন নি। তিনি হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পর্কে যে রচনা প্রকাশিত হয় তা উদ্ধৃত করে আপন বক্তব্যের সমর্থন পেতে চেয়েছেন। হিন্দু পেট্রিয়টে হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর লেখা হয় ঃ পত্রিকার প্রথম মালিক পত্রিকার লাভজনকতা দেখতে না পেয়ে তিন বছর পরে এটি বিক্রি করে দিতে মনস্থ করেন, কিন্তু কোন ক্রেতার সন্ধান পাওয়া যায় না। হরিশ যদিও স্বল্পবিত্তের মানুষ ছিলেন তথাপি তিনি এই পত্রিকা ক্রয় করার জন্য মনস্থির করলেন। ১৮৫৫ সালের জুন মাসে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নামে পত্রিকার স্বত্ব ক্রয় করলেন এবং ভবানীপুরে তার অফিস স্থানান্তরিত করলেন।[২০] হিন্দু পেট্রিয়টের এই বিবরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে ১৮৫৫ সালের জুন মাসের আগে পত্রিকার হস্তান্তর ঘটে নি। সুতরাং ১৮৫৩ সালের জানুয়ারি থেকে ১৮৫৫ সালের জুন পর্যন্ত এই তিন বছর পত্রিকার অস্তিত্ব ছিল। কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে ১৮৫৪ সালের হিন্দু পেট্রিয়টের সন্ধান আমরা পেয়েছি। এই সালের হিন্দু পেট্রিয়টের আখ্যাপত্র থেকে দেখা যাবে মুদ্রক ও প্রকাশক হিসাবে এতে মধুসূদন রায়ের নাম থাকত, এবং ১৩৬, রাধাবাজার স্ট্রীট থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত।

All sorts of Book and Job works in the printing in English,

Bengallee and Lithographic ways are executed with neatnees and despatch, and on very moderate terms at the above press.

Terms of Subscription

Hindoo Patriot

Advance Yearly– Rs 8
Six Months — Rs 4
One Month — Rs 1

A Single copy Fight Annas

Rates of Advertisement

Per Line—3 Annas
,, Half Column—6 Rupees
,, Column—10 ,,

Advertisement previously contracted for will be received on lower terms—a considerable reduction will be allowed to parties allowing their advertisements to stand in the paper for 4 or more lines

Conditions of Subscription

All Subscriptions are payable in advance. No Subscription is received for less than a month.

Annual Subscriptions commence on the 1st January, or any other date the Subscribers may desire, but monthly Subscription should commence on the first day of the quarter on month.

Subscribers who do not actually pay their Bills yearly in advance will be charged at the monthly rates.

Monthly Bills are not (On discontinuation) made for broken periods of the month, they are prepared, and full amount is due on the 1st day, in advance.

Subscriptions are considered to be in force until countermanded, in writing.

The Patriot cannot, under any circumstances, be sent to the Mofussil or other distant stations, unless a year's or six months subscription be remitted, on subscribing ; or a reference be given for annual payment in advance, when payable in calcutta.

The Hindoo Patriot is delivered daily by the peons of the Establishment throughout Calcutta also at Howrah and Sulkeah.

All communications intended for the Hindoo Patriot are requested to be forwarded to the proprietor at No. 136 Radhabazar street.

Printed and published at the Hindoo Patriot press No. 136 Radhabazar Street by Baboo Modhoo Soodun Roy, the proprietor.

১৮৫৫ সাল থেকেই যে হিন্দু পেট্রিয়টের সমূহ দায়িত্ব হরিশচন্দ্রের হাতে আসে তার সমর্থন পাওয়া যায় বাক্‌ল্যাণ্ডের গ্রন্থ থেকে।[১১] বাক্‌ল্যাণ্ড লিখেছেন যে, ১৮৫৫ সালেই হরিশচন্দ্রের একক দায়িত্বে হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।

উপরের নানা তথ্য প্রমাণ থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, হিন্দু পেট্রিয়টের প্রথম সম্পাদক হরিশচন্দ্র ছিলেন না। প্রথম সম্পাদক ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। প্রথম দিকে গিরিশচন্দ্রকে পত্রিকা পরিচালনা ও সম্পাদনার ব্যাপারে তাঁর ভাই ক্ষেত্রচন্দ্র প্রভৃত সাহায্য করতেন। কিন্তু তারপরে ক্ষেত্রচন্দ্র অন্যান্য কারণে দূরে চলে যান। শ্রীনাথের কাছ থেকেও খুব বেশী সাহায্য গিরিশ লাভ করতে পারেন নি, চাকুরি নিয়ে শ্রীনাথ বালেশ্বরে চলে গিয়েছিলেন। সম্ভবত এইসব কারণেই গিরিশচন্দ্রের পক্ষে পত্রিকা পরিচালনা আর সম্ভব হয় নি। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের হাতেই পত্রিকার পূর্ণ দায়িত্ব এসে পড়েছিল।

হরিশচন্দ্র অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গেই হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদনা ও পরিচালনা করেছিলেন। হিন্দু পেট্রিয়টে সম্পাদকীয় কার্য করবার পূর্বে তিনি ফিনিক্‌স, হরকরা প্রভৃতি সংবাদপত্রেও নিবন্ধাদি লেখেন বলে তাঁর জীবনচরিতকার রামগোপাল সান্যাল জানিয়েছেন। রামগোপাল আরও জানিয়েছেন যে, ইংলিশম্যান কাগজেও তিনি নানা প্রবন্ধাদি লিখেছিলেন, কাশীপ্রসাদ ঘোষের ইনটেলিজেনসার এবং ১৮৪৯ সালে প্রকাশিত বেঙ্গল রেকর্ডার পত্রিকাতেও হরিশচন্দ্র বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন।[১২] ১৮৫৪ সালে হিন্দু এবং ইউরোপীয় সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা করে তিনি যে প্রবন্ধ রচনা করেন তা ইংরেজদের সংবাদপত্রে সাড়া জাগায়। লর্ড ডালহৌসীর নীতির সমালোচনা করেও তিনি প্রবন্ধাদি রচনা করেছিলেন। রামগোপাল জানিয়েছেন যে, হরিশ বিভিন্ন প্রবন্ধে লর্ড ডালহৌসীর শাসন প্রণালীর অনিষ্টকারিতা সকলকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। একবার একটি প্রবন্ধে তিনি বাঙালির ধর্মঘট ও ইংরেজ শ্রমিকদের Strikes সমবন্ধে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে

তাঁর পাশ্চাত্য ও দেশীয় সমাজনীতি সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা প্রমাণিত হয়।[২৩] হিন্দু পেট্রিয়টকে হরিশ যে একটি রাজনৈতিক চরিত্র দান করেছিলেন সে কথা বিদেশীরাও স্বীকার করেছেন। "In 1853 the Hindu Patriot appeared. This paper was decidedly political in tone, attacking Dalhousie's annexations, supporting Canning, and arguing that the Mutiny had been brought about by the conduct of a few hot-headed men"[২৪]

১৮৫৭ সাল থেকেই হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। রামগোপাল সান্যাল কৃষ্ণদাস পালের জীবনীতে যথার্থই বলেছেন—"The outbreak of the Mutiny marked a fresh departure in the career of the Hindoo Patriot. It was during this time that it first asserted itself and was universally acknowledged"[২৫]

১৮৫৭ সাল থেকে পত্রিকায় কৃষ্ণদাস পাল, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিরা লিখতে শুরু করেন। রামগোপাল লিখেছেন—"Hurish Chandra with his usual keenness of observation was quick to discern their intrinsic merits and their articles were often put in a editorial leaders."[২৬]

১৮৬০ সালের নীলবিদ্রোহও পত্রিকাকে খ্যাতিমান করে। স্বতন্ত্র অধ্যায়ে সে বিষয় আমরা আলোচনা করেছি। নীল বিদ্রোহের প্রথম দিকে পত্রিকায় কৃষ্ণদাস পালের "Relations between Indigo Planters & Ryots" ও হরিশের 'Anarchy in Bengal'— সাড়া জাগায়। হিন্দু পেট্রিয়ট ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মুখপত্ররূপেও পরিচালিত হয়। হরিশচন্দ্র নিজেও এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি হিন্দু পেট্রিয়টে এসোসিয়েশনের নীতি এবং উদ্দেশ্যকেও প্রচার করতে থাকেন। হিন্দু পেট্রিয়ট যে হরিশচন্দ্রের সন্তানতুল্য ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে তাঁর মৃত্যুর পর গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখিত 'Our Drainage'—প্রবন্ধে। গিরিশ এই প্রবন্ধে লিখেছেন মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেও হরিশচন্দ্র পত্রিকার শেষ প্রুফ দেখে যাবার জন্য ব্যাকুল।

রামগোপাল সান্যাল লিখেছেন যে, হরিশের মৃত্যুর পর তাঁর বাড়িতে একটি সভা হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্যামাচরণ বিশ্বাস, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্র বসু, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র দত্ত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, শম্ভুচন্দ্রই পত্রিকার সম্পাদনা কার্য চালিয়ে যাবেন। শম্ভুচন্দ্র প্রস্তাব করেন হরিশের মাতা ও বিধবা পত্নীকে সাহায্য করার জন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ যেন পাঁচ হাজার টাকায় পত্রিকার স্বত্ব ক্রয় করে নেন।[২৭] কিন্তু মন্মথনাথ ঘোষের মতে ১৮৬১ সালের নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত গিরিশচন্দ্রই পত্রিকা সম্পাদনা করেন। শম্ভুচন্দ্র ছিলেন তাঁর সহযোগী।

মন্মথনাথ ঘোষ তাঁর 'মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ' গ্রন্থে লিখেছেন যে, হরিশের মৃত্যুর পর হিন্দু পেট্রিয়ট বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। কারণ, মৃত্যুকালে একটি বাড়ি ও হিন্দু পেট্রিয়ট প্রেস ছাড়া আর এক কপর্দকও তিনি রেখে যেতে পারেননি। এই অবস্থায় কালীপ্রসন্ন পাঁচ হাজার টাকায় পত্রিকার সমূহ স্বত্ব ক্রয় করে নেন। স্বত্ব ক্রয়ের পর প্রথমে তিনি শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে পত্রিকার পরিচালনার ভার দেন। শম্ভুচন্দ্র পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটারের পদ গ্রহণ করলেন বটে, কিন্তু তাঁর সাহিত্যগুরু গিরিশচন্দ্রই প্রধান সম্পাদক হিসাবে বহাল রইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটল। শম্ভুচন্দ্র এ সময় কালীপ্রসন্নের বাড়িতে থাকতেন। গুজব রটল যে, শম্ভুচন্দ্র কালীপ্রসন্নের অর্থের অপব্যয় করছেন। মন্মথনাথ ঘোষের অনুমান এই গুজবের পেছনে শম্ভুচন্দ্রের বিদ্যালয়ের সহপাঠী কৃষ্ণদাস পালের হাত ছিল। মন্মথনাথ লিখেছেন, "কৃষ্ণদাসের আকাঙ্ক্ষা উচ্চ ছিল, এক্ষণে তিনি উক্ত পত্রখানির পরিচালন ভার প্রাপ্ত হইবার জন্য উৎসুক হইলেন। দেশহিতৈষী কালীপ্রসন্ন এই সর্বজনহিতকর পত্রখানি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার জমিদার পক্ষের মুখপত্রে পরিণত করিতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু কালীপ্রসন্নের অভিভাবক হরচন্দ্র ঘোষ কৃষ্ণদাসকে পুত্র নির্বিশেষে স্নেহ করিতেন। তিনি কৃষ্ণদাসের হস্তে হিন্দু পেট্রিয়টের পরিচালন ভার প্রদানের চেষ্টা পাইলেন।"[২৮] গুজবে বিরক্ত হয়ে শম্ভুচন্দ্র কালীপ্রসন্নের গৃহ এবং হিন্দু পেট্রিয়টের পরিচালন ভার ত্যাগ করেন। রামগোপাল সান্যাল কিন্তু শম্ভুচন্দ্রের পত্রিকা ত্যাগ করার ভিন্ন একটি কারণ দেখিয়েছেন। সে সময় কলকাতায় হিন্দুরা সমবেত হয়ে সিভিল সার্ভিস যাতে এ দেশে গ্রহণ করা যায় তারজন্য পার্লামেণ্টে আবেদন করেন। এই আবেদনের বিরুদ্ধে 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদক টাউনসেণ্ড কটু মন্তব্য করেন। শম্ভুচন্দ্র হিন্দু পেট্রিয়টের এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে বক্তব্য লেখেন। সে সময় বাংলাদেশের ছোটলাট ছিলেন সিসিল বীডন। বীডন সাহেব বিদ্যাসাগরের কাছে শম্ভুচন্দ্রের এই প্রবন্ধ সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করেন। এরফলে…"বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু পেট্রিয়টের সত্বাধিকারী কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়কে ঐ কাগজ চালাইবার ভার তাঁহার হস্তে দিতে অনুরোধ করিলেন। শম্ভুবাবু বেগতিক দেখিয়া উহার সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিলেন।"[২৯] রামগোপালের এই বিবরণ কতখানি সত্য সে সম্পর্কে অবশ্য সংশয় থেকে যায়।

১৮৬১ সালের নভেম্বর মাসে হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদনার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটে তার প্রমাণ ঐ পত্রিকা থেকে পাওয়া যেতে পারে। "Ourself, we have to announce today a change in the ministry of the Hindoo Patriot of which dates from the last issue."[৩০]

১৮৬১ সালের নভেম্বর মাসে গিরিশচন্দ্র হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদনার ভার ত্যাগ করে 'ক্যালকাটা মান্থলি' রিভিউতে যোগ দিলেন। এই অবস্থায় পত্রিকা পরিচালনার জন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হন। বিদ্যাসাগর প্রথমে কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত এবং দ্বারকানাথ মিত্রের

দ্বারা পত্রিকা সম্পাদনা করিয়ে দেখলেন এতে তার গৌরব হ্রাস হচ্ছে। অবশেষে তিনি নবীনকৃষ্ণ বসু, কৈলাসচন্দ্র বসু এবং কৃষ্ণদাস পালের উপর সম্পাদনার ভার দেন। মন্মথনাথ ঘোষ লিখেছেন…"এই সময়ে কৃষ্ণদাস বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভার কয়েকজন প্রধান সভ্যের দ্বারা কালীপ্রসন্নকে অনুরোধ করাইলেন যে, কাগজখানির পরিচালন ভার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া তাঁহারদিগের উপর অর্পিত হউক।"৩১ কৃষ্ণদাস পাল যে বিদ্যাসাগরের অধীনে কাগজ চালাতে ইচ্ছুক ছিলেন না এবং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সভ্যদের তলে তলে উত্তেজিত করেন তা তাঁর জীবনচরিতকার রামগোপাল সান্যালও সমর্থন করেছেন। রামগোপাল লিখেছেন "এই কথা চালাচালি হইতে হইতে বিদ্যাসাগর সময় পরিশেষে জানিতে পারিলেন যে, কালীপ্রসন্ন বাবুর নিকট এই প্রস্তাব হইতেছে। তেজস্বী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বিদ্যাসাগর এইরূপ লুকাচুরীর মধ্যে থাকিবার লোক নহেন। তিনি অবিলম্বে হিন্দু পেট্রিয়টের কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করিলেন। কৃষ্ণদাস সেই সুযোগে হিন্দু পেট্রিয়টের ট্রস্ট ডীড কালীপ্রসন্নবাবুর নিকট হইতে লেখাইয়া লইলেন। এইরূপে হরিশের সাধের হিন্দু পেট্রিয়ট ট্রস্ট সম্পত্তি বলিয়া রাজদ্বারে চিহ্নিত হইল। কি গুপ্ত অভিপ্রায়ে কৃষ্ণদাস এই কার্য করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই।"৩২

ট্রস্টডিডের দলিল

"শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও শ্রীযুক্তবাবু রমানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্তবাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুক্তবাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বরাবরেষু।

"লিখিতং শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ সাকিম কলিকাতা জোড়াসাঁকো ট্রষ্টিনামা পত্রমিদং কার্য্যানঞ্চাগে আমি নানাবিধ বৈষয়িক কার্য্য মধ্যে সদা সর্বদা আবৃত থাকায় হিন্দু পেট্রিয়ট নামক ইংরাজি সংবাদপত্র সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টি করিয়া নির্বাহ করায় অশক্ত বিধায় উক্ত সমবাদপত্র ও তৎসমবন্ধীয় টাইপ অর্থাৎ অক্ষর মায় লওয়া জমা ও লহনা আদায়ের বিল প্রভৃতি আপনাদের হস্তে অর্পণ করিয়া আপনাদিগকে ট্রষ্টি নিযুক্ত করিলাম। আপনারা এই সমবাদপত্র ও অক্ষর ও পাওনা টাকা প্রভৃতির ট্রষ্টি সূত্রে মালিক হইয়া নীচের লিখিত নিয়ম প্রতিপালন পূর্বক ঐ কাগজের সমুদায় কর্ম সুচারুরূপে নির্বাহ করিবেন। যেহেতু আপনাদিগের হস্তে ঐ ছাপাব কাগজ থাকিলে দেশের নানাবিধ উপকার হইবার সম্ভাবনা। এ মতে স্বীকার করিতেছি যে উক্ত কাগজের অক্ষর ও লওয়া জমা দ্রব্য ও উপস্বত্ত্বের প্রতি আমার স্বত্ত্ব রহিল না। কস্মিনকালে আমি কি আমার উত্তরাধিকারী কোন দাবী দাওয়া করিব না বা করিবেন না। যদি করি কিম্বা করেন সে বাতিলও নামঞ্জুর।

নিয়ম

১। "অত্র পেট্রিয়ট কাগজের গত এডিটার ৺হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম স্থায়ী থাকা জন্য এই হিন্দু পেট্রিয়ট নাম কখন পরিবর্তন হইবে না। যে পর্য্যন্ত এই কাগজ আপনাদের হস্তে থাকিবে, তাবৎকাল ঐ কাগজের নাম হিন্দু পেট্রিয়ট নামে প্রচলিত থাকিবেক এবং আপনারা ঐ কাগজ অন্য কোন সংবাদ কাগজের সহিত যোগ কিম্বা মিশ্রিত করিতে পারিবেন না।

২। "কস্মিনকালে এই হিন্দু পেট্রিয়টের কর্মনির্বাহকালে আপনাদের কর্তৃত্বকালে কোন রকমে ক্ষতি হইতে পারিবে না। আর ঐ কাগজ ও তাহার গুড উইল ব্যতীত তৎসম্বধীয় অক্ষর মায় লওয়া জমা বিক্রয় করিতে আপনাদের ক্ষমতা থাকিবে। কিন্তু ঐ মূল্যের টাকা আপনারা নিজে ভোগ না করিয়া প্রেসের দেনা শোধ বাদ আর অবশিষ্ট টাকা হরিশ মেমোরিয়াল ফাণ্ডে অর্পণ করিবেন।

৩। "অন্য কোন কাগজ পেট্রিয়টের সহিত মিশ্রিত করিলে কিম্বা আপনারা স্বয়ং কোন মুদ্রাযন্ত্রালয় ক্রয় করিয়া পেট্রিয়টের কাগজের সহিত মিশ্রিত করিলে সেই কাগজের আপনাদিগের ক্রয় করা যন্ত্র কি অন্য পদার্থ আপনাদিগের স্বেচ্ছানুসারে বিক্রয় করিলে তদুপস্বত্ত্ব আপনাদিগের ইচ্ছামত ব্যয় করিবেন।

৪। "হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজের কর্ম চালাইবার আয় ব্যয় হিসাবাদি আপনাদিগের নিকটে আমার লইবার ক্ষমতা রহিল না।

৫। "হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজ ও তাহার গুড উইল বিক্রয় করার ক্ষমতা রহিল না। ঐ কাগজ মায় গুড উইল দেশের উপকারার্থে কেহ প্রার্থনা করেন তাহা উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া দান করিবেন।

৬। "আপনাদিগের কাহারও কোন লোকান্তর হইলে কিম্বা কেহ আপনার ইচ্ছাপূর্বক ট্রাষ্টির ভাব পরিত্যাগ করিলে যাঁহারা উপস্থিত থাকিবেন, তাঁহারা ইচ্ছামত পরিত্যাগ কিম্বা মৃত ট্রাষ্টির পরিবর্তে তত্তুল্য ক্ষমতাবান অন্য ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

৭। "ট্রাষ্টির সংখ্যা তিন জনের কম ও পাঁচ জনের অধিক হইবেক না ও ট্রাষ্ট নিয়োগের নিমিত্ত আমার মতের প্রয়োজন হইবেক না ও আমি আপনাদিগের পরিবর্তে কখনও অন্য ট্রাষ্ট নিযুক্ত ও আপনাদিগকে রহিত করিতে পারিব না।

৮। "আপনারা ঐক্য হইয়া সর্বদা ট্রাষ্ট কর্ম নির্বাহ করিবেন। আপনাদিগের মধ্যে মতের অনৈক্য হইলে ট্রাষ্টির যে রূপ অভিপ্রায় হইবে সেই মত কার্য নির্বাহ হইবেক।

৯। "যদি কোন ট্রাষ্ট ইন্‌সল্‌ভেণ্ট লয়েন কিম্বা কোন রকমে অকর্মণ্য হয়েন, অথবা অন্য কোন অপকর্ম করেন, তবে তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া তাঁহার স্থানে আপনারা অন্য ট্রাষ্ট নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

১০। "এই ট্রাষ্ট নির্বাহ করিবার নিমিত্ত আমি একজন ট্রাষ্ট আপনাদের সহিত থাকিলাম। এবং আপনাদিগের তুল্য ক্ষমতাপন্ন হইয়া ট্রাষ্টির স্বরূপ, উপরের লিখিত নিয়মী সকল প্রতিপালন করিব। যদি উপরের লিখিত নিয়ম সকল অন্যথা করি তবে নয় দফার সর্ত্ত আপানারা আমার প্রতি খাটাইতে পারিবেন।

১১। "উপরোক্ত নিয়ম সকল প্রতিপালন পূর্বক হিন্দু পেট্রিয়েটের কার্য নির্বাহ হইবেক ও দুই দফায় লিখিত অনুসারে বিক্রয় করা আবশ্যক হইলে বিক্রয় হইবেক। এতদর্থে পেট্রিয়ট কাগজ ও অক্ষর মায় লওয়া জমা মালিকত্ব

পরিত্যাগ করিয়া ট্রাষ্টনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৬৯ সাল, ৪ঠা শ্রাবণ।

কলিকাতা, শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ

১৯ শে জুলাই, ১৮৬২ সাল।

সাক্ষী—

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণদাস পাল!

কৃষ্ণদাস পালের জীবনচরিতকার রামগোপাল সান্যাল লিখেছেন যে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁকে নাকি বলেছিলেন কৃষ্ণদাস প্রথমে ট্রাষ্টদের চাকর ছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণদাসের পুত্র রাধানাথ সে কথা অস্বীকার করেন। যাইহোক কৃষ্ণদাস আপনার বুদ্ধিবলে ক্রমে ক্রমে হিন্দু পেট্রিয়টের সমস্ত আয়ের জীবন সত্বাধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর যোগ্যতাও অনস্বীকার্য। ১০০ / ১৫০ গ্রাহক থেকে তিনি গ্রাহক সংখ্যা ২৫০০-এ উন্নীত করেন। প্রতি বৎসর ১২০০০ টাকার মত লাভ থাকত। শুধু শহর নয়, মফঃস্বলেও এই কাগজ ছড়িয়ে পড়ে। একাদিক্রমে কৃষ্ণদাস প্রায় ২৫ বৎসর এই কাগজ সম্পাদনা করেছিলেন।[৩৩]

টীকা

১. Jourralism in India. P. Lovett, P.—8
২. The Bengali press (1818—68) S. Chakraborty, P.—91—92
৩. ঐ
৪ জ্ঞানান্বেষণ। নং ৫, মে, ১৮৫২।
৫ বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা, ১০ নং, ১২৬৩।
৬ অরুণোদয়, মার্চ ১৫, ১৮৫৮।
৭. Selections from the Records of the Bengal Govt. No. XXII. P. 98-99
৮. ঐ
৯. বাংলার নব্য সংস্কৃতি। যোগেশচন্দ্র বাগল। পৃ, ১
১০. উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা। যোগেশচন্দ্র বাগল। পৃ. ১০৬-৮
১১. ঐ, পৃ, ১৭০
১২. বাংলাদেশের ইতিহাস (আধুনিক)। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার। পৃ.—৪৬৮
১৩. The Bengali press (1818—68), P. 94—98.
১৪. বাংলাদেশের ইতিহাস (আধুনিক)। পৃ. ৪৬৮
১৫. The Life of Babu Kristo Das Pal. R. G. Sanyal.
১৬. Reis and Rayot. 1903
১৭. Bengalee, 9. 10. 1869
১৮. Life of Girish Chandra Ghosh—Manmath Ghosh
১৯. Life of Sambhu Chandra Mookherjee. F. H. Skrine.
২০. Hindoo Patriot. 19. 6. 1861

২১. Bengal under Lieutenant Govt. (Vol. II). Buckland
২২. এক্ষণ, পৌষ-মাঘ, ১৩৭৭, পৃ. ১১
২৩. ঐ, পৃ, ১৫
২৪, Political India (1832—1932) Edt. by Sir John Comming. P—35
২৫. Life of of Babu K. D. Pal. P. 8
২৬. ঐ
২৭ ঐ। পৃ ১৩-১৪
২৮. মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ। মন্মথনাথ ঘোষ। পৃ. ৩৭
২৯ কৃষ্ণদাস পালের জীবনী। রামগোপাল সান্যাল। পৃ. ২৯
৩০. Hindoo Patriot. 21. 11, 1861
৩১. মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ। পৃ. ৩৮
৩২. কৃষ্ণদাস পালের জীবনী। পৃ. ৩০-৩১
৩৩, ঐ, প ৩৩

তৃতীয় অধ্যায়

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান ও হরিশচন্দ্র

১৮৩৭ সালের ১২ ই নভেম্বর হিন্দু কলেজ গৃহের এক সভায় বাংলাদেশের প্রথম রাজনৈতিক সংঘ Zamindary Association বা ভূম্যাধিকারী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরই ছিলেন এর উদ্যোক্তা। নিয়মনীতি নির্ধারণের জন্য দ্বারকানাথ ও প্রসন্নকুমার ব্যতীত ভবানীচরণ মিত্র ও রামকমল সেনকে নিয়ে গঠিত হয় এক কার্যকরী সমিতি। একবছর পরে, ১৮৩৮ সালের এপ্রিল মাসে Zamindary Association-এর নাম পরিবর্তিত হয়ে হল Landholder's Society. 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার সম্পাদক উইলিয়াম কোল্ড হ্যারি ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর সমিতির যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই সমিতির উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে পরবর্তীকালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেছিলেন, "It gave to the people the first lesson in the art of fighting constitutionally for their rights, and tought them manfully to assert their claims and gave expression to their opinions. Ostensibly it advocated the rights of the Zamindars, but as their rights are intimately bound up with those of the Ryots, the one can not be separated from the other. What is trully good for the one, is equally so for the other and what is bad for the Zamindar is also bad for the ryot."[১] সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভূম্যাধিকারী সভা যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশের ক্ষেত্রে কিছু ভূমিকা পালন করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দ্বারকানাথ ঠাকুরই ছিলেন এই সমিতির প্রাণ। ১৮৪২ সালের ৯ই জানুআরি দ্বারকানাথ ইউরোপ যাত্রা করেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে ভূম্যাধিকারী সভা কার্যতঃ নিষ্ক্রিয় থাকে। দ্বারকানাথ লণ্ডনে জর্জ টমসনের সঙ্গে পরিচিত হন। উল্লেখ্য যে ১৮৩৯ সালে লণ্ডনে জর্জ টমসন ও উইলিয়ম অ্যাডাম ভারতীয়দের উন্নতির জন্য স্থাপন করেন British India Society. ভূম্যাধিকারী সভার সঙ্গে লণ্ডনের British India Society'র সংযোগ স্থাপিত হয়। ১৮৩৯ সালের ৩০ শে নভেম্বর ভূম্যাধিকারী সভায় লণ্ডনের উক্ত সমিতির সঙ্গে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৮৪৩ সালের জানুআরি মাসে জর্জ টমসন দ্বারকানাথের সঙ্গে কলকাতায় আসেন। কলকাতায় নব শিক্ষিত মানুষরা স্বাগত জানান টমসনকে। নব্য-

শিক্ষিতদের প্রতিনিধিসভা 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার' পক্ষ থেকে রামগোপাল ঘোষ তাঁকে আমন্ত্রণ জানান একটি অধিবেশনে। ১৮৪৩ সালের ১১ই জানুআরি হিন্দু কলেজগৃহে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী। অভিনন্দনের উত্তরে টমসন বলেন, "The only reward I seek for my efforts in your cause, is to see you qualifying yourselves to be here after the enlightened vindicators of the claims of your countrymen to the sympathy and support of all the lovers of moral and political justice in England."[২] টমসনের ভাষণে উৎসাহিত হয়ে উঠল কলকাতার শিক্ষিত সমাজ। শহরের চতুর্দিকে সভার পর সভা হতে লাগল এবং প্রত্যেক সভায় টমসন বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের বাড়িতে, চন্দ্রশেখর দেবের বাড়িতে, শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়িতে, মেকানিক্স ইনস্টিটিউটের সভায় বক্তৃতা দিলেন টমসন। বাস্তবিক, কলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে যেন সভা-সমিতি এবং আলাপ-আলোচনা-বিতর্কের বন্যা এল।[৩]

জর্জ টমসন Landholder's Society-র সীমাবদ্ধতা অনুধাবন করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে এর আবেদন সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক। তাই তিনি এর পরিবর্তে নতুন এক সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেন। ১৮৪৩ সালের ৬ই এপ্রিল ফৌজদারী বালখানার সভায় তিনি তাই প্রস্তাব দিলেন British India Society গঠনের। সে প্রস্তাব দেশীয় নেতারা গ্রহণ করেন। ফলে ২০শে এপ্রিল টমসনের সভাপতিত্বে এক সভায় গঠিত হয় Bengal British India Society. সমিতির কর্মকর্তা:

সভাপতি / জর্জ টমসন
সহ সভাপতি / জি. ই. রেমফ্রে ও রামগোপাল ঘোষ
সম্পাদক / প্যারীচাঁদ মিত্র

সদস্য / জি. টি. ই. স্পীড, এম ক্রাউ, হরিমোহন সেন, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, গোবিন্দচন্দ্র সেন, চন্দ্রশেখর দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ব্রজনাথ ধর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ সেন ও সাতকড়ি দত্ত।

সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়—"The collection and dissimination of information relating to the actual condition of the people of British India, and the laws and institutions and resources of the country; and to employ such other means of a peaceable and lawfull character, as may appear calculated to secure the welfare, extend the just rights and advance the interests of all classes of our fellow subjects"[৪] সমস্ত প্রজার

উন্নতির প্রস্তাব থাকলেও সমিতির সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে উদ্বোধনী সভানুষ্ঠানের চতুর্থ প্রস্তাবে—"That the Society should adopt and recommend such measures only as are consistent with pure loyalty to the person and Government of the reigning soverign of the British dominions and the due observance of the Laws and Regulations of this country, and shall discountenance every effort to subvert legal authority, or disturb the peace and well-being of society."[৫] সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্র যোগ্যতার সঙ্গে এই সমিতি পরিচালনা করেন। অনেকের মতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ প্রথা এবং অন্য কয়েকটি শাসন সংস্কার এই সমিতির চেষ্টার সুফল। সরকারী কর্মে আরও অধিক সংখ্যক ভারতীয় নিয়োগ এবং আদালতে দেশীয় ভাষার ব্যবহার ইত্যাদির জন্যও সভার পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়। দ্বারকানাথ বা রাজা রাধাকান্ত দেবের মত ভূস্বামীরা বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটিতে অংশগ্রহণ করেন নি। হয়তো এ সমিতি কৃষক স্বার্থ সংরক্ষণে অধিক উৎসাহী হওয়ায় ভূস্বামী-সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। প্যারীচাঁদ জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করেন এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রায়তদের দুর্দশা সম্পর্কে প্রবন্ধ রচনা করেন বলে দ্বারকানাথ বা রাধাকান্ত দেব এই সমিতিতে কোনপ্রকার সাহায্য করেন নি।[৬]

১৮৪৩-৫০ পর্যন্ত ভূম্যধিকারী সভা ও বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি অনেকটা পরস্পর বিরোধী ছিল। ভোলানাথ চন্দ্র বলেছেন যে প্রথম সংগঠনটি সম্পদের ও দ্বিতীয় সংগঠন বুদ্ধি ও বৈদগ্ধ্যের প্রতিনিধিত্ব করত।[৭] কিন্তু একথা যথার্থ নয়। কারণ, প্রথম সংগঠনটির সঙ্গে যুক্ত দ্বারকানাথ বা প্রসন্নকুমার যেমন কেবল ভূস্বামী নয়, তৎকালীন সমাজের বুদ্ধিজীবীরূপে বন্দিত হতেন তেমনি দ্বিতীয় সংগঠনের রামগোপাল ঘোষ বা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় শুধু বুদ্ধিজীবী নন, সম্পদশালীও ছিলেন। দুই সংগঠনের কর্মকর্তারা ছিলেন মূলতঃ রামমোহন রায়ের শিষ্য সম্প্রদায়, ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনের সঙ্গে এঁদের ঘনিষ্ঠ সংযুক্তি ছিল। ভূস্বামী ও বুদ্ধিজীবীদের এই সংগঠন দুটি অবশ্য গণজীবনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে নি—"By the middle of the last century both these Associations were languishing due to lack of popular support."[৮]

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সূত্রপাতেই জন্মলাভ করে British Indian Association. এর জন্মের পেছনে ছিল দ্বিবিধ কারণ—প্রথমতঃ ব্ল্যাক অ্যাক্ট আন্দোলন ও দ্বিতীয়ত সনদের নবীকরণ। সে সময়ে শ্বেতাঙ্গ মানুষদের বিচার হত কেবল কলকাতার সুপ্রিম কোর্টে। ফলে মফঃস্বল অঞ্চলে শ্বেতাঙ্গদের আইনবিগর্হিত কার্যাদির ফল ভোগ করতে হত দেশীয় পল্লীবাসীদের। কলকাতায় এসে শ্বেতাঙ্গদের অবিচারের বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা ব্যয়বহুল বলেই

দেশীয় মানুষকে প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধ সহ্য করতে হত। তখন আইন সদস্য ছিলেন মিঃ বেথুন। তিনি এই কুব্যবস্থা রোধ করার জন্য ১৮৪৯ সালে চারটি নতুন আইনের খসড়া উপস্থাপিত করেন কাউন্সিলে। ইংরেজ সম্প্রদায় এই আইনকে কালো আইন বা Black Act নাম দিয়ে এদের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের ফলে সরকার বিলগুলি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন। আন্দোলনের ফলে ইংরেজদের জয়ে দেশীয় মানুষেরা মর্মাহত হয়। একদিকে তাঁরা উপলব্ধি করেন যে সংগঠিত আন্দোলন প্রশাসনকে প্রভাবিত করতে পারে, অন্যদিকে —'In spite of a certain fundamental unity of economic interests between the land-owning classes and the English merchants and planters it was nearly impossible for them to agree when the vital political status of the two races came into question"[৯] তাই দেখা গেল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে ইংরেজ সদস্যের অনুপস্থিতি। পূর্ববর্তী সংগঠন দুটিতে কিন্তু ইংরেজ সদস্যরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। ফলতঃ গিরিজাকুমার মুখার্জীর মন্তব্যটি এক্ষেত্রে যথেষ্ট মনোযোগ দাবি করে, "Thus the foundation of the British Indian Association marked the begining of the rise of racial hostilities in India between the British non-officials and the Indian upper classes, which grew in intensity after the outbreak of revolt in 1857."[১০] বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের জন্মের পেছনে আর একটি কারণ হল ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নতুন সনদ প্রাপ্তি। ১৮৫৩ সালে ১৮৩৩ সালের সনদের মেয়াদ শেষ হয়। তাই, রামমোহনের দৃষ্টান্ত সামনে রেখে, দেশীয় নেতারা মনে করেছিলেন যে নতুন সনদ দেবার পূর্বে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট ভারতবাসীর অভাব অভিযোগগুলি উত্থাপন করতে পারলে সুফল লাভের সম্ভাবনা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও তাঁরা উপলব্ধি করেন যে সংঘবদ্ধভাবে অভাব-অভিযোগ উত্থাপন না করতে পারলে কোন ফলই হবে না।' এর জন্যই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন গঠনের তাগিদ অনুভূত হয়।

অবশ্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন গঠনের ৪৫ দিন পূর্বে ১৮৫১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর (যোগেশচন্দ্র বাগলের মতে ১৮ই সেপ্টেম্বর) National Association বা জাতীয় সমাজ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। সমকালীন সংবাদপত্রের রিপোর্ট থেকে এই সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা জানা যায়, "It is resolved that a Society be formed under the designation of the 'National Association' for the purpose of adopting measures which may contribute to the welfare of the country. The Society to be composed of members of all classes of the subjects of this empire, without any distinction of creed, caste or colour. That by the help of this

Association we may be able to assert our legal rights by legitimate means, it is resolved to apply for any amendment or reform, as the case may be, either to the Local Government or to the authorities in England."[১১] জাতীয় সমাজের সম্পাদক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, 'National' শব্দটি প্রাচীনপন্থী জমিদাররা পছন্দ করতেন না—কারণ এতে ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তিলাভ করার ইঙ্গিত ছিল এবং রাজভক্তির কোন স্পষ্ট উল্লেখ বা নিদর্শন ছিল না।[১২] ফলে রক্ষণশীল জমিদাররা এই সংগঠনে যোগদানে ভীত ছিলেন, 'National' এই নাম গ্রহণেও তাঁরা আপত্তি উত্থাপন করেন। "The word 'National' had not become popular in India at that time. The conservative Zamindars did not dare to join an organisation which called itself 'National' probably because it alluded somewhat to the establishment of an Independent state in India."[১৩]

১৮৫১ সালের ২৯শে অক্টোবরের সভায় বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন গঠিত হয়। উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব করেন ভূকৈলাসের রাজা সত্যচরণ ঘোষাল। ৪৭ ধারা সম্বলিত এই সমিতির সংবিধান মূলতঃ পূর্ববর্তী ন্যাশানাল এসোসিয়েশনের সংবিধানকে ভিত্তি করেই গঠিত হয়েছিল। সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়—"Promote the improvement and efficiency of the British Indian Government by every legitimate means in its power, and thereby to advance the common interests of Great Britain and India, and ameliorate the condition of the native inhabitants of the subject country.

"To make such respectful but earnest representations to the Parliament of Great Britain, in connection with the ensuring East India Company's Charter, with a view to remove the existing defects in the laws and civil administration of this country, and to promote the general welfare and interests of its people.

"To try for the removal of existing and prevention of proposed injurious measures, or for the introduction of enactments which may tend to promote the general interests of all connected with the country."[১৪] ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন সমস্ত স্তর ও মানুষের সংগঠন হবে বলা হলেও এর সভ্য চাঁদা এত বেশি

ছিল যে এতে সাধারণ মানুষের যোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না। সাধারণ সভ্যেরই বাৎসরিক চাঁদা ছিল ৫০ টাকা। সমিতির পক্ষ থেকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজা রাধাকান্ত দেব ও রাজা কালীকৃষ্ণ দেবকে যথাক্রমে সভাপতি ও সহ সভাপতি হবার জন্য আবেদন করলে তাঁরা সম্মত হন। নবগঠিত সমিতির কর্মকর্তারা হলেন—

সভাপতি / রাজা রাধাকান্ত দেব

সহ সভাপতি / রাজা কালীকৃষ্ণ দেব

সম্পাদক / দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহ সম্পাদক / দিগম্বর মিত্র

সভ্য / রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, হরকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, দুর্গাচরণ দত্ত, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হরিমোহন সেন, আশুতোষ দে, রামগোপাল ঘোষ।

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সংবিধানে নিয়মিত কর্মকর্তা নির্বাচনের কথা থাকলেও বাস্তবে একই পদে একই ব্যক্তিকে বহাল থাকতে দেখা যায়। যেমন রাধাকান্ত দেব ১৮৫১—১৮৬৭ পর্যন্ত, আমৃত্যু সভাপতির পদে বহাল ছিলেন। সম্পাদকের পদে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ১৮৫১—১৮৫৪ পর্যন্ত, এরপর ৬ বছর সম্পাদকের কাজ চালান ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, ১৮৬০—১৮৭৯ পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথকে কার্যকরী সম্পাদক হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়।

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সঙ্গে হরিশ মুখার্জী ঠিক কবে যোগ দেন সে সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়নি। ১৮৫১ সালে সমিতির কর্মকর্তার তালিকায় তাঁর নাম দেখা যায় না। তবে ১৮৫৫ সালে সাধারণ সভ্য হিসেবে তাঁর নামোল্লেখ পাওয়া যায়ঃ

সভাপতি / রাজা রাধাকান্ত দেব

সহ সভাপতি / রাজা কালীপ্রসন্ন দেব ও রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ

সম্পাদক / রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ

সহ সম্পাদক / কালীপ্রসন্ন দত্ত

সদস্য / রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, আশুতোষ দে, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রমানাথ ঠাকুর, উমেশচন্দ্র দত্ত, হরিমোহন সেন, দিগম্বর মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, হরিশচন্দ্র মুখার্জী, কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্র সেন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, চন্দ্রশেখর দেব এবং রমানাথ লাহা।[১৬]

কৃষ্ণদাস পালের মত হরিশচন্দ্রও ছিলেন সমিতির বেতনভুক কর্মী। দক্ষিণা তিনি গ্রহণ করতেন বটে কিন্তু উৎসাহ ও আন্তরিকতা তাঁর কম ছিল না। হরিশচন্দ্রের স্মৃতি সভায় রামগোপাল ঘোষ বলেছিলেন, "সমিতিতে প্রায় দুই শ্রেণীর সভ্য থাকেন, একশ্রেণীর সভ্য যথার্থ কার্য করেন, অপরশ্রেণীর সভ্য কেবল অনুমোদন করেন। হরিশচন্দ্র প্রথমশ্রেণীর সভ্য ছিলেন।"[১৭] রাজনীতি শিক্ষার প্রথম পাঠও তিনি এই সমিতি থেকেই গ্রহণ করেন।[১৮] ১৮৭৬ সালে হরিশ-নামাঙ্কিত গ্রন্থাগার উদ্বোধন করতে গিয়ে সমিতির আর এক সদস্য রাজেন্দ্রলাল

মিত্র বলেছিলেন—"Early and late at daily desk-work, at weekly committee meetings and at monthly and special general meetings, he was foremost everywhere and identified himself in all its actions."[১৯]

রামগোপাল সান্যাল তাঁর হরিশজীবনীতে লিখেছেন যে ১৮৫২ সালের অগস্ট মাসে হরিশচন্দ্র বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্য হন। রামগোপাল লিখেছেন,—"হরিশ এই সভার সভ্য হইয়া শ্রীবৃদ্ধি ও গৌরবসাধনে বিশেষ পরিশ্রম ও যত্ন দেখাইয়াছিলেন। মিলিটারী আফিসে চাকরী করিয়া তিনি প্রতিদিন ৫টার পর উক্ত সভায় আসিয়া উহার কার্য করিতেন।...প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সঙ্গে আইনজ্ঞানে সমকক্ষ হইবেন বলিয়া তিনি রেগুলেশন আইন সকল উত্তম করিয়া পাঠ করেন। হরিশের বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া ঐ সভার বড় বড় সভ্যেরা তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।"[২০] হরিশ সম্পাদিত হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকাও বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মুখপত্র রূপে পরিগণিত হয়।

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন, যার একটি সর্ব-ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। "It was not satisfied by merely stating the grievances of a particular group of people and a particular community. True to its objects, it concerned itself with the future of India as a whole."[২১] মাদ্রাজ এবং বোম্বাইতেও এই সংগঠনের সহযোগী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। লণ্ডনেও এই সংগঠনের এজেণ্ট ছিল। লণ্ডনের প্রথম এজেণ্ট মিঃ গর্ডন, ও দ্বিতীয় এজেণ্ট জর্জ গর্ডন ম্যাকফারসন। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে একযোগে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা, তা কাজে রূপায়িত করার জন্য 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' এই নাম গ্রহণ এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের সঙ্গে এ বিষয়ে সহযোগিতা স্থাপন যে উন্নত রাজনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দেয় এর পূর্বে তার পরিচয় ভারতের ইতিহাসে পাওয়া যায় নি। ১৮৫১ সালের ১১ই ডিসেম্বর মাদ্রাজের খ্যাতনামা মানুষদের কাছে সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে চিঠি লেখেন তার মধ্যে উপরের বক্তব্যের প্রমাণ মিলবে। ভারতব্যাপী সংগঠিত আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়ে দেবেন্দ্রনাথ লেখেন—"It must be obvious to you that the representations which are to be made to the British Parliaments with reference to the approaching termination of the East India Company's Charter, would have great weight if they were made simultaneously by the Natives of every part of British India or by a Society having just pretensions to present them."[২২]

১৮৫৩ সালের এপ্রিল মাসে বিলাতের পার্লামেণ্টে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের একটি আবেদন পত্র দাখিল করা হয়। ৫,৯০০ লোকের স্বাক্ষর ছিল আবেদনপত্রটিতে। ৩৬টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত আবেদনপত্রে ২১টি বিষয়ের

উল্লেখ ছিল। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলন এবং মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এটি এক অমূল্য দলিল বলে বিবেচিত হতে পারে। রামমোহনের 'Appeal to the king in Council' এর সঙ্গে এই আবেদনের তুলনা চলতে পারে, তবে রামমোহনের আবেদন—"did not carry such immediate weight because Indian public opinion was not sufficiently well organized at that time."[২৩]

আবেদন পত্রটিতে যে সব মূল বিষয় পার্লামেণ্টে বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছিল সেগুলি এই রকম ঃ

যাদের হাতে শাসনের দায়িত্ব তাদের হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকলে প্রজার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। সুতরাং এই দুটি পৃথক করা প্রয়োজন। আইন প্রণয়নের জন্য পৃথক বিধান পরিষদে লোকের প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য জনপ্রতিনিধি থাকা প্রয়োজন। বর্তমানে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে জনগণের মতামত গ্রহণ করা হয় না। আইন প্রণয়নের জন্য বিধান পরিষদ (Legislature) প্রয়োজন, ১৭ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি বিধান পরিষদ স্থাপন করা দরকার কলকাতায়। বোম্বাই, মাদ্রাজ, উঃ পশ্চিম প্রদেশ ও বাংলা থেকে ৩ জন করে ভারতীয় নির্বাচিত হবেন এবং প্রতি গবর্ণর একজন করে উচ্চপদস্থ কর্মচারী মনোনীত করবেন। বৃটিশ সরকার মনোনীত করবেন একজন আইনজ্ঞ, তিনিই হবেন বিধান পরিষদের সভাপতি। সদস্যদের স্বাধীন মত প্রকাশের জন্য প্রতি সদস্য ৫ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হবেন, নিয়মিত বেতন পাবেন, অন্য কোন চাকুরি করতে পারবেন না, ৫ বৎসরের মধ্যে তাঁদের পদচ্যুত করা যাবে না। তবে কোন সদস্য অপরাধ করলে তাঁর বিচার হবে ফৌজদারী আদালতে। প্রকাশ্যভাবেই এই পরিষদের অধিবেশন ও আলোচনা হবে। সপারিষদ বড়লাটের হাতে বর্তমানে আইন প্রণয়নের যে ক্ষমতা আছে—এই পরিষদেরও তা থাকবে। তবে পরিষদ প্রণীত আইনগুলি সপারিষদ বড়লাটের অনুমোদন সাপেক্ষ হবে—অবশ্য সপারিষদ বড়লাটের অনুমোদন যদি না হয় তাহলে পরিষদ বৃটিশ পার্লামেণ্টের কাছেও আবেদন করতে পারবেন। যতদিন পর্যন্ত ভারতীয়েরা আপনাপন প্রতিনিধি নির্বাচন করতে অক্ষম বলে বিবেচিত হবে ততদিন পর্যন্ত বিধান পরিষদের সদস্যদের মনোনীত করবে বৃটিশ সরকার—তবে মনোনীত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে জনসাধারণের আপত্তির অধিকার থাকবে। বিধান পরিষদ প্রণীত আইন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টররা নাকচ করতে পারবেন না—নাকচ করার ক্ষমতা থাকবে কেবল বৃটিশ পার্লামেণ্টের। তবে নাকচ করার পূর্বে, ভারতীয় জনগণ ও বিধান পরিষদের মতামত ব্যক্ত করার জন্য ১ বৎসর পূর্বেই পার্লামেণ্টকে বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে।—("If any Bill be brought in parliament to repeal any act of the Legislature of India, or make a new law on any point affecting the inhabitants of India, twelve months notice thereof should be given to allow

the Legislative council, or any portion of the people, to take measures for being heard by Counsel, at the bar of both Houses, on the subject of the Bill.") এইভাবেই আবেদনপত্রে দাবি করা হয় ঃ কোন আইন প্রণয়নের পূর্বে ভারতীয় জনগণের মতামত শুনতে হবে। আবেদনপত্রের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ১৮৩৩ সালের সনদের বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয় এবং সেগুলি অপসারিত করার আবেদন করা হয়। এই আবেদনপত্রে বলা হয়েছিল অর্থের অভাবের অজুহাতে অনেক আশু সংস্কার স্থগিত রাখা হয়েছে। সপারিষদ বড়লাট, ছোটলাট, রেসিডেণ্ট সমূহের অযথা ব্যয় বন্ধ করে প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যের জন্য অর্থ ব্যয়ের অনুরোধ আবেদনপত্রে করা হয়। বর্তমানে ইংরেজ কর্মচারীরা অত্যধিক বেতন পান এবং সেই তুলনায় দেশীয় কর্মচারীরা কম বেতন পান—"There should be a reduction of the salaries of the higher offices, and that the saving thereby effected should, in part, be applied to the increase of the allowances of the lower, which are confessedly inadequate to their duties and responsibilities." বর্তমান অবস্থায় সাধারণতঃ যে ব্যক্তি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে পুলিশের কার্য তদন্ত করেন তাঁদেরই হাতে ফৌজদারী বিচারের ভার থাকায় বিচার বিভ্রাট ঘটে। সমিতি এই ব্যবস্থা রহিত করার আবেদন করেন। সরকারের লবণ-নীতির বিরুদ্ধে সমিতি প্রতিবাদ করে বলেন, "As salt is a necessary of life, the duty on salt should be entirely taken off as soon as possible." এবং যতদিন তা না হয়, ততদিন ১০০ মণে ২০০ টাকার বেশী শুল্ক যেন না হয়। রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য সরকার আবগারি দোকানের লাইসেন্স দেওয়ার ফলে মাদক দ্রব্যের যে প্রসার ঘটছে সেদিকেও আবেদনপত্রে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় "Measures so pernicious cannot be too severely condemned or too soon discontinued even though a larger revenue were to be derived therefrom than is really the case." এই আবেদনপত্রে ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বা Secular State রূপে প্রতিষ্ঠিত করারও আবেদন জানানো হয়—"That Government is for a mixed community, the members of which are of various and opposite sects, and the majority is composed of Hindus and Mahomedans It is, therefore, manifestly inexpedient that the Government should have any connection with the appointment of the ministers of any religion. All sects should accordingly be left to support the minister of their respective religions in the manner they deem most suitable." এসব ছাড়াও আবেদনপত্রে আরও বহুবিধ শাসন সংস্কারের জন্য—যেমন রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস, ব্যবসাবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন, দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ

প্রচেষ্টা গ্রহণ, বিচার বিভাগে উপযুক্ত লোক নিয়োগ, শিক্ষার বিস্তার, অন্যান্য দেশে প্রবর্তিত জনগণের সমুদয় আইনগত অধিকার প্রবর্তন ইত্যাদির জন্য প্রার্থনা করা হয়।

ভোলানাথ চন্দ্র তাঁর 'Life of Digambar Mitra' গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলেন যে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের এই আবেদনপত্রটি দিগম্বর মিত্র রচনা করেন। কিন্তু রামগোপাল সান্যাল রামগোপাল ঘোষের বক্তব্য উদ্ধার করে দেখিয়েছেন যে এটি হরিশচন্দ্রই রচনা করেন, "we have the authority of no less a personage than the late Babu Ram Gopal Ghosh, who in his speech on the death of Hurish-Chunder said that the famous petition sent from India protesting aganist the renewal of the Charter of the East India company in 1853, was 'drawn up' by Hurish Chunder himself."[২৪]

১৮৫৩ সালের ৭ই এপ্রিল এই আবেদনপত্র হাউস অব লর্ডসে ও ১৯শে এপ্রিল হাউস অব কমন্সে দাখিল করা হয়। কিন্তু বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্যরা ১৮৫৩ সালের এপ্রিল মাস নাগাদ জানতে পারেন যে তাঁদের আবেদন-পত্রের অধিকাংশ দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। তাঁরা তাই কলকাতার টাউন হলে ২৫শে জুলাই একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন। ৩ থেকে ১০ হাজারের মত জনতা এই সভায় উপস্থিত হয়। রাজা রাধাকান্ত দেব সভায় সভাপতিত্ব করেন। প্যারীচাঁদ মিত্র, রেভা কে. এম বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখেরা সভায় বক্তৃতা করেন। এই সভা থেকেই আবার একটি আবেদনপত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৮৫৮ সালের পর থেকে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ভূস্বামীদের স্বার্থ বেশী করে দেখতে শুরু করে। ১৮৫৯ সালে সংগঠনের তরফ থেকে বৃটিশ পার্লামেণ্টে যে দরখাস্ত পেশ করা হয় তার মধ্যে তার দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তনের রূপরেখাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে—"Your petitioners urge that the disturbances following the late mutiny of the sepoy army have well established the political advantage of a body of permanently settled zamindars, over the class of superior proprietors of land, who, under various denominations, with various rights, are to be found in all the unsettled provinces. A comparison of the loyal and the disloyal throughout the late period of crisis will, your petitioners submit, at least show the tendency of a permanent settlement to create a powerfull class, who feel their interest as one with the ruling power, and who are satisfied with their position no less than it shows that the opposite system has an exactly opposite

tendency and result."[২৫] ১৮৬০ সালের আবেদনেও এই একই যুক্তি প্রদর্শিত হয়। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের ও রাজনৈতিক চেতনার বিকাশে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ইতিবাচক ভূমিকা নিশ্চয়ই স্বীকার্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার সীমাবদ্ধতাও স্বীকার্য। অম্বিকাচরণ মজুমদারের মতে—"Constructive policy they had none and seldom, if ever, they laid down any programme of systematic action for the political advancement of the country."[২৬] বিপিনচন্দ্র পালের মতে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন শাখা-সংগঠন দ্বারা সমস্ত ভারতে ব্যাপ্ত হতে পারেনি।[২৭]

টীকা

১—The Friend of India. 23. 2. 1843

২—The Bengal Spectator, Vol. II NOS: 4 and 5, February—March, 1843

৩—বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (২য় খণ্ড)। বিনয় ঘোষ। পৃ: ২৮৯

৪—Indian Political Association & Reform of Legislature (1818—1917). Dr. B. B. Majumdar. P—28

৫—ঐ

৬—বাংলাদেশের ইতিহাস (আধুনিক)। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার। পৃ: ৫৩০

৭—The Life of Digamber Mitra. Vol. (i), P—66

৮—বি. বি. মজুমদারের পূর্বোক্ত গ্রন্থ। P—30

৯—History of Indian National Congress. Girija Kumar Mukherjee. P—54

১০—ঐ।

১১—Bengal Harukura. 26. 11. 1851

১২—রমেশচন্দ্র মজুমদারের পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ: ৫৩১

১৩—বি. বি. মজুমদারের পূর্বোক্ত গ্রন্থ। P—35

১৪—গিরিজা মুখার্জীর পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ: 175-76

১৫—বি. বি. মজুমদারের পূর্বোক্ত গ্রন্থ। P—36

১৬—রাজেন্দ্রলাল মিত্র। অলোক রায়

১৭—কর্মবীর কিশোরীচাঁদ। মন্মথনাথ ঘোষ। পৃ: ১৭৪

১৮—A General Biography of Bengal celebrities, Ram Gopal Sanyal. edt by Swapan Majumdar. P—59

১৯—বি. বি. মজুমদারের পূর্বোক্ত গ্রন্থ। P—37

২০—এক্ষণ / পৌষ—মাঘ, ১৩৭৭, পৃ: ৪৮

২১—গিরিজা মুখার্জীর পূর্বোক্ত গ্রন্থ। P—57

২২—Proceedings of the Madras Branch of the British Indian Association (London), 1852

২৩—গিরিজা মুখার্জীর পূর্বোক্ত গ্রন্থ। P—56

২৪—রামগোপাল সান্যালের পূর্বোক্ত গ্রন্থ। P—59

২৫—গিরিজা মুখার্জীর পূর্বোক্ত গ্রন্থ। P—59

২৬—Indian National Evolution. P—7.

২৭—Indian Nationalism. P—94

চতুর্থ অধ্যায়

সমাজোন্নতিবিধায়িনী সমিতি ও হরিশচন্দ্র

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণের ফলে সংঘবদ্ধভাবে নানাবিধ মানবকল্যাণকর এবং দেশের মঙ্গলপ্রসূ কর্মপ্রয়াস শুরু হয়। এর ফলে নানাবিধ সভা-সমিতি গড়ে ওঠে। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল এ সম্পর্কে লিখেছেন,…"সংঘবদ্ধ প্রয়াস স্বল্প সময় কত অধিক ফলপ্রসূ হয় তাহার দৃষ্টান্ত তাঁহাদের সম্মুখে কম ছিল না। রামমোহন রায় ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা নগরীতে বসবাস শুরু করিয়া ধর্মালোচনার নিমিত্ত পর বৎসর আত্মীয়সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। এ সমুদয় সভাসমিতির কার্যকলাপও নব্যশিক্ষিতেরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। বেথুন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ডঃ এফ. জে. মোঁএট ইহার সূচনায় বলিয়াছিলেন যে, স্কুল কলেজে পড়িয়া মানুষ মাত্র অর্ধেক শিক্ষালাভ করে। সংঘবদ্ধ বা সমাজবদ্ধভাবে আলাপ আলোচনা বিতর্কের মাধ্যমেই আমাদের শিক্ষা পূর্ণ হওয়া সম্ভব। নব্যশিক্ষার প্রাক্‌কালে সভাসমিতির বাহুল্য ঘটেও প্রধানত এ কারণে।"[১]

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয় গৌড়ীয় সমাজ। এই সমাজে সে যুগের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সঙ্গে তারাচাঁদ চক্রবর্তী, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ নব্য শিক্ষিতেরাও ছিলেন। গৌড়ীয় সমাজের অনুষ্ঠানপত্রে স্বদেশের হিতসাধনের জন্য সংঘবদ্ধ প্রয়াসের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছিল। অনুষ্ঠানপত্রটিতে দেশবাসিদের ভিতরে জ্ঞানের উন্নতি ও প্রসার, বাংলা ভাষায় গ্রন্থাদি অনুবাদ, নীতি ও শাস্ত্র বিগর্হিত কার্যদমন, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, গ্রন্থাগার গঠন ইত্যাদি বিষয়ে সমাজের কর্মপ্রয়াসের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল।[২]

১৮২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় একাডেমিক এসোসিয়েশন। এর উদ্যোক্তা ছিলেন হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও। তাঁরই উপদেশে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা এই সমিতি গঠন করে। এই এসোসিয়েশনের সম্পাদক হন উমাচরণ বসু এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, রাধানাথ সিকদার, মাধবচন্দ্র মল্লিক প্রমুখেরা। একাডেমিক এসোসিয়েশন আসলে ছিল একটি বিতর্ক সভা। স্বাধীন ইচ্ছা, ভাগ্য ও ভবিতব্য, পবিত্র সত্য, স্বদেশ প্রেমের মহত্ত্ব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, পৌত্তলিকতার অসারতা ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে সভার সদস্যরা বিতর্ক করতেন। এই সমস্ত বিতর্কের মাধ্যমে যুবকদের মানসিক পুষ্টি ও বুদ্ধি বৃত্তির জাগরণ ঘটেছিল। ডিরোজিওর জীবনচরিতকার যথার্থই লিখেছেন যে এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা…"Stirred

to their very depths the young, fearless, hopeful hearts of the leading Hindoo youths of Calcutta."[৩] এই এসোসিয়েশনের আদর্শে বর্ধিত, এংলো ইণ্ডিয়ান হিন্দু এসোসিয়েশন জ্ঞান সন্দীপনী সভা, ডিবেটিং ক্লাব, রঙ্গরঞ্জিনী সভা ইত্যাদি বিতর্কসভা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪] ১৮৩৮ সালের ২০শে জানুয়ারি জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা, স্বদেশের অর্থনৈতিক-সামাজিক শিক্ষাবিষয়ক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং রাজকৃষ্ণ দের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা। সভার সভাপতি হন তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং সম্পাদক হন রামতনু লাহিড়ী ও প্যারীচাঁদ মিত্র। এই সভায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ পঠিত হত। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক বিষয়েও প্রবন্ধাদি পঠিত হয়। ১৮৪২ সালের এপ্রিল মাসে এই সভার অধ্যক্ষেরা Bengal Spectator নামক সভার একটি মুখপত্র প্রকাশ করেন। উক্ত পত্রিকাটি সম্পর্কে অন্যত্র আমরা বিশদভাবে আলোচনা করেছি। উল্লেখযোগ্য যে, জ্ঞানোপার্জিকা সভার অধ্যক্ষেরা সমকালীন রাজনীতিকে আলোচনার বিষয়ীভূত করে সভার উদ্দেশ্যকে ব্যাপকতর করে দিয়েছিলেন। ইংরেজের রাষ্ট্রনীতির প্রতিকূল সমালোচনাও শুরু হচ্ছিল। ১৮৩৯ সালের ২৯শে অক্টোবর প্রধানত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয়তার ব্যাপক এবং উদার আদর্শ নিয়ে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "এই সভা সর্বতোভাবে রাজকীয় কার্যবিষয়ে সম্পর্কশূন্য থাকিয়া জাতীয়ভাষা এবং ধর্মপ্রণালীর উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।"[৫] তত্ত্ববোধিনী সভা কিন্তু তাই বলে নিছক কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ছিল না। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে এই সভা সচেষ্ট ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাবিস্তার, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি কার্যে অগ্রণী হয়েছিল। সভার মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা, সুরা-পান নিবারণ, শারীরিক শক্তির উন্মেষ, নীলকরের অত্যাচার, রাজাপ্রজার সম্বন্ধ নির্ণয়, জমিদারী ব্যবস্থার কুফল ইত্যাদি বিষয়েও রচনাদি প্রকাশিত হত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অবশ্য এই সভাকে একান্তভাবে ব্রাহ্মসমাজ পরিচালন এবং ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের কাজে নিয়োজিত করতে চান বলে অধ্যক্ষ সভার সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটে, ফলে ১৮৫৯ সালের মে মাস থেকে এই সভা বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৪৭ সালের ৩০শে ডিসেম্বর বড়বাজারের কয়েকজন নব্য শিক্ষিত যুবক সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে আত্মোন্নতি ও সমাজের হিতসাধনের উদ্দেশ্যে পার্সিভিয়ারেন্স সোসাইটি গঠন করেন। ১৮৫০ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে হিন্দু কলেজের কয়েকজন ছাত্রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় সর্বশুভকরী সভা। দেশীয় কুরীতি এবং কদাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং আন্দোলনই ছিল সভার মূল উদ্দেশ্য। এই সভার সভ্যরা বিদ্যাসাগর এবং মদনমোহন তর্কালংকারের পরামর্শে ১৮৫০ সালের অগাস্ট মাস থেকে সর্বশুভকরী পত্রিকা প্রকাশ করেন। "বাল্যবিবাহের দোষ কি" নামক বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধটি পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।[৬]

১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপধ্যোয়ের উদ্যোগে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সরল ভাষায় স্বল্প শিক্ষিতদের জন্য অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশই ছিল সভার প্রধান উদ্দেশ্য। ১৮৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে বেথুন সাহেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রতিষ্ঠিত হয় বেথুন সোসাইটি। সোসাইটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। সোসাইটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় যে, সোসাইটি সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়ের বিচারে ব্যাপৃত থাকবে, ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা এতে নিষিদ্ধ হয়। এই সভার সদস্যদের মধ্যে বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৈলাসচন্দ্র বসু, পাদরী জেম্স লঙ্, জে. টি. মারশাল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সোসাইটিতে সাহিত্য, কাব্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ এবং আলোচনা হত। এই সমস্ত আলোচনার মাধ্যমে দেশপ্রেম ও সমাজচেতনার উন্মেষ ঘটেছিল।...এইভাবেই দেখা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গড়ে উঠেছিল নানা সভাসমিতি। সামাজিক উন্নতি বিষয়ে এইসব সভাসমিতিগুলির পরোক্ষ অবদান দেশের সামাজিক ইতিহাসে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

এইসব পূর্বতন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কিশোরীচাঁদ মিত্রের উদ্যোগে ১৮৫৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যেবেলা কিশোরীচাঁদের কাশীপুরের বাড়িতে সামাজিক উন্নতি বিধায়িনী সভা স্থাপনের জন্য একটি সভা আহূত হয়। সভার সভাপতিত্ব করেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেন...

প্রথমতঃ, "সমাজ সংস্কার ছাড়া রাজনৈতিক সংস্কার অসম্ভব।"

দ্বিতীয়তঃ, "প্রবন্ধ রচনা ও বক্তৃতা প্রদানের সময় গিয়াছে। কার্যের সময় আসিয়াছে।"

তৃতীয়তঃ, আমাদের ব্যবহারিক ধর্ম বহু দোষের আকর এবং উন্নতির বিঘ্নকারী বলে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রয়োজন।

চতুর্থতঃ, "আমাদিগের জাতীয় কুসংস্কার সকল প্রকার সামাজিক সংস্কারে অতি প্রবলভাবে বাধাপ্রদান করে। সুতরাং একটির বিনাশের সহিত অপরটির উন্নতি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।"

সভার এই উদ্দেশ্য বর্ণনার পরে কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রস্তাব করেন ..."এই সভার মতে সাধারণ হিন্দু জনসংঘের বর্তমান সামাজিক অবস্থার আলোচনা করিয়া বোধহয় যে, সম্মিলিত ও যথোচিত প্রযত্নই ইহার উন্নতির একমাত্র উপায় এবং সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদসমিতি নামক একটি সভা স্থাপিত হউক।" কিশোরীচাঁদের এই প্রস্তাব সমর্থন করেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এরপরে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিম্ন প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন।..."সভ্যগণ স্ব স্ব দৃষ্টান্তে, শিক্ষায় কর্মে ও মতে দেশের সামাজিক উন্নতির বিঘ্নোৎপাদনকারী এবং যুক্তি ও সত্যের বিরুদ্ধ সর্বপ্রকার নীচ এবং নৈতিক অবনতির কারণস্বরূপ কুসংস্কারের অনুমোদন করিবেন না।" এই প্রস্তাব সমর্থন করেন যাদবচন্দ্র মিত্র। সভার পরবর্তী

প্রস্তাবটি ছিল "স্ত্রী শিক্ষার প্রবর্তন, হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ, বাল্য বিবাহ বর্জন এবং বহু বিবাহ প্রচলন রোধের নিমিত্ত সমিতির শক্তি বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হউক।" এর প্রস্তাবক কিশোরীচাঁদ মিত্র এবং সমর্থক অক্ষয়কুমার দত্ত। এরপর নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সমর্থন করেন কিশোরীচাঁদ মিত্র। "এই সমিতি কর্তৃক হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের আইন সম্বন্ধীয় অক্ষমতা দূর করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন করা হউক এবং আপাতত অনতিবৃহৎ আয়োজনে নগরের উপকণ্ঠে অথবা ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রযত্ন ও প্রচেষ্টা করা হউক।"[৭] সভার কর্মকর্তাদের তালিকা এইরকম :-

সভাপতি—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

যুগ্মসম্পাদক—কিশোরীচাঁদ মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্ত

কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য—রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, প্যারীচাঁদ মিত্র, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর দে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, শ্যামাচরণ সেন, দিগম্বর মিত্র, যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গৌরদাস বসাক।

পরবর্তীকালে রাধানাথ সিকদার, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, তারকনাথ সেন, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, হেরম্বচন্দ্র চৌধুরী, জীবনকৃষ্ণ সেনও সভ্য হন।

এই সমিতিতে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ভবানীপুর থেকে কাশীপুরের দূরত্ব অনেকখানি হলেও নিয়মিত তিনি অধ্যক্ষ সভার অধিবেশনে এবং সাধারণ সভায় উপস্থিত থেকে আলোচনায় যোগ দিতেন ও কার্য নিয়ন্ত্রণে বিশেষভাবে সাহায্য করতেন। সমাজোন্নতিবিধায়িনী সমিতি কয়েকটি বিশেষকার্যে হস্তক্ষেপ করে। অন্তর্জলী প্রথার বিলোপে এই সভা অগ্রণী হয়। সমিতি অগ্রণী হয় স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তারেও। কিশোরীচাঁদের কাশীপুরের বাসভবনে একটি বালিকা শিক্ষালয় এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সমিতি বাঙালী কৃষকদের যথার্থ অবস্থা ইংলণ্ডের জনসাধারণের কাছে জানানোর জন্য "প্রজাগণের সামাজিক অবস্থা" বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য পাঁচশত টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেন। প্রবন্ধের পরীক্ষক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিশোরীচাঁদ মিত্র এবং পাদরী লঙ। বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধেও সভা আন্দোলন করে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর বহু বিবাহ বিষয়ক পুস্তকের ভূমিকায় লিখেছেন যে, এই সমিতি বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে ১৮৫৫ সালে ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন করেন। ১৮৫৫ সালের ২৭শে জানুয়ারি এই সভার যে মাসিক ও বার্ষিক অধিবেশন হয় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সভাপতিত্বে সেখানে প্রস্তাব করা হয় যে, বহু বিবাহ বিষয়ে একটি আইন প্রণয়ন প্রয়োজন, যাতে যে সব কুলীন ব্রাহ্মণ বহু বিবাহ করেন তাঁদের পরিণীতা স্ত্রীদের ভরণ পোষণের জন্য আইনানুসারে বাধ্য করা যায়। ব্যবস্থাপক সভায় সমিতি যে আবেদনপত্র প্রেরণ করেন তা সংশোধন ও বিচারের ভার দেওয়া হয় চন্দ্রশেখর দেব, রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উপর।[৮]

টীকা

১. যোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত বাংলার নব্য সংস্কৃতি, পৃঃ ১-২

২. সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৬০তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

৩. **Henry Derozio by Thomas Edwards**, P. 32

৪. সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ১২১-১২৩

৫. বাঙ্গালার ইতিহাস, ৩য় ভাগ, পৃঃ ২৫

৬. শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগর জীবনচরিত।

৭. মন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র, পৃঃ ১০০-১১১

৮. অলক রায় প্রণীত রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্রাহ্মধর্ম ও হরিশচন্দ্র

১৮৫১ সালে আদি ব্রাহ্ম সমাজেব পুনর্গঠনের পরে কলকাতার সন্নিকটে ও অন্যান্য প্রদেশে ব্রাহ্ম সমাজ গড়ে উঠতে থাকে। এই ভাবেই ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমে ভবানীপুর ব্রাহ্মসাজেব পত্তন হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর গ্রন্থে ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাস বর্ণনা কবেছেন।[১]

১৮৫২ সালের জুন মাসে কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলেব প্রভাবশালী ও নামী লোকেরা শম্ভুনাথ পণ্ডিতেব গৃহে সমবেত হয়ে 'জ্ঞান প্রকাশিকা সভা' নামে এক সভা স্থাপন করেন। সভার লক্ষ্য ছিল সভ্যদেব আত্মিক উন্নতি সাধন। নামে পৃথক হলেও কার্যত এটিও ছিল ব্রাহ্ম সমাজ। শম্ভুনাথ পণ্ডিত ছিলেন এই সভার সভাপতি, হাইকোর্টের উকিল অন্নদাপ্রসাদ ব্যানার্জী সহ সভাপতি এবং সভার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখার্জী। কাশীশ্বর মিত্রও এই সভাব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কাশীশ্বর আবার আদি ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য ছিলেন এবং ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধু। কাশীশ্বর সরকারের আইন বিভাগের উচ্চ কর্মচারী ছিলেন এবং সে সময়ে তিনি ভবানীপুর অঞ্চলেই বসবাস করতেন। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ গঠনের মূলে তাঁর প্রভাব অনুমিত হয়।

প্রথমদিকে অবশ্য 'জ্ঞান প্রকাশিকা সভা', শিবনাথ শাস্ত্রী যাকে প্রকারান্তরে ব্রাহ্ম সমাজ বলেছেন—আদি ব্রাহ্ম সমাজের নীতি নিয়ম অনুসরণ করত না। নিজেদের নিয়মই মেনে চলত। সভায় গীতা ও অন্যান্য প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ করা হত ও ধর্ম সঙ্গীত গীত হত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পূর্বে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদি ব্রাহ্ম সমাজ ঈশ্বর প্রত্যাদেশে বিশ্বাসী ছিল—বেদ ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট কিনা এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হত, কিন্তু ১৮৪৯-৫০ সাল নাগাদ তাঁদের এ বিশ্বাস শিথিল হয়ে যায়। বেদ বা উপনিষদে ব্রাহ্ম ধর্মের ভিত্তি বা পত্তনভুমির সন্ধান না পেয়ে দেবেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত করেন—"আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই তাহার পত্তনভূমি।"[২]

ভবানীপুরের 'জ্ঞান প্রকাশিকা' সভায় দেবেন্দ্রনাথ মাঝে মধ্যে আসতেন বলে শিবনাথ শাস্ত্রী উল্লেখ করেছেন। সম্ভবতঃ তাঁরই প্রভাবে সভায় একদল সভ্য 'ব্রাহ্ম সমাজ' নাম গ্রহণে উৎসাহী হন এবং উক্ত সমাজের রীতিনীতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু 'জ্ঞান প্রকাশিকা' সভার সমস্ত সদস্যই এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাতে পারেন নি। কিছু সদস্য সভার সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করেন। ["It was perhaps through his influence that a party soon

arose amongst the first members who contended for the adoption of the Brahmo Samaj name and also for the introduction of the Adi Samaj form of Divine Service. The decision of the majority in favour of these proposals caused a number of the early supporters of the movement to cut off there connection with the Society."]

১৮৫৩ সালের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে ভবানীপুর ব্রাহ্ম-সমাজের পত্তন হয়। রামগোপাল সান্যাল লিখেছেন, "ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের তিনি (হরিশচন্দ্র) একজন প্রধান উদ্যোগী।"[৩] ২/১ বৎসরের মধ্যে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনাগৃহ নির্মিত হয়, সাপ্তাহিক সমাবেশের আয়োজন করা হয় এবং এই সমাবেশে ভাষণ দেবার জন্য কলকাতার ব্রাহ্ম সমাজ থেকে বক্তারা আসেন। রামগোপাল সান্যালের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, হরিশচন্দ্র ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজে অনেকবার বক্তৃতা করেন। এ সব বক্তৃতা অবশ্য লিখিত। ১৮৫৪ সালের ২৩শে ডিসেম্বর হরিশ 'ব্রাহ্ম সমাজ, উহার বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ আশা' (Brahma Samaj, its position and prospect), ১৮৫৬ সালের ১৬ই জানুআরি 'ব্রাহ্ম সমাজের ধর্মবিশ্বাস' (Positive theology of the Brahmo Samaj) এবং ১৮৫৭ সালে 'সাধারণে একত্রে ঈশ্বর আরাধনার উপকারিতা' (On the utility of. public worship) বিষয়ে ভাষণ দেন। হরিশের এই সমস্ত বক্তৃতা ব্রজলাল চক্রবর্তী পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ব্রজলাল চক্রবর্তী বলেন যে হরিশ ভগবৎ গীতা সম্পর্কেও একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন।[৪]

হরিশ তাঁর ধর্মবিষয়ক এইসব প্রবন্ধ ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে পাঠ করেন, না, 'সত্যজ্ঞান সঞ্চারিনী' সভায় পাঠ করেন তা অবশ্য বিতর্কের বিষয়। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে জানিয়েছেন যে, ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হবার এক বৎসর পরে তত্ত্ববোধিনী সভার অনুরূপ 'সত্যজ্ঞান সঞ্চারিনী' সভা স্থাপিত হয়. এতে ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজের কিছু সদস্য ছাড়াও স্থানীয় যুবকরাও অংশগ্রহণ করতেন। এখানে আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা ও প্রবন্ধ পাঠ হত। ১৮৫৩-৬১ সাল পর্যন্ত এই সভায় পঠিত বহু প্রবন্ধের লেখক ছিলেন স্বয়ং হরিশচন্দ্র।

বাস্তববাদী হরিশ ধর্ম ও অধ্যাত্ম বিষয়ে কৌতূহলী ছিলেন। রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন, "Hurish being a practical man, was still very fond of metaphysics and highly conversant with that branch of knowledge."[৫] ১৮৫৯ সালে রাজনারায়ণ বসুর "ধর্মতত্ত্বদীপিকা" গ্রন্থ সম্পর্কেও হরিশের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। রাজনারায়ণ লিখেছেন, "Hurish was a Brahmo in his religion."[৬] কিন্তু রামগোপাল সান্যাল লিখেছেন—"তিনি ব্রাহ্ম সমাজাদি স্থাপন করিলেও প্রতিমা পূজাপদ্ধতি ত্যাজ্য মনে করিতেন না, তিনি আপন বাটীতে দুর্গোৎসব করিতেন।"[৭]

টীকা

১. Hisotry of the Brahmo Samaj. Sivnath Shastri. P. 287-90

২. আত্মচরিত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩. এক্ষণ—পৌষ-মাঘ ১৩৭৭, পৃঃ ৪৭

৪. ঐ। পৃঃ ৪৭-৪৮

৫. A General Biography of Bengal Celebrities. Ramgopal sanyal. edt. by Swapan Majumdar. P. 83

৬. ঐ।

৭. এক্ষণ—পৌষ-মাঘ, ১৩৭৭, পৃঃ ৪৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও হরিশচন্দ্র

উত্তরপাড়ার রাজা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে হরিশচন্দ্রের হৃদ্যতা ছিল। হরিশ একবার তাঁর ব্যক্তিগত বিপদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৮৫৮ সাল। জয়কৃষ্ণ জমিদারী পরিদর্শনে বাইরে গিয়েছেন। এই সময়ে, ১৮৫৮ সালের ৮ই মার্চ তিনি হাওড়ার জেলা শাসক জে জে. গ্রের তলব পান। জয়কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি তাঁর প্রজা মদন দাসকে প্রতারণা-পূর্বক অপহরণ করেছেন। মদন দাস জয়কৃষ্ণের বালুটি অঞ্চলের প্রজা। মদনের স্ত্রী ফিনি দাসের অভিযোগক্রমে জয়কৃষ্ণকে তলব করেছেন জেলাশাসক। জেলাশাসকের নির্দেশ, জয়কৃষ্ণকে ২রা জুন আদালতে হাজির হতে হবে।

জয়কৃষ্ণের জীবনীকার অবশ্য বলেছেন যে তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগটি অলীক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এই অভিযোগে জনৈক যদুনাথ ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষী ছিল, সে আদালতে জয়কৃষ্ণের নামে এক জাল চিঠি দেখিয়েছিল। কঠোর হৃদয় জমিদার বলে জনসাধারণের মধ্যে জয়কৃষ্ণের অবশ্য কিছু কুখ্যাতি ছিল। ফলে, আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ সহজেই বিশ্বাসযোগ্য হয়। ১৮৫৮ সালের ৯ই ডিসেম্বর এই মামলার রায় ঘোষিত হয়। আদালতে জয়কৃষ্ণ দোষী বলে সাব্যস্ত হন এবং তাঁর শাস্তি হয় ৪• মাস সশ্রম কারাদণ্ড। জয়কৃষ্ণের উকিল এই রায়ের বিরুদ্ধে সেশন জজের কাজে আবেদন করেন। ফলে পুনর্বার বিচারের জন্য তাঁকে নিয়ে আসা হয় আলিপুরে। কিন্তু এখানেও বিচারের প্রহসন হয়। ১৮৫৮ সালের ১৩ই ডিসেম্বর সেশন জজ তাঁর রায়ে হাওড়ার জেলা শাসকের রায়কেই সঠিক বলে অনুমোদন করে বিচার শেষ করেন।

জয়কৃষ্ণের শাস্তিতে ইউরোপীয় সমাজ খুশী হয়। তার কারণও অবশ্য ছিল। জয়কৃষ্ণ বৃটিশ শাসনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সমালোচনা করতেন। এইসব সমালোচনা তারা পছন্দ করত না। ফলে আদালতের রায় তাদের কাছে অভিপ্রেত হয়। এ সম্পর্কে Bengal Hurkaru ও Friend of India কাগজে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়। বাঙালী জনসমাজের একাংশও এতে আনন্দিত হয়। জয়কৃষ্ণের বিচার ও শাস্তিকে কেন্দ্র করে গান বাঁধা হয়ঃ

জয়কেষ্টর একি কষ্ট হল শীতকালে,
শাল জামিয়ার ফেলে বাবু
সেঁধুলেন কম্বলে ॥

সেকালের কবিওয়ালারাও গান বাঁধেন[২]—

বড় বারে বারে এসে ঘরে মকদ্দমা করে ফাঁক্ ।
এইবারে, গেরে, তোমার কল্লে সূর্পণখার নাক্ ॥
ক্যামন সুখ পেলে, কম্বলে শূলে, ব্রহ্মত্তর
দেবোত্তর বড় নিতে জোর করে ।
এখন জারী গ্যালো, ভূর ভাংলো তোমার,
আত্তো জুলুম চলবে না ।
পেনেলকোডের আইনগুণে মুখুজ্যের
পোর ভাংলো জাঁক ॥
বেআইনির দফারফা বদমাইসি
হলো খাক্ ॥
কুইনের খাসে দেশে, প্রজার দুঃখ
রবে না ।
মহামহোপাধ্যায় মথুরনাথ
মুসড়ে গিয়েছেন ।
কংস ধ্বংসকারী লেটোর,
জেলায় এসেচেন ।
এখন গুলি গেরেপ্তারি লাঠি দাঙ্গা
ফোর্জ চলবে না ॥

জয়কৃষ্ণের এই দুর্দিনে সাহায্যের হাত প্রসারিত করে দিয়েছিলেন হরিশচন্দ্র। তিনি তাঁর পত্রিকায় জয়কৃষ্ণকে সমর্থন করে লেখেন যে, জয়কৃষ্ণের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির ফলেই স্বাভাবিকভাবে তাঁর অনেক শত্রু জুটেছে। জয়কৃষ্ণকে দিতে হচ্ছে তাঁর স্বাধীনচিত্ততার মূল্য।[৩] হরিশ তাঁর পত্রিকায় জয়কৃষ্ণের সমালোচনার বিরুদ্ধে কলম ধরেন, তাঁর বিরুদ্ধে কোন লেখা বা চিঠি পত্রিকায় প্রকাশ করতে সম্মত হন নি তিনি।

আদালতের রায়ে জয়কৃষ্ণের কারাবাস হয়। কারাগারেও তিনি কিন্তু আলোড়ন সৃষ্টি করেন। খাবার-দাবার ইত্যাদি ব্যাপারে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে ভারতীয়দের যে বৈষম্য ছিল কারাগৃহে সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করেন।[৪]

১৮৫৯ সালের ৬ই জানুয়ারি নিজামত আদালতে জয়কৃষ্ণের মামলা ওঠে। এক্ষেত্রে তাঁর উকিল ছিলেন শম্ভুনাথ পণ্ডিত। বিচারক এ. সোন্স জয়কৃষ্ণের বিরুদ্ধে উত্থিত অভিযোগ এবং যদুনাথ প্রদত্ত চিঠিকে জাল চিঠি বলে রায় দেন। বিচারক বলেন, "I admit that the villainy indicated by the letters justly rouses the indignation; but the villainy

which would convict them is deeper and taking the record as it comes before me I think the Magistrate's conviction must be set aside."[৫]

হরিশচন্দ্র নিজামত আদালতের এই রায়কে স্বাগত জানিয়ে হিন্দু পেট্রিয়টে লেখেন যে এটা দেশীয়দের পক্ষে একটা শিক্ষা। জয়কৃষ্ণের মত মানুষ যখন বিচারের নামে এরকম অবিচার পান তখন সাধারণ মানুষ তো আরও অসহায়। তাদের জীবন ও সম্পদের কোন নিরাপত্তা নেই।[৬]

হরিশচন্দ্রের ইঙ্গিত স্মরণ রেখে সমস্ত ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিখে জনসাধারণকে অবগত করার প্রেরণায় জয়কৃষ্ণ "A Few Notes on a Recent Trial Illustrative of Mofussil Judicature."···নামে এক পুস্তিকা রচনা করেন। এতে জয়কৃষ্ণ লেখেন, "In other countries wealth is supposed in some degree to protect its possesser from wrong, here it operates to prevent him from obtaining that measure of justice which is considered the due of poorer individuals."

নিজামত আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়ে জয়কৃষ্ণ লেখেন, "The huminous judgement of the Nizamat Court so completely demolishes the unsound fabric of evidence built up in the lower courts, as to render it unnecessary to pulverise its ruins."

মফস্বলের অপরাধ সংক্রান্ত বিচারের জন্য জয়কৃষ্ণ প্রস্তাব দেন, "The misfortunes of an individual can hardly be a matter of regret, if in the end they be conducive to the general good; and I shall therefore be almost content to have undergone the cost, annoyance, personal suffering, and at one time apparent disgrace above described, provided the disclosure of their history should head to such changes in the system of dispensation of Justice (So called) in the mofussil, as may render their recurrence more rare."

হরিশচন্দ্র তাঁর পত্রিকায় জয়কৃষ্ণের এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানান।[৭]

টীকা

১. A Bengal Zamindar: Jayakrishna Mukherjee of Uttarpara and his times 1808-1888. Nilmani Mukherjee. P. 209-214.

২. হুতোম প্যাঁচার নকশায় উদ্ধৃত।

৩ Hindoo Patriot. 16. 12. 1858

৪. ভূদেব চরিত (১ম খণ্ড), পৃ. ১৭৯-৮০

৫. নীলমণি মুখার্জীর পূর্বোক্ত গ্রন্থ

৬. Hindoo Patriot. 27. 1. 1859

৭ Hindoo Patriot. 16. 7. 1895

সপ্তম অধ্যায়

মিঃ ওয়াকোপ ঃ কিশোরীচাঁদ ও হরিশচন্দ্র

কিশোরীচাঁদ মিত্রই আমাদের দেশবাসীর মধ্যে প্রথম জাস্টিস অব্ দি পীস ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। তখন শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয়দের মধ্যে বিচারের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য ও পক্ষপাত ছিল কিশোরীচাঁদ তা দূর করার জন্য উদ্যোগী হন। এতে ইংরেজরা অপমানিত বোধ করে। তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার মিঃ ওয়াকোপ এই অপমানেব প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উদ্যত হন!

ইতিপূর্বে ওয়াকোপ কয়েকবার কিশোরীচাঁদের বিরুদ্ধে সরকারের কাছে অভিযোগপত্র দাখিল করেছিলেন। কিন্তু সে সকল অভিযোগ ফলপ্রসূ হয় নি। যদিও কার্যতঃ ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের উপর পুলিশ কমিশনারের মন্তব্য প্রকাশের অধিকার ছিল না, তবু এবার দুটি মোকদ্দমাকে কেন্দ্র করে ওয়াকোপ সবকারের কাছে রিপোর্ট করলেন যে, মোকদ্দমায় ম্যাজিস্ট্রেট কিশোরীচাঁদ মিত্রের বিচার, "hurried, slovenly and unbusiness like."[১]

মিঃ ওয়াকোপের রিপোর্টের বিরুদ্ধে কিশোরীচাঁদ কলম ধরেন। ১৮৫৮ সলের ৭ই জুলাই বাংলা সরকারের সেক্রেটারী এ. আর. ইয়ংকে এক পত্রে তিনি—

১. মিঃ ওয়াকোপের অসঙ্গত ও অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান।

২. ওয়াকোপের আইন সম্বন্ধে অজ্ঞতার প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

৩. কেবলমাত্র স্মৃতিনির্ভর রিপোর্টের জন্য ওয়াকোপকে নিন্দা করেন।

কিশোরীচাঁদের এই সতেজ প্রতিবাদপত্রের ফলে বুমেরাং হল। অভিযোগ করতে গিয়ে ওয়াকোপ নিজেই অভিযুক্ত হয়ে পড়লেন। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি —"পুনরায় তাঁহার স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করিয়া কিশোরীচাঁদের নামে সরকারী কাজে নিবেশিত লিখনের দোষ আরোপ করিলেন।"[২] কিন্তু ওয়াকোপের অভিযোগ যে প্রমাণভিত্তিক নয়, অলীক, তা বুদ্ধিমান ইংরেজের পক্ষে অনুধাবন করা কষ্টকর হয় নি। হ্যালিডের আপোষ মীমাংসার প্রস্তাব তারই প্রমাণ। স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে কিশোরীচাঁদকে আপোষ মীমাংসায় আসতে প্রস্তাব দেন। কিন্তু এ প্রস্তাব কিশোরীচাঁদ গ্রহণ করতে পারেন নি। স্বাধীনচেতা কিশোরীর মনে হয়েছিল যে এ প্রস্তাব গ্রহণ করার অর্থ ওয়াকোপের কাছে প্রকারান্তরে আত্মসমর্পণ করা। এই সময় মধুসূদন দত্ত এবং হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিশোরীকে কাশ্য বিচারের জন্য উত্তেজিত করে তোলেন। ভোলানাথ চন্দ্র লিখেছেন— 'when he was in hot water, Modhu and Harish Mookerji

came to his help. They dress up all the necessary papers for him. They advised him to ask for a commission."[৩]

এ ব্যাপারে বিচারের জন্য জে হাইণ্ড, ফার্গুসন ও হরচন্দ্র ঘোষকে নিয়ে সরকার এক তদন্ত কমিশন গঠন করেন। কিন্তু সরকার তদন্তের ব্যাপারে যে-ভাবে অগ্রসর হচ্ছিলেন তাতে কমিশনারদের অপক্ষপাত মন্তব্য বা বিচার সম্ভব ছিল না। তদন্ত কমিশনের রায়ও তাই পক্ষপাত দুষ্ট হয় স্বাভাবিকভাবে। কিশোরীচাঁদ দোষী সাব্যস্ত ও কর্মচ্যুত হন। হরিশের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় এই বিচার নামক প্রহসনের বিরুদ্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। হরিশ 'দেশী ম্যাজিস্ট্রেট' প্রবন্ধে…[৪]

১. বিচারে পক্ষপাতিত্ব,

২. কমিশনারের অসত্য সংবাদ পরিবেশন ও অন্যায় ক্রোধ চরিতার্থের ইচ্ছা,

৩ ভাসা ভাসা স্মৃতির উপর বাদীপক্ষের প্রমাণ…

প্রভৃতি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। এরপরে তিনি 'দেশী কর্মচারী' নামক প্রবন্ধে[৫] লেখেন…

১. পুলিশ-আইনানুসারে যখন ম্যাজিস্ট্রেটের উপর পুলিশ কমিশনার কর্তৃত্ব করতে পারেন না, তখন কি করে মিঃ ওয়াকোপ লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের অনুমতি লাভ করলেন এ ব্যাপারে।

২. সরকার নিজ ব্যয়ে বাদী ওয়াকোপের পক্ষে ব্যারিস্টার দিয়ে নিজেই বাদী সাব্যস্ত হলেন।

৩ "দেশীলোক ব্যতীত য়ুরোপীয় কর্মচারীগণকে কখনও এরূপ দোষে কর্মচ্যুত হইতে দেখা যায় নাই। দেশী কর্মচারীগণের প্রতি কঠোর নীতি প্রবর্তন করিবার জন্য আমরা অনুযোগ করিতেছি না, কেবলমাত্র দেশী ও ইউরোপীয় কর্মচারীদের মধ্যে যে প্রভেদ বর্তমানে তাহাই দেখাইতে চাহি।"

(মন্মথনাথ ঘোষের অনুবাদ)

'হিন্দু পেট্রিয়টে'র ৪৮ সংখ্যায় 'কয়েকজন বাঙ্গালী' স্বাক্ষরিত এক পত্রে এই 'ঘৃণিত ষড়যন্ত্র' এবং বাঙালী জাতির অপ্রিয় হ্যালিডে সাহেবের ইংরেজ সমাজের প্রশংসা লাভার্থে এই অন্যায় কার্যের প্রতিবাদ করে লিখিত হয় যে, এই অন্যায়ের প্রতিবাদকল্পে একটি প্রতিবাদ সভা আহবান প্রয়োজন।

টীকা

১. কর্মবীর কিশোরীচাঁদ। মন্মথনাথ ঘোষ। পৃ. ১১৯
২. ঐ। পৃ. ১২৬
৩. মধুজীবনী। যোগীন্দ্রনাথ বসু। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।
৪. Hindoo Patriot. ৪. ১১. ১৮৫৮
৫. ঐ. ১১. ১১. ১৮৫৮

অষ্টম অধ্যায়

লর্ড ক্যানিং ও হরিশচন্দ্র

লর্ড ডালহৌসীর স্বত্ববিলোপ নীতির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন হরিশচন্দ্র তাঁর হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজে। কিন্তু লর্ড ক্যানিং এর প্রশাসন সম্পর্কে তাঁর প্রকাশ্য প্রশংসা হিন্দু পেট্রিয়ট থেকে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। লর্ড ক্যানিং-এর সঙ্গে হরিশের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল কিনা, পরিচয় থাকলেও সে পরিচয় কতখানি গভীর ছিল সে সম্পর্কে অবশ্য তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নি। কিন্তু হরিশচন্দ্র যে ক্যানিংএর শাসননীতি এবং তাঁর বিবিধ ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। হরিশের জীবনচরিতকার রামগোপাল লিখেছেন যে, সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজরা দলবদ্ধ হয়ে নিজেদের সংবাদপত্রগুলিতে সিপাহীদের অত্যাচারের অতিরঞ্জিত কাহিনী যখন প্রকাশ করতে শুরু করে এবং যখন বৈর নির্যাতনের বিবিধ উপায় অবলম্বনের জন্য সরকারকে নির্মম ও বিবেকহীন হতে উপদেশ দেয়, সেই সময় হরিশচন্দ্র তাঁর হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজে প্রতিবাদ শুরু করেন। রামগোপাল লিখেছেন—"লর্ড ক্যানিং ও তাঁহার সদস্যগণ হরিশের লিখিত প্রস্তাব সকল পাঠ করিয়া দেশের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিয়াছিলেন। কাগজে বেশি চিৎকার না করিতে পারিলে কোন বিষয়েই জয়লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং সাহেব ও ফিরিঙ্গিগণ দলবদ্ধ হইয়া দিন দিন নূতন বিষয়ে দেশীয়দিগের স্বত্বাধিকার লোপ করিবার মানসে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের পক্ষ হইয়া বড় বড় খবরের কাগজসকল হুহুংকার ছাড়িতে লাগিলেন। ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া, ইংলিশম্যান, ফিনিক্স, হরকরা একবাক্যে ইংরাজ পক্ষ হইয়া এতদ্দেশীয়দিগের উপর কোন সৎবিচার ও ক্ষমা প্রদর্শন না করা হয়, এতদ্বিষয়ে বদ্ধ পরিকর হইল। সে সময় এদেশের পক্ষ হইয়া দুইটা কথা বলে এমন লোক ছিল না। হরিশ একাকী হিন্দু পেট্রিয়টে স্বদেশের অহিতকর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জোর কলমে লিখিতে লাগিলেন। যখন ইংরাজেরা কলিকাতার অধিবাসীদিগকে নিরস্ত্র করিতে পরামর্শ দিলেন তখন হরিশচন্দ্র দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া ইহার অমূলকতা বুঝাইয়া দেন। লর্ড ক্যানিং তখন আমাদের দেশের বড়লাট ও সেসিল বিডন ইণ্ডিয়া গবর্নমেন্টের সেক্রেটারী ছিলেন। ইহারা হরিশকে শ্রদ্ধা করিতেন। হরিশ লর্ড ক্যানিংএর কার্যপ্রণালীর পোষকতা করিতে লাগিলেন।"[১] মুসলমানদের মহরম পর্ব সন্নিকট হওয়ায় কলকাতায় ইংরেজরা অকারণ ভীতিতাড়িত হতে থাকে। কলকাতার গ্র্যাণ্ড জুরির প্রধান জে. এইচ. ফারগুসন সরকারের কাছে প্রস্তাব করেন যে, আগামী মহরমে জীবনাশংকা বোধ করায় লাটসাহেব যেন কলকাতার সমস্ত দেশীয় লোককে নিরস্ত্র করেন, অস্ত্র রাখার আইন বিধি বদ্ধ

করার আবেদন তাঁরা করেন। এই প্রস্তাব সম্পর্কে আপত্তি করে হরিশচন্দ্র হিন্দু পেট্রিয়টে লেখেন যে, গ্র্যান্ড জুরি নিজেদের ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে অনধিকার চর্চায় রত হয়েছেন। স্পষ্টভাবেই হরিশ লেখেন যে, এই দেশীয় লোকেদের নিরস্ত্র করা কিংবা অস্ত্র আইন বিধিবদ্ধ করা সম্পর্কে কোন রকম প্রস্তাব গ্র্যান্ড জুরি করতে পারেন না। হরিশের রচনাগুণেই হোক কিংবা আভ্যন্তরীণ কোন রাজনীতি গুণেই হোক শেষ পর্যন্ত দেখা গেল গ্র্যান্ড জুরির প্রস্তাব সরকার গ্রাহ্য করলেন না। এর ফলে লাট সাহেবের উপর ইংরেজ সমাজ অপ্রসন্ন হয়।

সিপাহী বিদ্রোহের সূত্রপাতে লর্ড ক্যানিং একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন। ঘোষণাপত্রটির তারিখ ১৮৫৭ সালের ১৬ই মে। এই ঘোষণাপত্রটিতে দেশীয় লোকেদের এই বলে আশ্বাস দেওয়া হয় যে, সরকার এদেশীয়দের ধর্মে কখনও যেমন হস্তক্ষেপ করেন নি, তেমনি ভবিষ্যতেও করবেন না। ঘোষণাপত্রটি এই রকম—

নং ৯৫২

হোম ডিপার্টমেণ্ট ১৬ই মে ১৮৫৭

লাট সাহেবের ঘোষণাপত্র

লাট সাহেব মন্ত্রিসভার সদস্যগণসহ দেশীয় সৈন্যগণকে সতর্ক করিতেছেন যে কোন কোন রেজিমেণ্টের লোকেরা এইরূপ রটাইয়া দিয়া লোকেব মনে সন্দেহ উৎপন্ন করিয়াছে, যে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট তাহাদের ধর্ম্ম ও জাতি নষ্ট করিতে মানস করিয়াছেন। ইহা অলীক ও মিথ্যা কথা।

লাট সাহেব ও সদস্যগণ জানিয়াছেন যে, এই সন্দেহ, কুঅভিসন্ধিবিশিষ্ট দুষ্ট লোকেরা কেবল সৈন্যমধ্যে নহে জনসাধারণ মধ্যেও বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে।

লাট সাহেব ইহা জানিয়াছেন যে, এই বলিয়া হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যগণ ও অন্যান্য প্রজাগণের বিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টা হইতেছে যে, গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তাহাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্য কার্য্য করিতেছেন এবং নিজের উদ্দেশ্য সাধনার্থে তাহাদিগকে নানা উপায়ে জাতিচ্যুত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন।

এই সকল মিথ্যা বাক্য দ্বারা অনেকে প্রতারিত হইয়াছে। পুনর্ব্বার লাট সাহেব সকল শ্রেণীর প্রজাগণকে সাবধান করিতেছেন যে, তাঁহারা যেন এইরূপ অলীক বাক্যে প্রতারিত না হন।

লাট সাহেব সকল শ্রেণীর প্রজাগণের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও ধর্ম্মভাব বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত দেখিয়া থাকেন।

লাট সাহেব ঘোষণা করিতেছেন যে, ঐ সকল ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে ত্রুটি করিবেন না, তিনি পুনর্ব্বার স্পষ্ট বাক্যে ঘোষণা করিতেছেন, যে গবর্ণমেণ্ট

কখনই কোন ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না, এবং সকল শ্রেণীর প্রজাগণের ধর্ম্মরক্ষা ও জাতীয় কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করেন নাই ও করিবেন না।

লাট সাহেব ও তাঁহার সদস্যগণ কখন প্রজাবর্গকে প্রতারণা করেন নাই, এবং তজ্জন্য তিনি প্রজাদিগকে অনুরোধ করিতেছেন যে তাঁহারা এই সকল বিদ্রোহ—সূচক মিথ্যা বাক্যে বিশ্বাস না করেন। যাঁহারা এপর্য্যন্ত স্বভাবসিদ্ধ রাজভক্তি ও সদাচরণে গবর্ণমেণ্টের অনুরক্ত রহিয়াছে এবং গবর্ণমেণ্ট সকলকে রক্ষা করেন, ও সকলের প্রতি ন্যায় বিচার প্রদর্শন করিয়া থাকেন বলিয়া যাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, উপস্থিত ঘোষণাপত্র তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রচারিত হইল।

লাট সাহেব এই সকল প্রজাকে অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহারা দুষ্ট বিশ্বাসঘাতকের কথা শুনিয়া বিপদে ও লজ্জায় পড়িবার পূর্ব্বে যেন সাবধান হইয়া বিবেচনা করেন।

সিসিল বিডন
সেক্রেটরী
মে ২১, ১৮৫৭

(রামগোপাল সান্যাল কর্তৃক অনূদিত)

হরিশচন্দ্র লর্ড ক্যানিংএর এই ঘোষণাপত্রটিকে ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তিনি ক্যানিংএর পক্ষ সমর্থন করেন। ইংরেজ সমাজ কিন্তু এই ঘোষণাপত্রে খুবই অপ্রসন্ন এবং বিরক্ত বোধ করেছিল। তারা একে সরকারের ভীরুতা এবং দুর্বলতার পরিচয় বলেও বক্র কটাক্ষে বিদ্ধ করতে লাগল। হরিশচন্দ্র ক্যানিং—এর এই ঘোষণাপত্রটিকে শুধু যে স্বাগত জানিয়েছিলেন তা নয়, এর পর থেকে ক্যানিংএর অন্যান্য কার্যাবলীকেও প্রকাশ্য সমর্থন জানাতে লাগলেন। সিপাহী বিদ্রোহ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে ক্রমাগত বিস্তারিত হতে থাকায় আতঙ্কগ্রস্ত ইংরেজ সমাজ তাদের সংবাদপত্রে সরকার ও দেশীয় লোকেদের বিরুদ্ধে নানারকম দোষারোপ করতে শুরু করে। ফলে লর্ড ক্যানিং মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সংকোচনের কথা চিন্তা করেন। এই চিন্তার ফলস্বরূপ ১৮৫৭ সালের ১৩ই জুন এক বৎসরের জন্য মুদ্রাযন্ত্রের ১৫ আইন পাশ হয়। এই আইনের ১১ টি ধারা। ১৫ আইনের প্রধান প্রধান ধারাগুলি (ক) ভারতের গবর্ণর জেনারেল অথবা প্রেসিডেন্সীর একজিকিউটিভ গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন ব্যতীত কোন মুদ্রাযন্ত্র, টাইপ বা এই ধরনের উপকরণ রাখা চলবে না। এক্ষেত্রে লাইসেন্সহীন ব্যক্তিরা শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হবেন। শাস্তি অনধিক ৫000 টাকা অথবা অনধিক দু'বছর কারাদণ্ড। (খ) যাদের লাইসেন্স থাকবে না তাদের জিনিসপত্র জেলাশাসক বাজেয়াপ্ত করতে পারে। (গ) মুদ্রাযন্ত্র বা তৎসংক্রান্ত দ্রব্যাদি অধিকারে রাখতে হলে জেলাশাসকের কাছে পূর্বে লিখিত আবেদন করতে হবে এবং জেলাশাসকের কাছে শপথ গ্রহণ করতে হবে। (ঘ) গবর্ণর অথবা প্রেসিডেন্সীর একজিকিউটিভ গবর্ণমেণ্টকে জেলাশাসক এই আবেদন সুপারিশ করবেন। (ঙ) সমস্ত বই এবং পত্রপত্রিকার মুদ্রক এবং প্রকাশকের

নাম দিতে হবে, ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে এবং একটি করে কপি জেলাশাসককে দিতে হবে। আর তা না দিলে অনধিক ১০০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে অথবা অনাদায়ে ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। (চ) গভর্ণর জেনারেল অথবা প্রেসিডেন্সীর এক্‌জিকিউটিভ গভর্ণমেণ্ট যে কোন গ্রন্থ অথবা পত্র পত্রিকা বন্ধ করে দিতে পারবেন। সরকারের এ নিষেধাজ্ঞার পরেও কেউ এরকম কোন গ্রন্থ কিংবা পত্র পত্রিকা প্রকাশ করলে শাস্তি হিসাবে ৫০০০ টাকা অর্থদণ্ড অথবা অনাদায়ে দু বৎসরের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। কোন্‌ কোন্‌ শর্তে মুদ্রাযন্ত্র বা পত্র-পত্রিকাকে লাইসেন্স দেওয়া হবে তা সিসিল বিডনের ১৮৫৭ সালের ১৮ ই জুনের বিজ্ঞপ্তিটিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই বিজ্ঞপ্তিটিতে বলা হয় সরকারের সমালোচনাকারীদের কিংবা সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দা ও ঘৃণা সৃষ্টিকারীদের কোন ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। সিসিল বিডনের বিজ্ঞপ্তির দ্বিতীয় ধারাটিতে বলা হয় যে, বৃটিশ সরকারের সঙ্গে দেশীয় রাজা এবং ভূস্বামীবর্গের সম্পর্কের বিঘ্ন-কারীদেরও বরদাস্ত করা হবে না।[২] মুদ্রাযন্ত্রের এই আইনকে বলা হত "Gagging Act"। বলা বাহুল্য এই আইন পাশ হওয়ায় ইংরেজ সমাজ ক্যানিংএর উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন।

১৮৫৭ সালের মধ্যবর্তী সময় ইংরেজ সমাজ সমস্ত বাংলা দেশে মার্শাল আইন জারি করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান। মার্শাল আইন জারি হলে ইংরেজরা নিজ হস্তে বিদ্রোহীদের বিচার গ্রহণ করতে পারবেন বলে এই আইনটির পক্ষে তাঁরা ওকালতি করেন। সরকার এই প্রস্তাব অবশ্য গ্রাহ্য করেন নি। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে হরিশচন্দ্র তাঁর হিন্দু পেট্রিয়টে লিখেছিলেন, 'আমরা কখনই বিশ্বাস করি নাই যে, কলিকাতার ইংরেজদিগের কথায় গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিবেন যে বঙ্গের শাসন কর্ত্তৃত্ব বলশূন্য হইয়াছে এবং বঙ্গে অদ্য অরাজকতা বিরাজ করিতেছে। বঙ্গের লোকেরা এই বিদ্রোহবশতঃ অনেক কষ্ট সহ্য করিতেছে, বাণিজ্য বন্ধ হইয়া দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, রাজনৈতিক উন্নতির আশার পথে কণ্টক পড়িয়াছে, সামাজিক উন্নতি কিয়ৎ দিনের জন্য বন্ধ হইয়াছে—অদ্য বঙ্গবাসী পরের দোষে এই সকল কষ্ট ভোগ করিতেছে এবং এই ক্লেশের পিণ্ডান্তে পিণ্ড শেষ করিবার জন্য সাহেবরা আমাদিগকে আইন বহির্ভূত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন।"[৩]

১৮৫৭ সালের ৩১ শে জুলাই লর্ড ক্যানিং আর একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন। এই ঘোষণাপত্রটিকে কেন্দ্র করে ইংরেজ সমাজ ক্যানিংএর উপর খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন।[৪] তাঁরা এই ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হবার পর ক্যানিংকে clemency canning বা দয়াময় ক্যানিং বলে বিদ্রূপ করতে থাকেন। এই ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্রটির পূর্ণ বয়ান নিম্নে প্রদত্ত হল।[৫]

RESOLUTION OF THE GOVERNMENT OF INDIA, 31 JULY 1857

(The 'Clemency' Resolution)

I. The Governor-General of India in Council has observed with approbation the zealous exertions of the local civil authorities for the apprehension and condign punishment of the mutineers and deserters concerned in the present revolt. It was necessary, by the severe and prompt punishment of such of these criminals as found their way into the districts in our possession, where the minds of the native troops could not but be in a very unsettled state, though the men, for the most part, had abstained from open mutiny, to show that the just fate of the mutineer is death, and that the British Government was powerful to inflict the penalty. It was necessary also, by the offer of rewards for the apprehension of all deserters, to check the crime of desertion, which was becoming rife in some of these regiments, and to prevent the possible escape of men who, apparently mere deserters, had been concerned in such terrible atrocities that their apprehension and condign punishment was an imperative duty.

2. But lest measures of extreme severity should be too hastily resorted to, or carried too far his Lordship in Council thinks it right to issue detailed instructions on this subject, by which all civil officers, will be guided in the exercise of their powers in the cases of mutineers, deserters and rebels.

3. There is reason to believe that in some, even of those native regiments whose revolt has been stained by the most sanguinary atrocities, some men may have distinguished themselves from the mass by protecting an officer. In some such cases men of very guilty regiments possess certificates in their favour from officers of their regiments; but there may be

others equally deserving of clemency who are without any such ready means of clearing themselves from the presumptive evidence of their deep guilt.

4. Where the number of men guilty of what it is impossible to pardon is so great, the Government will gladly seize every opportunity of reducing the work of retribution before it, by giving a free pardon to all who can show that they have a claim to mercy on this ground, provided that they have not been guilty of any heinous crime against person or property, or aided or abetted others in the commission of any such crime.

5. It is understood that in regiments which mutinied and for the most part went over to the rebels, without murdering their officers, or committing any other sanguinary outrage, there were men who appeared to have had no heart in the revolt, though they failed in their duty as soldiers, and who have evinced their peaceable disposition, and their want of sympathy with those who are now armed in open rebellion against the Government, by dispersing to their villages when the regiment broke up, and mixing quietly with the rural population. It is desirable to treat such men with all reasonable leniency.

6. The Governor-General in Council therefore deems it necessary to lay down the following rules for the guidance of civil authorities, in exercising the powers vested in them by recent legislation for the punishment of native officers and soldiers charged with mutiny or desertion.

1st. No native officer or soldier belonging to a regiment which has not mutinied is to be punished by the civil power as a mere deserter, unless he be found or apprehended with arms in his possession. Such men, when taken before or apprehended by the civil power, are to be sent back to their regiments whenever that can be done, there to be dealt with by the military authorities. When such men cannot be sent back to their regiments immediately, they should be detained in prison pending the orders of Government, to whom a

report is to be made addressed to the Secretary to Government in the Military Department.

2d. Native officers and soldiers being mutineers or deserters, taken before or apprehended by the civil power, not found or apprehended with arms in their possession, not charged with any specific act of rebellion, and belonging to a regiment which has mutinied, but has not been guilty of the murder of its officers or of any other sanguinary crime, are to be sent to Allahabad, or to such other place as Government may hereafter order, and are there to be made over to the Commandant, to be dealt with by the military authorities. Should any difficulty arise in sending the offender to Allahabad, either by reason of its distance from the place of arrest or otherwise, the offender should be imprisoned until the orders of Government can be obtained, unless for special reasons it may be necessary to punish the offender forthwith, in which case a report will immediately afterwards be made to the Government.

3d. Every mutineer or deserter who may be taken before or apprehended by the civil authorities, and who may be found to belong to a regiment which killed any European officer, or other European, or committed any other sanguinary outrage, may be tried and punished by the civil power. If the prisoner can show that he was not present at the murder or other outrage, or, if present, that he did his utmost to prevent it, full particulars of the case should be reported to Government in the Military Department, before the sentence, whatever it be, is carried into effect. Otherwise the sentence should be crrried into effect forthwith.

4th. If it cannot be ascertained to what regiment a mutineer or deserter taken before or apprehended by the civil authorities belonged, he is to be dealt with as provided above by the 2d rule.

7. Lists showing the several regiments and detachments which have mutinied will be prepared with all practicable despatch in the Military Department, stating in each case all

known particulars of the mutiny, and acompanied by nominal rolls, with appropriate remarks opposite to the names of those native officers and men who are known to have been absent from their regiments at the time of the mutiny, and of those who, if present, are known to have taken an active part either in promoting or suppressing the mutiny, or to have simply joined, or abstained from joining it. These nominal rolls, as soon as prepared, will be printed and circulated to all civil officers and to military officers in command.

8. The Governor-General in Council is anxious to prevent measures of extreme severity being unnecessarily resorted to, or carried to excess, or applied without due discrimination, in regard to acts of rebellion committed by persons not mutineers.

9. It is unquestionably necessary, in the first attempt to restore order in a district in which the civil authority has been entirely overthrown, to administer the law with such promptitude and severity as will strike terror into the minds of the evil disposed among the people, and will induce them by the fear of death to abstain from plunder, to restore stolen property, and to return to peaceful occupations. But this object once in a great degree attained, the punishment of crimes should be regulated with discrimination.

10. The continued administration of the law in its utmost severity after the requisite impression has been made upon the rebellious and disorderly, and after order has been partially restored, would have the effect of exasperating the people, and would probably induce them to band together in large numbers for the protection of their lives, and with a view to retaliation—a result much to be deprecated. It would greatly add to the difficulties of settling the country hereafter, if a spirit of animosity against their rulers were engendered in the minds of the people, and if their feelings were embittered by the remembrance of needlss bloodshed. The civil officers in every district should endeavour, without condoning any heinous offences or making any promises of

pardon for such offences, to encourage all persons to return to their usual occupations, and punishing only such of the principal offenders as can be apprehended, to postpone as far as possible all minute inquiry into political offences untill such time as the Government are in a position to deal with them in strength after thorough investigation. It may be necessary, however, even after a district is partially restored to order, to make examples from time to time of such persons, if any, who may be guilty of serious outrages against person or property, or who by stopping the dawk. or injuring the electrict telegraph or otherwise, may endeavour to promote the designs of those who are waging war against the State.

11. Another point to be noticed in connexion with this subject is the general burning of villages, which the Governor-General in Council has reason to fear may have been carried too far by some of the civil officers employed in restoring order.

12. A severe measure of this sort is doubtless necessary, as an example, in some cases -where the mass of the inhabitants of a village have committed a grave outrage, and the perpetrators cannot be punished in their persons ; but any approach to a wholesale destruction of property by the officers of Government, without due regard to the guilt or innocence of those who are affected by it, must be strongly reprehended. Apart from the effect which such a practice would have upon the feelings and disposition of the country people, there can be no doubt that it would prevent them from returning to their villages, and resuming the cultivation of their fields, a point at this season of vital importance, inasmuch as if the lands remain much longer unsown, distress, and even famine, may be added to the other difficulties with which the Government will have to contend.

Ordered, That instructions to the above effect be issued to the Governments of Bengal and the North- Western Provinces, and to the Commissioners of the Allahabad and Benares Divisions.

Ordered, also, That a copy of this Resolution be sent to the Foreign and Military Departments for such further orders as may be necessary.

(signed) C. Beadon.

Secretary to the Government of India.

হরিশচন্দ্র এই ঘোষণাপত্রকে সমর্থন করে হিন্দু পেট্রিয়টে লিখলেন—"বিদ্রোহ দমন অভিপ্রায়ে প্রতিহিংসার কার্য যে অযথা রূপে নির্বাহ হইয়াছে এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। সভ্য গভর্ণমেণ্টের রাজকর্মচারীগণেরা যে এইরূপ অবৈধ উপায়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবেন ইহা আমরা মনে করি নাই। কেবল আলাহাবাদ নগরে ৬ ই জুন হইতে ১৬ ই জুলাই পর্যন্ত ৮০০ লোকের ফাঁসি হইয়াছে। একজন শীক সৈন্য হত হওয়াতে ঐ নগরের লোকদিগের উপর অত্যাচার মানসে শীক সৈন্যদিগকে আলি হুকুম দেওয়া হইয়াছিল। কাশী হইতে আলাহাবাদ পর্যন্ত যতদূর ব্রেগেডিয়ার নীল সাহেব গমন করিয়াছেন, সেই স্থানে রাশি রাশি শবদেহ, বিশিষ্ট গ্রামসকলে লক্ষিত হইয়াছিল। ঐ সকল গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে কিছুমাত্র বাধা দেয় নাই। সৈন্যগণ যে সকল অত্যাচার করিয়াছিল তাহার কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। সৈন্যদিগকে রীতিমত বসে ও শাসনে রাখিলে ঐরূপ হইতে পারিত না।"[৬]

ক্যানিংএর ঘোষণাপত্র ভারতবর্ষীয় ইংরেজদের অত্যন্ত অসহিষ্ণু এবং বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ইংরেজরা তখন 'ইণ্ডিয়ান রিফরম লিগ' নামে একটি সভা খাড়া করে লর্ড ক্যানিংকে ভারতবর্ষ থেকে অপমানের সঙ্গে তাড়িয়ে দেবার জন্য বিলাতে আবেদন করেছিলেন। এই আবেদনপত্রে ২৫৩ জন ইংরেজের স্বাক্ষর ছিল। ক্যানিং এই আবেদন পত্রের উপর নিজস্ব মন্তব্য লিখে বিলাতে পাঠিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে ইংলণ্ডের রাণীকে যে পত্রটি ক্যানিং লিখেছিলেন তা নিম্নে উদ্ধৃত হচ্ছে।[৭]

One of the greatest difficulties which lie ahead, and Lord Canning grieves to say so to Your Majesty, will be the violent rancour of a very large proportion of the English Commnunity against every native Indian of every class. There is a rabid and indiscriminate vindictiveness abroad, even amongst many who ought to set a better example, which it is impossible to contemplate without something like a feeling of shame for one's fellow-countrymen. Not one man in ten seems to think that the hanging and shooting of 40, or 50,000 Mutineers besides other rebels, can be otherwise than practicable and right; nor does it occur to those who talk and write most upon the matter that for the

Sovereign of England to hold and govern India without employing, and, to a great degree, trusting Natives, both in Civil and Military service, is simply impossible. It is no exaggeration to say that a vast number of the European Community would hear with plesure and approval that every Hindoo and Mahomedan had been proscribed, and that none would be admitted to serve the Government except in a menial capacity. That which they desire is to see a broad line of separtion, and of declared distrust, between us Englishmen and every subject of Your Majesty who is not a Christian and who has a dark skin, and there are some who entirely refuse to believe in the fidelity or good will of any Native towards any European, although many instances of the kindness and generosity of both Hindoos and Mahomedans have come upon record during these troubles.

To those whose hearts have been torn by the foul barbarities inflicted upon those dear to them, every degree of bitterness against the Natives may be excused. No man will dare to judge them for it. But the cry is raised loudest by those who have been sitiug quietly in their homes since the beginning, and have suffered little from the convulsions around them, unless it be in pocket. It is to be feared that this feeling of exasperation will be a great impediment in the way of restoring tranquillity and good order, even after signal retribution shall have been deliberately measured out to all chief offenders.

Lord Canning feels ashamed of having trespassed on Your Majesty's indulgence at such length....

প্রত্যুত্তরে রাণী লিখলেন :

The Queen has to thank Lord Canning for a most interesting letter of the 25 Sept : which she recd. by the last mail when she was not yet aware of the fall of Delhi. This important event was learnt at the same time tho' without any details.... Lord Canning will easily believe how entirely the Queen shares his feelings of sorrow & indignation at the

unchristian spirit shown—alas! also to a great extent here —by the public towards Indians in general & towards Sepoys without discrimination! It is however not likely to last and comes from the horror produced by the unspeakable atrocities perpetrated against the innocent women & children which really makes one's blood run cold. For the perpetrators of these awful horrors no punishment can be severe enough &, sad as it is, stern justice must be dealt out to all the guilty ones.

But to the native at large, to the peaceable inhabitants, to the many kind & friendly ones who have assisted us, sheltered the fugitives & been faithful and true—these should be shown the greatest kindness—They should know that there is no hatred to a brown skin....Lord Canning will not mind the abusive articles in the press & recollects how harmless they are to those who have done their duty & their only desire is to produce annoyance & mortification, from some miserable private motive. It is the Prince of Wales's 16th birthday today.

ইংরেজদের এই আবেদনপত্রে বিদ্রোহজনিত দুর্যোগের জন্য সরকারের দুর্বলতা, অযোগ্যতা, বিচ্যুতি প্রভৃতিকে দায়ী করা হয়। কিন্তু বিলাতের কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্রটিকে গ্রাহ্য করেন নি। ১৮৫৭ সালের ৯ই নভেম্বর ক্যানিং-কে লেখা রাণী ভিক্টোরিয়ার চিঠিটিতে তার প্রতিফলন দেখা যায়। আসলে ক্যানিং চতুর রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ দমনপীড়ন ও প্রকাশ্য নির্দয়তার পথে অগ্রসর হতে চান নি। দেশীয়দের অন্তর্গূঢ় বিক্ষোভের প্রকৃতি-টি হয়ত তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন তাই শান্ত পদবিক্ষেপে ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনকে ক্যানিং দৃঢ়মূল করারই পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর দয়াশীলতার আবরণটি বাংলাদেশে যে ফলপ্রসূ হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। আমাদের মনে হয় হরিশচন্দ্র ক্যানিংয়ের তথা সাম্রাজ্যবাদের চাতুর্যের আবরণটি ভেদ করতে পারেন নি।

রামগোপাল স্যান্যাল লিখেছেন—"লর্ড ক্যানিং হরিশের সহায়তা পাইয়া যে এই ভীষণ সময়ে ধর্মভাবে দয়াদাক্ষিণ্যের সহিত বিদ্রোহ দমন করিতে পারিয়াছিলেন তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি প্রতি বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে উঠিয়া হিন্দু পেট্রিয়ট পাঠ করিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইতেন। কাগজ আসিতে দেরি হইলে সময়ে সময়ে নিজ লোক প্রেরণ করিয়া উহা আনাইয়া লইতেন।

"পার্লামেণ্ট সভায় যখন এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক হয় তখন লর্ড

প্রাণবিল হরিশের লিখিত অস্তাবসকল পাঠ করিয়া লর্ড ক্যানিংএর রাজনীতি সমর্থন করেন।"[৮]

শিবনাথ শাস্ত্রীও লিখেছেন -"পেট্রিয়ট সারগর্ভ সুযুক্তিপূর্ণ তেজস্বিনী ভাষাতে কর্তৃপক্ষের মনে এই সংস্কার দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিবার প্রয়াস পাইলেন যে, প্রজাকুল ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুরক্ত এবং তাহাদের রাজভক্তি অটুট রহিয়াছে। পেট্রিয়ট এইসময় এদেশীয়গণের অদ্বিতীয় মুখপাত্র হইয়া উঠিল। রাজপুরুষগণের নিকট ইহার আদর বাড়িয়া গেল। এরূপ শুনিয়াছি পেট্রিয়ট বাহির হইবার দিন লর্ড ক্যানিংএর ভৃত্য আসিয়া পেট্রিয়ট আফিসে বসিয়া থাকিত, প্রথম কয়েকখানি কাগজ মুদ্রিত হইলেই লইয়া যাইত।"[৯]

ক্যানিং-এর সঙ্গে এই পরোক্ষ যোগসূত্রের জন্য একালের কোন কোন ঈতিহাসবিদ হরিশকে 'Canningite' আখ্যা দিয়েছেন। এই আখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন থাকলেও একথা অবশ্য স্বীকার করে নিতে দ্বিধা নেই যে 'দয়াময় ক্যানিং'-এর ভাবমূর্তি হরিশ অনেকটা অচেতনভাবেই উজ্জ্বল করেছিলেন—"In 1857-58 he filled the columns of H. P spinning the myth of 'clemency canning."[১০]

টীকা

১—এক্ষণ, পৌষ-মাঘ, ১৩৭৭, পৃ. ১৭।

"১৮৫৮ সালে কোম্পানীর হাত থেকে শাসন ক্ষমতাটুকু কেড়ে নেওয়া হয়। পার্লামেন্টে গৃহীত নতুন আইনের ফলে কোম্পানীর 'কোর্ট অব ডাইরেক্টরস' —এর স্থান গ্রহণ করে 'কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া', 'সেক্রেটারী অব স্টেট' বা ভারত বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত একজন মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয় (স্যার চার্লস উড প্রথম ভারত সচিব হন), ভারতের গবর্ণর জেনারেলের অন্য নাম হয় 'ভাইসরয় অব ইণ্ডিয়া'—লর্ড ক্যানিং (১৮৫৬—৬২) এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।" নীল বিদ্রোহের চরিত্র ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী। তপোবিজয় ঘোষ, অনুষ্টুপ ষোড়শ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা,১৩৮৯, পৃ. ৫৭।

২. **The Indian Press.**

Margarita Barns.

রামগোপাল তাঁর হরিশজীবনীতে লিখেছেন—"অগত্যা গবর্ণমেণ্ট ১৮৫৭ সালের ১৩ই জুন এক বৎসরের জন্য মুদ্রাযন্ত্রের ১৫ আইন প.শ করিলেন। এই আইনে ইংরাজ ও দেশীয় সংবাদপত্রের সমভাবে স্বাধীনতা খর্ব করা হইল। ইংরাজরা এই কারণে লাট ক্যানিং এর উপর অসন্তুষ্ট হইলেন। ইহার পরেই ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া নামক পত্রিকায় পলাশী-যুদ্ধের শতবার্ষিক সমাপ্তি' নামক এক প্রবন্ধ বাহির হইল। ইহাতে দেশীয়দিগের উপর বিদ্বেষভাব প্রকাশ করা হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট ঐ কাগজের সত্ত্বাধিকারীকে এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দিয়া পুনর্বার এরূপ মনান্তরসূচক প্রবন্ধ না লেখা হয়, তাহার জন্য অঙ্গীকার করাইয়া লইলেন। লিখিত আছে যে, এই প্রবন্ধের লেখক মিঃ হের্নরি মিড ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদকতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" এক্ষণ. পৃ. ১৯

৩. এক্ষণ, ঐ, পৃ. ১৯-২০

৪. রামগোপাল সান্যাল এ সম্পর্কে হরিশ জীবনী লিখেছেন:

"১৮৫৭ সালের ৩১ জুলাই গবর্ণর জেনারল আর একখানি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন। বিদ্রোহ ও অন্যান্য লোকদিগের প্রতি অযথা কঠোর নিয়ম প্রয়োগ না করা হয় তাহার জন্য রাজ কর্মচারীদিগেকে অনুরোধ করেন। এই ঘোষণাপত্র বাহির হইলে, ইংরাজগণ লাট ক্যানিংকে (Clemency) অর্থাৎ "দয়াশীল" ক্যানিং বলিয়া বিদ্রূপ করেন। এ দেশীয় অপরাধী ব্যক্তি মাত্রের প্রতি ইংরাজগণ খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন সুতরাং এই ঘোষণা পত্রে তাঁহারা মর্মাহত হইয়

ছিলেন। হরিশ এই সঙ্কট সময়ে উক্ত ঘোষণা পত্রের সমর্থন করেন।

এই সকল অত্যাচার নিবারণ এই ঘোষণাপত্রের উদ্দেশ্য ছিল। ইহার স্থূল মর্ম্ম নিম্নে প্রকটিত করা গেল।

রাজবিদ্রোহ কিয়ৎ পরিমাণে দমন হইয়া শান্তি পুনঃ সংস্থানের পর রাজদ্রোহীদিগের প্রতি কঠোর নিয়মে দণ্ডবিধির আইন সকল চালনা করিলে লোক সকল হয়ত নিরুপায় হইয়া দলবদ্ধ এবং রাগান্বিত হইয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে। এরূপ ফল উৎপন্ন হইলে রাজ্যের কুশল সংস্থাপন করা অতীব কঠিন হইবে। রাজবিদ্বেষও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে। অতএব এইরূপ যাহাতে না হইতে পারে তজ্জন্য রাজকর্মচারীদিগকে লাটসাহেব অনুরোধ করেন যে তাঁহারা ক্ষমা ও দয়ার সহিত সাবধানে যেন আইন চালনা করেন। গ্রাম ও নগর সকল দগ্ধ করা নিষেধ করা হইয়াছিল। সিপাহী সৈন্য ইংরাজ রেজিমেন্ট পরিত্যাগ অপরাধে দণ্ডিত হওয়াও নিষেধ করা হইয়াছিল।

হরিশ এই ঘোষণাপত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া লর্ড ক্যানিংয়ের সমর্থন করিয়া ছিলেন।"
প্রকাশ, ঐ, পৃঃ ১১

৫, Michae maclagan—এর Clemency canning গ্রন্থ থেকে, P. 324-327.

প্রসঙ্গত গ্রানভিলকে লেখা ক্যানিং—এর তাৎপর্য পূর্ণ একটি পত্র উল্লিখিত হচ্ছে:

"I send you a heap of material—chiefly newspaper stories—and the truth, in parallel columns, also a conclusive (I hope) defence of the 'Clemency Orders' in an official despatch, but I had more to say on that head which would not come into a despatch—if there were time. I have also sent two addresses presented to me only yesterday from Hindoo Rajahs, Zemindars and merchants of Bengal, Behar, and Orissa. The one (the shortest) signed by five thousand persons, and at the head of them all the men of best family and of highest influence among the Hindoos in Calcutta and for hundreds of miles round. The other is not yet signed in full. I am to have it next week. It is a less antagonistic production (The first, I fear, will do mischief, and increase the irritation amongst the European malcontents, but I knew nothing of it until a few days before it came), having been drawn up by some who did not like the tone of the first for the above reason. At the head of them, i. e. signers of the long one, is the Rajah of Burdwan, a sort of mid-landcounty coal owner of Bengal, and about the richest. He paid half a million of land revenue to the state annually. In fact, the subscribers of the two papers do comprise, I really believe, all who have the deepest stake in the prosperity and peace of the presidency and in the permanency of British rule

I could write a chapter in deprecation of anything being done or said in Parliament by the Government which shall tend to throw cold water upon the policy that has been pursued towards the natives. Look at a map (never think of Indian matters without looking at a map, and without bringing your mind to take in the scale of the map and size of this country). Look at map. With the all reinforcements you have sent (all the Bengal ones are arrrived except a hundred men), Bengal is without a single European soldier more than we had at the beginning of the mutinies, Calcutta alone excepted, which is stronger. Twenty three thousand men have moved through Bengal, and in Bengal we are still dependent (mainly) upon the

goodwill (I cannot say affection) and interests (well understood by themselves) of the natives. Suppose (not an inpossibility, although I hope not a likelihood), suppose that hostifities train on, and that we do not make our awy with Oudo, and other disturbed places—that our strength becomes again a subject of doubt—will it not be the part of a wise Government to keep such a population as that of the three great Lower Provinces in a loyal frame of temper ? Can you do so if you proscribe and scout *untrustworthy* whole classes ? Look at the short address, and see how the conduct and the conduct and the language of the Europeans have rankled in the hearts of men who (I speak of some score of the principal subscribers) have nothing whatever to fear or lose from being abused or thought unworthy of office and trust—Who are thoroughly independent, and could buy a Staffordshire coal owner out of house and home ? Is it not clear that we are making enemies of men not on account of personal and small grievances, but on account of broad national insult ?

৬. এক্ষণ, ঐ,

৭. Clemency canning গ্রন্থ পৃ, 110-2

৮. এক্ষণ, ঐ পৃ ২০

৯. শিবনাথ শাস্ত্রীর রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, পৃঃ ২১৮

১১. Hurish Mukherjea and the Mutiny of 1857. Benoy Ghosh. Frontier' 14.7.'79

১১.. ঐ, পৃ. 11

নবম অধ্যায়

সিপাহীবিদ্রোহ, ক্ষমতার হস্তান্তর ও হরিশচন্দ্র

১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল। এই একশ বছরের ব্যবধানে লুণ্ঠনে এবং শোষণে বৃটিশ শক্তি ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। ১৮৫৩ সালে কার্ল মার্কস ভারতে বৃটিশ শাসনের ধ্বংসাত্মক রূপটি নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করেছেন—"হিন্দুস্থানে ক্রমাগতভাবে যে সকল গৃহযুদ্ধ, বৈদেশিক আক্রমণ, বিপ্লব, রাজ্যজয়, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি ঘটেছে তা যতই জটিলতাপূর্ণ, অদ্ভুত, আকস্মিক এবং ধ্বংসাত্মক বলে মনে হোক না কেন এদের প্রভাব কখনও দেশের গভীরে প্রবেশ করে নি। কিন্তু ইংলণ্ড ভারতীয় সমাজের কাঠামোটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে। ইংরেজ শক্তি ভারতের তাঁত ভেঙে ফেলে, সুতাকাটার চরকাটি পর্যন্ত ধ্বংস করে ফেলে। বৃটিশ বাষ্প ও বিজ্ঞান সমগ্র হিন্দুস্থানের বুকের উপর কৃষি ও গ্রামীণ শিল্পের অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধের মূল পর্যন্ত উৎপাটিত করে দেয়।"[১] ভারতে বৃটিশ শাসনের ধ্বংসাত্মক ভূমিকাটিকে মার্কস দুভাগে ভাগ করে দেখেছেন। প্রথমে তিনি বিচার করেছেন বৃটিশ বণিক পুঁজির শোষণের ধারাটিকে এবং অতঃপর তিনি বিচার করেছেন বৃটিশ শিল্প পুঁজির শোষণের ধারাটিকে। বণিক পুঁজির শোষণের যুগে কোম্পানীর প্রত্যক্ষ লুণ্ঠন, জমিদারী প্রথার প্রবর্তন, ভারতের পণ্য ইংলণ্ডে রপ্তানি বন্ধ করার জন্য শুল্ক প্রবর্তন এবং কোম্পানীর প্রত্যক্ষ লুণ্ঠন ইত্যাদির বিশ্লেষণ করেছেন মার্কস। বণিক পুঁজির পর ইংলণ্ডের শিল্পপুঁজি ভারতীয় অর্থনীতিকে আরো গভীরভাবে বিপর্যস্ত করে। শিল্পপ্রধান দেশ থেকে ভারতকে কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করা হয়। এছাড়া শিল্পপ্রধান শহরগুলির ধ্বংস সাধন, কৃষির উপর নিদারুণ চাপ সৃষ্টি এবং নির্দয়ভাবে কৃষকের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করে। মার্কসের মতে ইংরেজ এদেশে ইতিহাসের অচেতন হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে বটে কিন্তু তার জন্য ভারতকে অজস্র মূল্য দিতে হয়।[২] ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত এই দীর্ঘ একশ বছরের ইতিহাস আসলে ধ্বংস এবং লুণ্ঠনের ইতিহাস।

পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ইংরেজ শাসনের প্রথম তিরিশ বছরের মধ্যেই বাংলাদেশে ভূমি রাজস্বখাতে আদায় বেড়ে গিয়েছিল চারগুণেরও বেশি। ১৭৬৪-৬৫ সালে রাজস্ব ছিল ৯০ লক্ষ টাকার কিছু কম, ১৭৬৬-৬৭ সালে রাজস্ব হল ১৪৭ লক্ষ টাকা, ১৭৭১-৭২ সালে রাজস্ব দাঁড়াল ২৩৫ লক্ষ টাকায়, ১৭৯৩ সালে কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তন করার সময় বাংলার রাজস্ব ধার্য করলেন ৩৪০ লক্ষ টাকা। বৃটিশ শক্তি ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে চরমতম

বিপর্যয় আহবান করে আনল। ১৮১৫ সালে ভারত থেকে ইউরোপে ১৩০ লক্ষ টাকার বস্ত্র রপ্তানি হয়েছিল। ১৮৩২ সালে এই রপ্তানি কমে গিয়ে দাঁড়াল মাত্র ১০ লক্ষ টাকায়। অন্যদিকে কিন্তু ইংলণ্ড থেকে ভারতে বস্ত্র রপ্তানির পরিমাণ দ্রুতগতিতে বাড়তে লাগল। যে ভারতবর্ষ একদা আপন চাহিদা পূর্ণ করে বছরে দেড় কোটি টাকার বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি করত, ১৮৫০ সালের মধ্যে তাকে সম্পূর্ণভাবে ইংলণ্ডের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হল। কেবলমাত্র বস্ত্রশিল্প নয়, রেশম-পশম, লোহা-কাচ, কাগজ ধাতু ইত্যাদি শিল্পগুলিও ইংরেজ ধ্বংস করে দেয়। ঢাকার মত মুর্শিদাবাদ, সুরাট, কালিকট প্রভৃতি শিল্পপ্রধান শহরগুলিও ধ্বংস হয়ে যায়। কোম্পানীর লুণ্ঠন ছাড়াও কোম্পানীর ছোট-বড় কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ লুণ্ঠনও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। একজন সাধারণ ইংরেজ কর্মচারীও ১৫-২০ বৎসর ভারতবর্ষে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাজ করে অনায়াসে ৩ লক্ষাধিক টাকার মালিক হয়ে ইংলণ্ডে ফিরে যেতে পারতেন।[৩] ইংরেজ ঐতিহাসিক টমাস লো ভারতবর্ষে ইংরেজের ধ্বংসকার্যের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য।—"স্পষ্টই দেখা যায়, এই দেশের ধনসম্পদের বিকাশ ও বৃদ্ধির চেষ্টার পরিবর্তে এক সহস্র বৎসরের পূর্বের ন্যায় তাহা অবহেলিত অবস্থাতেই ফেলিয়া রাখিয়া ধ্বংস হইতে দেওয়া হইয়াছিল। যে দেশীয় শিল্পের জন্য ভারতের নাম পশ্চিম জগতে সম্ভ্রম ও বিস্ময় উৎপাদন করিত, তাহা এখন অবলুপ্তির পথে। এক সময়ের সুবিখ্যাত ও বিপুলায়তন নগরগুলি এখন ধ্বংস স্তূপ মাত্র. সেই সকল স্থান এখন হায়েনা ও খেঁকশিয়ালের আবাসস্থলে পরিণত; ভারতের সেই সুবিখ্যাত বিদ্যাপীঠগুলি আর নাই প্রাচ্যের সেই সুধী ব্যক্তিদের নাম এখন কেবল রূপকথা আর ইতিহাসের বিষয়বস্তু। ভারতের মন্দিরসমূহ, অজন্তা ও ইলোরার বিস্ময়কর গুহামন্দির ও অন্যান্য স্থানগুলি দ্রুত ধূলায় পর্যবসিত হইতেছে। অসংখ্য পুষ্করিণী ও সরাইখানা ধ্বংস হইতেছে। সেচ কার্যের খালগুলি ভরাট হইয়া বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিয়া যাইতেছে। অসংখ্য জেলা জনমানবহীন, জঙ্গলাকীর্ণ ও বন্য জন্তুর আবাসস্থলে পরিণত, ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়ার আক্রমণে বাসের অযোগ্য। ধ্বংস—ধ্বংস—ধ্বংস। সর্বত্র ধ্বংস আর দারিদ্র্য। সমস্ত দেশ যেন কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত। অনিবার্য ধ্বংসের দিকে দ্রুত ধাবমান। যাহার চক্ষু কর্ণ আছে, সে এক মুহূর্তের জন্যও সন্দেহ করিবে না যে, আমরা এই বিশাল দেশের ধনসম্পদ সম্পূর্ণ অবহেলিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়াছি, আর আমাদের দেশের শহরগুলিতে উৎপন্ন নিকৃষ্ট দ্রব্য সম্ভার দ্বারা ভারতের সকল কোণ ভরিয়া দিয়াছি। মনে হয়, আমরা যেন এই প্রাচ্যদেশে উৎপন্ন সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার ধ্বংস করিয়া ফেলিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি।"[৪]

কোম্পানীর শাসনে বাংলার কৃষকদেরও নাভিশ্বাস উঠতে থাকে। কুটিরশিল্প এবং কৃষির সমন্বয়ে বাংলাদেশের গ্রাম সমাজের যে মূল কাঠামোটি এতদিন অব্যাহত ছিল বৃটিশ শাসন তার সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন করে। ১৭৯৩ সালে

কর্ণওয়ালিশ যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন তার ফলে কৃষকরা চরম দুর্দশার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। বস্তুতপক্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল দেশের জমিদারদেরই রক্ষাকবচ। এই বন্দোবস্ত অনুসারে জমির মালিক হল জমিদাররাই। রাষ্ট্রকে দেয় নির্দিষ্ট খাজনার পরিবর্তে জমিতে জমিদারদের মালিকানা সাব্যস্ত হয়। ফলে জমিদারেরা রাষ্ট্রের দেয় অংশ বাদ দিয়ে যে পরিমাণ খাজনা আদায় করত তার সবটুকুই তারা ব্যক্তিগত আয় হিসেবে আত্মসাৎ করার অধিকার লাভ করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রের আইন এবং ক্ষমতাও প্রযুক্ত হতে থাকে। ১৭৯৭ সালে লর্ড ওয়েলেসলি প্রবর্তিত সপ্তম আইনে প্রজার উপর জমিদারদের জুলুম করবার অধিকার প্রদান করা হয়। ১৮১২ সালের পঞ্চম আইনে জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজার মামলা করা দণ্ডনীয় বলে ঘোষিত হয়। ১৮১৯ সালের নতুন আইনে জমিদারদের নিজ জমিদারীর অধস্তন পত্তনিদার, দরপত্তনিদারদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়। জমিদার, পত্তনিদার দরপত্তনিদার ইত্যাদি প্রত্যেকটি স্তরের স্বত্বাধিকারীরা প্রজাদের উপর আইনী এবং বে-আইনী দ্বিবিধ শোষণই চালিয়ে যেতে থাকে।[৭] বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে জমিদার কর্তৃক প্রজা শোষণের মর্মন্তুদচিত্র অংকন করেছেন। ১৮৫৭ সালের পূর্বে লুণ্ঠিত, বঞ্চিত, কৃষকরা নানাস্থানে বিদ্রোহ করেছিল। ১৭৮৫ সালে মুর্শিদাবাদে, ১৭৭০ সালে বাঁকুড়ায় কৃষকরা বিদ্রোহ করেছিল। ১৭৯৯ সালে মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়া জেলার কয়েকটি অঞ্চলে ঘটেছিল চোয়ার বিদ্রোহ। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহ চোয়ার বিদ্রোহের চেয়েও ব্যাপক আকার গ্রহণ করে। ১৮৩২ সালে মানভূমিতে গঙ্গানারায়ণের নেতৃত্বে চোয়াড়েরা পুনরায় বিদ্রোহ করে। গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামার সমকালীন সময়ে ময়মনসিংহ জেলার শেরপুর অঞ্চলে কৃষকরা যে বিদ্রোহ করে তা পাগলাপন্থীদের বিদ্রোহ নামে খ্যাত। ১৮৩১ সালে বারাসতের উপকণ্ঠে তিতুমীরের বিদ্রোহ এই সময়কার আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষ দিকে ফরিদপুরে গড়ে উঠেছিল ফরাজী আন্দোলন। ১৮৫৫ সালে বর্তমান বীরভূম জেলার কোন কোন অঞ্চল, ভাগলপুর জেলাস্থিত অঞ্চল এবং মুর্শিদাবাদের একাংশ জুড়ে সাঁওতাল বিদ্রোহের সূচনা হয়। তবে এই সমস্ত বিদ্রোহগুলি সমগ্র দেশব্যাপী ব্যাপ্ত হয়ে সংগঠিত আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করতে পারে নি। তথাপি ইতিহাসের গতিধারায় এদের প্রভাব অনস্বীকার্য। একদিকে বৃটিশ রাজশক্তির ভয়াবহ নির্মম শোষণ ও লুণ্ঠন এবং অন্যদিকে পূর্ববর্তী এইসব স্থানিক বিদ্রোহ—এই ছিল সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমি।

সিপাহী বিদ্রোহের পেছনে শুধু ইংরেজের ধ্বংস ও লুণ্ঠন নয়, অন্যবিধ কারণও বিদ্যমান ছিল, ছিল ধর্মীয় ও জাতিগত কারণ। শশিভূষণ চৌধুরী লিখেছেন, "The most immediate factor working out this change was the religious element which actuated the masses to

sacrifice their lives. The many references to the jehads and the cry of religion in danger which was echoed and reechoed in the 'Seditious' Proclamations of the period entered into the composition of the upsurge. The extreme ferocity of the mutineers at Meerut and in other places may be explained by the belief of the rebels that they were waging a religious war. The insurgents sacked the convents and slaughtered the missionaries, just as if they were Anglicans. Mrg. Persico, apostolic vicar of Agra, related that in his vicariat alone the rebels had destroyed a magnificent cathedral, twenty-five churches, two colleges, two asylums and five nunneries. Madness produced by fanaticism often outweighed all other feelings."[৮] এই ধর্মীয় মনোভাবের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছিল জাতিগত কারণ। ইংরেজ রাজত্বে মর্যাদা তো দূরের কথা ভারতবাসীর অপমান লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। ১৮২৮ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জের একটি রচনাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। হার্ডিঞ্জ লিখেছিলেন যে, ভারতীয়দের অবিশ্বাসযোগ্য, অসৎ এবং রাজকার্যে অনুপযুক্ত বলে ইংরেজদের মত আর কেউই মনে করে নি, বিদেশী বিজেতারা পরাজিত ভারতবাসীর উপর যে নির্দয় এবং হিংসাত্মক ব্যবহার করেছে তার কোন তুলনাই নেই। জীবিকার ক্ষেত্রে ভারতবাসীদের বিশ্বস্ত এবং বড় বড় চাকুরী থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হত। মাদ্রাজের গভর্নর স্যার টমাস মুনরো একদা লিখেছিলেন যে, ইংরেজ না থাকলে যেসব ভারতবাসী ভারতীয় রাজত্বে প্রথম স্থানগুলি সম্মানের সঙ্গে অধিকার করতে পারতেন, ইংরেজ তাঁদের ভৃত্যের মত মনে করেছে। ভারতীয় সিপাহীদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে টমাস মুনরো লিখেছিলেন যে, একজন ভারতীয় সুবাদারের চাইতে বড় অফিসার হবার আশা করতে পারে না। একজন সুবাদারের উচ্চতম বেতন যেখানে ছিল মাসিক ১৭৪ টাকা, সেখানে একজন অতি নিম্নশ্রেণীর ইংরেজ সৈন্যের মাইনাও ছিল প্রায় ততখানি। জাতিগত এই অপমানের সঙ্গে সঙ্গে ছিল ভারতীয়দের ধর্মান্তরিকরণের ভীতি। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের কিছু পূর্বে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান কর্মকর্তা ম্যাংগলস্ ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে বলেছিলেন যে, সমস্ত ভারতবাসীকে খ্রীস্টধর্মাবলম্বী করে তোলাই হবে তাদের মহৎ কাজ। সঙ্গত কারণেই প্রমোদ সেনগুপ্ত প্রশ্ন তুলেছেন—খ্রীস্টান ধর্মের প্রতি একান্ত অনুরক্তি বশেই কি ইংরেজ শাসকেরা ভারতীয়দের খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত করবার জন্য এতখানি আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিলেন? তা মোটেই নয়। ইংরেজের এই ধর্মপ্রচারের প্রচেষ্টার প্রধান কারণ ছিল রাজনীতিক, ধর্মনৈতিক নয়। তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পেয়েছিলেন, যে সব ভারতীয় খ্রীস্টানধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা নিজেদের দেশীয় সত্তা হারিয়ে বিজাতীয় মনোভাবাপন্ন হয়ে ইংরেজের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। আজও জনসাধারণকে রাজার ধর্মে

দীক্ষিত করে তাদের চিরকালের জন্য ইংরেজবাজের অনুগত গোষ্ঠীতে পরিণত করাই ছিলএই খ্রীস্টধর্ম প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য।"[৭]

সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমি হিসাবে লর্ড ডালহৌসির স্বত্ববিলোপ নীতিরও ভূমিকা কম ছিল না। এই নীতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করে একজন ঐতিহাসিক বলেছেন যে, স্বত্ববিলোপনীতি "was the principle that in dependent Indian states or in those which owed their existence to the British power the Sovereignty passed back to the supreme power, that is to say, to the Indo British Government, if and when such a state lacked a natural heir and no right of adoption was to be recognised. In other words, according to this principle, an adopted of his adoptive father but not be Sovereignty over his state."[৮] ডালহৌসির এই স্বত্ববিলোপ নীতির ফলে নাগপুর, সাতারা, সম্বলপুর, জৈৎপুর ও ঝাঁসি বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। কুশাসনের অজুহাতে ডালহৌসী দখল করে নেন অযোধ্যা রাজ্য। এইভাবেই ডালহৌসী ভারতীয় রাজা এবং সামন্ত প্রভুদের মনে আতঙ্ক এবং ক্ষোভ জাগিয়ে তোলেন। ফলে আমরা দেখতে পাই সিপাহী বিদ্রোহের সময় দেশীয় নৃপতিবর্গের একটা বড় অংশ ইংরেজদের বিপক্ষে চলে যায়। সিপাহী বিদ্রোহের ক্ষেত্রে এই সমস্ত পরোক্ষ কারণগুলির সাথে চর্বিমিশ্রিত টোটা ব্যবহারের প্রত্যক্ষ কারণটি যুক্ত হয়ে বিদ্রোহকে ব্যাপক এবং ত্বরান্বিত করেছিল।

ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের গণচরিত্রকে স্বীকার করে নেন নি। অধিকাংশ ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মতে সিপাহী বিদ্রোহ ছিল একটা সামরিক বিদ্রোহ মাত্র। উইলিয়াম মুর এই মতের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা। তিনি বলেছিলেন যে, এই বিদ্রোহ মূলত সরকার ও সৈন্যদলের মধ্যে সংঘর্ষ। জনসাধারণের সঙ্গে সরকারের কোন সংঘর্ষের কথা তিনি স্বীকার করতে চান নি। তাঁর মতে জনসাধারণ অধিকাংশ স্থলে বৃটিশ শাসন ও কর্মধারাকে স্বাগত জানিয়েছিল। কিছু কিছু ইংরেজ ঐতিহাসিক ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে ভারতীয় সমাজের অসন্তুষ্ট, অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত মানুষের কাণ্ডকারখানা বলে ব্যক্ত করেছেন। আশ্চর্যের কথা, একজন ভারতীয়, সৈয়দ আমির খানও এই মতকে সমর্থন করে বলেছেন যে, সিপাহী বিদ্রোহের নেতারা ছিল ডাকাতদলের সর্দার। কিন্তু কে, ম্যালেশন, ফরেস্ট প্রভৃতি ইংরেজ ঐতিহাসিকেরাও এ মতকে স্বীকার করে নিতে পারেন নি। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে '৫৭ সালের বিদ্রোহ ভারতব্যাপী ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ডঃ মজুমদার ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের মধ্যে জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের চিহ্ন দেখতে পান নি।

সিপাহী বিদ্রোহের গণচরিত্রের দিকটি ঐতিহাসিক শশিভূষণ চৌধুরী বহু প্রমাণের দ্বারা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি লিখেছেন ১৮৫৭ সালের পূর্ববর্তীকালে বৃটিশ শাসন এবং শোষণে ভারতবর্ষের জনমানসে যে ক্রোধ এবং

ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ তারই পরিণতি। ডঃ চৌধুরী লিখেছেন—"In the Pre-mutiny period there had not been much combination between the different disaffected elements of the country, the military, aristocracy, priesthood, and commonalty. The sepoy munities and the civil commotions had run on two parallel lines It was the revolt of 1857 which brought about a link-up all these elements, on a massive scale with a formidable challenge to the alien rule. As such, the 1857 upsurge was undoubtedly national unless we restrict the term unduly." এবং "Thus old feudal instincts and the anti-alien patriotism became mixed up in 1857 in a curious proeess."[৯]

শশিভূষণ চৌধুরী তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে বলেছেন যে, একদিক থেকে সিপাহী বিদ্রোহ ছিল মূলতঃ তালুকদারী আন্দোলন। এই আন্দোলন বৃটিশ আইন, রাজস্ব উৎপাদন এবং মালিকানা সম্পর্কের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সেই সংগে তিনি একথাও স্বীকার করেছেন যে সিপাহী বিদ্রোহ কেবলমাত্র বঞ্চিত তালুকদারদেরই আন্দোলন ছিল না। সাধারণ মানুষ, বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার পল্লীবাসীদের সহযোগিতার ফলে তালুকদারদের আন্দোলন এত সফল হতে পেরেছিল। ডঃ চৌধুরী অযোধ্যা, মথুরা, গাজিপুর, ফতেপুর, এলাহাবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে কিভাবে তালুকদারদের সঙ্গে জনগণ সাহায্য করেছিল তার প্রামাণিক বিবরণ দিয়েছেন।

একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক এম্. আর গুবিন্স বলেছেন যে, ভারতীয় সিপাহীরা মূলতঃ ছিলেন কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত।[১০] বিভিন্ন ইংরেজ ঐতিহাসিকের রচনাতেও এই বক্তব্যটির সমর্থন পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক কে, মেলেশন, লো, প্রভৃতি সকলে স্বীকার করেছেন যে, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণ মিলিতভাবে এই বিদ্রোহে যোগদান করেছিল। ঐতিহাসিক মেলেশন স্পষ্টভাবেই স্বীকার করেছেন যে, কৃষকরা স্বেচ্ছাসেবকরূপে বিদ্রোহী সিপাহী বাহিনীতে যোগদান করেছিল। তাদের সামরিক শিক্ষাও ছিল। ১৮৫৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লক্ষ্ণৌ এবং কানপুরের মধ্যবর্তী মিয়াগঞ্জ অঞ্চলে এবং সুলতানপুরে যে যুদ্ধ হয় তাতে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের কৃষকরা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে।[১১] ঐতিহাসিক চার্লস বল্ তাঁর গ্রন্থে লক্ষ্ণৌ-এর যুদ্ধের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন যে, সমস্ত গ্রামাঞ্চল থেকে অগণিত সংখ্যায় সশস্ত্র কৃষকেরা লক্ষ্ণৌ শহরের দিকে ধাবিত হয়েছিল।[১২] ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, "বিদ্রোহে গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের যোগদানের ফলে অধিকাংশ বিদ্রোহীদের বেছে বের করতে না পেরে ম্যাজিস্ট্রেটরা সমূহ গ্রাম অগ্নিসংযোগের দ্বারা ভস্মীভূত করার আদেশ দিয়েছিলেন। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে, গ্রামাঞ্চলের সমস্ত মানুষ বিদ্রোহে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১৩]

যে সমস্ত মানুষ সক্রিয়ভাবে বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেন নি বিদ্রোহীরা তাঁদেরও

যে সমর্থনলাভ করেছিলেন তথ্যের দ্বারা তাও প্রমাণ করা যায়। সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এক্ষেত্রে বর্ণ বা ধর্মগত কোন অন্তরায় দেখা দেয় নি। ঐতিহাসিক লো লিখেছেন, শিশু হত্যাকারী রাজপুত্র, গোঁড়া ব্রাহ্মণ, ধর্মোন্মাদ, মুসলমান, বিলাসপ্রিয় ও উচ্চাকাঙ্খী মহারাষ্ট্রীয় সকলে একই লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, গো-হত্যাকারী ও গোপূজারী, শূকর ঘৃণাকারী ও শূকর-খাদক সমস্ত মানুষই একত্রিত হয়েই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল।[১৪] সিপাহী বিদ্রোহের পেছনে তাই একটা অস্পষ্ট দেশপ্রেমেরও সন্ধান করা যায়।

সিপাহী বিদ্রোহের গণচরিত্র আরো প্রমাণিত হয় ইংরেজ সরকারের দমনমূলক নীতির দ্বারা। সে সময় কয়েদখানাগুলি পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তাতে স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। ১৮৫৭ সালের ১৩ই মে ইংরেজ সরকার ১১ আইন ঘোষণা করেন। এই আইনে বিদ্রোহীদের মৃত্যুদণ্ড দেবার বিধান ছিল। কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে ৬ই জুন ১৪ আইন ঘোষিত হয়। "The rigour of the law was further extended by the act xiv passed on 6 June by which provision was made for capital punishment of persons convicted of exciting mutiny or sedition. The series of acts which followed namely acts, xvi, xvii and xxv of 1857, were in the nature of retributory measures to meet the challenge to the government from the civil populace. Not only mere martial law was not proclaimed but very extensive measures were taken of the summary trial of offending persons of every class of people, civil as well as military. Other severe measures were also adopted... Even burning of offending villages was considered a necessity where the mass of the inhabitants had committed a grave outrage and the perpetrators could not be traced."[১৫]

ইংরেজ সরকারের অর্থনৈতিক দুর্গতি, রাজস্ব অনাদায় ইত্যাদিও পরোক্ষভাবে বিদ্রোহের গণচরিত্রের দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করে। এই সময় কোম্পানীকে বিভিন্ন জায়গায় ঋণের জন্য ঘুরে বেড়াতে হয়। সরকারের রাজস্ব আদায় হয় না। ১৮৫৮ সালের অক্টোবর মাসে আগ্রা বিভাগের ভূমি রাজস্বের নিম্ন তালিকাটি রাজস্ব অনাদায়ের চিত্রটিকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরে।[১৬]

জেলা	১৮৫৮ অক্টোঃ চাহিদা	১৮৫৮ অক্টোঃ সংগ্রহ	১৮৫৮ অক্টোঃ বকেয়া
মুত্রা	৪,২৭২-৬-৮	৩১৯-১-৭	৩,৯৫৯-৫-০
আগ্রা	৮,৪৯৩-৫-০	১,৭৮৩-৫-০	৬,৭১০-০-০
ফারাক্কাবাদ	২,২০৫,৪১৫-৭-১১	৭,৩০০-১০-১০	২,১৮,১১৪-১৩-১
মইনপুরী	১,১৩,৫৯৬-১৫-২	৯,৭৭০-১২-	১,০২,৮২৬-২-৬
এতোয়া	১ ০৯,৪৬৮-২-৫	১৩,৭২১-২-৪	৯৫,৭৪৭-০-১

২.

কিন্তু যে সিপাহী বিদ্রোহের গণচেতনা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম বাংলাদেশে তার সূত্রপাত হলেও এখানে তা একদিকে যেমন খুব ব্যাপ্ত হতে পারে নি অন্যদিকে গণসমর্থনধন্যও হতে পারেনি একথা ঠিক যে বাংলাদেশের কৃষক ও জনসাধারণের মধ্যে ইংরেজ সরকার সম্পর্কে অসন্তোষ এবং বিরোধী মনোভাবের মোটেই অভাব ছিল না। শশিভূষণ চৌধুরী তাঁর Civil Disturbances during the British rule in India (1765-1857) গ্রন্থে বহু তথ্য প্রমাণ সহযোগে বাংলাদেশের জনসাধারণের বিক্ষোভের চিত্র অংকন করেছেন। কিন্তু বিক্ষোভকে সংগঠিত করা এবং তাকে সুযোগ্য নেতৃত্ব দেওয়ার লোকের অভাব ছিল। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এই বিদ্রোহ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না। বাঙালি ভদ্রলোকের সিপাহী বিদ্রোহের প্রতি সমর্থন না থাকার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে অধ্যাপক আর. কে চক্রবর্তী লক্ষ্য করেছেন যে, ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসায়িক ও সাংস্কৃতিক সংশ্রবের ফলে বাঙালি ভদ্রলোকের মনে "Sense of superiority" জাগ্রত হয়েছিল।[১৭] সুপ্রকাশ রায় সিপাহী বিদ্রোহের প্রতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঔদাসীন্যের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আরো স্পষ্টভাবে বলেছেন, "ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এবং তাহার পরবর্তীকালেও, অর্থাৎ এই শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা না দেওয়া পর্যন্ত, ইংরেজ শাসনের প্রতি অনুরক্তিই ছিল এই শ্রেণীটির শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য। ইংরেজ সৃষ্ট ভূমি ব্যবস্থার মধ্য হইতে, ইংরেজ সৃষ্ট জমিদারী ব্যবস্থারই একটি শাখারূপে এই শ্রেণীর জন্ম। ইংরেজের শাসনই ইহাদের সৃষ্টিকর্তা এবং মহাবিদ্রোহের সময় এই শ্রেণীর সহিত ইংরেজ সম্পর্ক ছিল অতি ঘনিষ্ঠ। পরবর্তীকালে যে অর্থনৈতিক সংকট এই শ্রেণীর শহুরে অংশটিকে ইংরেজ বিরোধী করিয়া তুলিয়াছিল, সেই সংকট মহাবিদ্রোহের কালেও দেখা দেয় নাই। তাই ইহারা সেদিন ভারতের স্বাধীনতার কথা কল্পনাও করিতে পারিত না, বরং ইংরেজ শাসনের ছায়াশ্রয়কেই ইহারা পরম কাম্য বলিয়া মনে করিত। তাই ইহারা স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত মহাবিদ্রোহের প্রতি এত বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। বাংলাদেশের তিতুমীর প্রভৃতি কৃষক বীরগণ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দেই বা তাহার পূর্বেও ইংরেজের শাসনের উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হইয়াছিল কিন্তু ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দেও ইংরেজ কবলমুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষ ছিল এই তথাকথিত "প্রগতিশীল" বুদ্ধিজীবীগণের কল্পনারও অতীত।"[১৮]

বাংলা দেশের ভূস্বামী সম্প্রদায়ও সিপাহী বিদ্রোহের প্রতি সমর্থন দেখান নি। অধ্যাপক আর. কে. চক্রবর্তী তাঁর পূর্ববর্তী গ্রন্থে বলেছেন যে, ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদার শ্রেণী লাভবান হয়েছিল। তাই বিদ্রোহের প্রতি তাঁরা কোন সমর্থন দেখান নি। বিপরীত দিকে তাঁরা এই বিদ্রোহে ইংরেজ সরকারকে নানাপ্রকার সাহায্য দিতে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। সুপ্রকাশ রায় পূর্ববর্তী গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, ইংরেজ শাসনের সঙ্গে জমিদারদের অর্থনৈতিক

সম্পর্কই তাঁদেরকে বিদেশী ইংরেজ শাসন অব্যাহত রাখার কাজে নিযুক্ত করেছিল। কৃষক শোষণকারী ইংরেজসৃষ্ট জমিদার শ্রেণী ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে অযোধ্যা, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষক জনসাধারণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের রূপ প্রত্যক্ষ করে আপন আপন অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্যই ইংরেজ শাসনের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল। সুপ্রকাশ রায় বর্ধমান রাজের ক্রিয়াকলাপের দৃষ্টান্ত এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। বর্ধমানের মহারাজা বিদ্রোহের সময় ইংরেজ সরকারকে বহু হস্তী এবং গোযান সরবরাহ করেছিলেন। বর্ধমান থেকে কাটোয়া এবং বর্ধমান থেকে বীরভূম পর্যন্ত সমস্ত রাজপথ নিরাপদ রেখেছিলেন।[১৯] শুধু বর্ধমানের মহারাজা কেন, দেশের অন্যান্য জমিদাররা ইংরেজকে নানাভাবে সাহায্য দিয়েছিলেন। 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' পত্রিকায় জমিদারদের সাহায্যদান প্রসঙ্গে চমৎকার একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়—"সরকার জমিদারদের নিকট আবেদন করলেন এবং জমিদাররা রাজভক্ত প্রজার মত সরকারকে সাহায্য করতে লাগলেন। জমিদাররা গাড়ি ও গরুর মালিকদের অর্থদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং তাদের পরিবার রক্ষা করবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এর ফলে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই রানীগঞ্জে সাত হাজার গাড়ি জমায়েত হল। বাংলার জমিদাররা তাঁদের প্রত্যেকটি হাতি বিনা ব্যয়ে সরকারের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।"[২০] সিপাহী বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়ায় যে সব বাঙালি ভদ্রলোক ও জমিদার প্রকাশ্য আনুগত্য দেখান শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তার একটি তালিকা দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কলকাতার শ্যামাচরণ মল্লিক, প্রতাপচন্দ্র সিংহ এবং ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ; পাণিহাটির প্রাণকৃষ্ণ রায়চৌধুরী এবং জগৎচন্দ্র রায়চৌধুরী; শান্তিপুরের ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল; ঢাকার জমিদার অন্নদাকিশোর রায় এবং মৌলবী ফজলি ও আবদুল গনি; ময়মনসিংহের রামচন্দ্র ইত্যাদি। এই সব কারণে সিপাহীরা বাঙালিদের উপর চটেছিল। Raikes তাঁর 'Notes on the Revolt in the N. W. Provinees of India' বইতে বলেছেন—"A Bengali Baboo at Furuckabed or cawnpore was almost in as great peril as a Christian, so long as those cities were in the hands of the rebels." (P. 137)

এবার আমরা সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে বাঙালি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী এবং জমিদারদের মনোভাবের কিছু দলিল উদ্ধৃত করব।

[ক] Letter to the Governor-General of India from the British Indian Association, Calcutta (23 May, 1857), on the breaking out of the Sepoy Mutiny, with its Reply.

To the Rt. Hon'ble Lord viscount Canning,
Governor-General of India.

My Lord,—We the President, vice-President, and committee of the British India Association, beg leave to approach your Lordship with accompanying copy of Resolu-

tions which we felt our duty to record on hearing of the deplorable events which have lately occured at Meerut and Delhi.

We have also resolved to circulate these resolutions, among our countrymen in the interior, and to make known their purport generally by means of translations.

Were we permitted to add anything to these resolutions, it would be an expression of our admiration for, and confidence in, your lordship's conduct of affairs at this crisis.

We have the honor to subscribe ourselves,
My Lord, your Lordship's most humble servants.
(Sd) Radhakant, Rajah Bahadoor
" Raja Kalikrishna Bahadoor, v. p,
" P. C. Sing and others.

[খ] Extract Proceedings of a Meeting of the Committee of the British Indian Association held on the 22nd May 1857

The Committee ot the British Indian Association have heard of the disastrous events which have lately occured at Meerut and Delhi with deep concern and sorrow.

The committee view with disgust and horror the disgraceful and mutinous conduct of the native soldiery at those stations, and the excess committed by them, and confidently trust to find that they have met with no sympathy, countenance, or support from the bulk of the civil population of that part of the country, or from any reputable or influential classes among them.

The Committee of the Association record without hesitation of their conviction of the utter groundlessness of the reports that have led a hitherto faithful body of the soldiers of the state to the commission of the gravest crimes of which military men or civil subjects can be guilty, and the committee deem it incumbent on them on the present occasion to express their deep abhorrence of the practices and purposes of those who have spread those false and mischievous reports.

The Committee earnestly hope for the restoration of peace and good order, which they doubt not will soon be re-

established by the vigorous measures which the Government have adopted in this exigency.

The Committee trust and believe that the loyalty of their fellow subjects in India to the Government under which they live and their confidence in its power and good intentions are unimpaired by the lamentable events which have occured in the detestable efforts which have been made to alienate the mind of the sepoys and the people of the country from their duty and allegiance to the beneficent rule under which they are placed.

(Sd) Issur Chunder Sing,
Honorary Secretary.

[গ] Letter to the Governor-General of India from the Mahomedan Association, Calcutta, dated 28th May, 1857 on the breaking out of the Sepoy Mutiny.

To the Right Honorable Lord viscount Canning,
Governor-General of India, Fort William

My Lord—We the committe of the Mahomedan Association beg permission to lay before your Lordship a copy of translation of the proceedings of a special meeting of our body held at the Association rooms on the 27th May, 1857, which as loyal subjects of the British Government we deemed it our duty to record upon being informed of the late disatrous events which happend in some towns of the North Western provinces.

Our resolutions shall receive as wide a circulation as practicable, and we will only beg leave to add that the energetic and prompt efforts adopted by our Lordship are assuredly calculated to restore, and we are persuaded, will speedily renew tranquility and rule wherever it has been temporarily disturbed by the shortsighted mutiny and phrenzy of a partion of the native troops.

On our part we beg humbly to assure your Lordship, that should any occasion arise for the co-operation of the nativism this country for the support of rule and order and the preservation of the lives and properties of the

subjects of the British Government, we are prepared to contribute to the utmost scope of our energies and means.

With every feeling of respect and duty,
We have the honor to be, My Lord,
Your Lordship's most obedient and most humble
servants,

Fuzloor Ruhman, President
Abdool Baree, Mahummed Wujjeh } Vice—President
Abdoor Jabbar
Mohammad Abdool Rowoof & others
Members

Association Rooms, May 28, 1857.

[ঘ] সংবাদ প্রভাকর। ২১.৬.১৮৫৭

"কয়েকদল অধার্ম্মিক-অবাধ্য-অকৃতজ্ঞ হিতাহিত-বিবেচনা-বিহীন এতদ্দেশীয় সেনা অধার্ম্মিকতা প্রকাশ পূর্ব্বক রাজবিদ্রোহী হওয়াতে রাজ্যবাসী শান্তস্বভাব প্রজামাত্রেই দিবারাত্র, জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছেন, 'এই দণ্ডেই হিন্দুস্থানে পুনর্ব্বার শান্তি সংস্থাপিত হউক, রাজ্যের সমুদায় বিঘ্ন বিনাশ হউক! হে বিঘ্নহর! তুমি সমুদয় বিঘ্ন হর,—সকল উপদ্রব নিবারণ কর...... যাহারা গোপনে অথবা প্রকাশ্যরূপে এই বিষমতর অনিষ্ট ঘটনার ঘটক হইয়া উল্লেখিত জ্ঞানান্ধ সেনাগণকে কুচক্রের দ্বারা কুপরামর্শ প্রদান করিয়াছে ও করিতেছেন তাহার দিগ্যে দণ্ড দান কর। তাহারা অবিলম্বেই আপনাপন অপরাধ-বৃক্ষের ফলভোগ করুক।'—ইহার কারণ কি তাহাও ব্যক্ত করিয়াছেন—"এই রাজাই তো রাম রাজ্যের ন্যায় সুখের রাজা হইয়াছে, আমরা যথার্থরূপ স্বাধীনতা সহযোগে পদ, মান, বিদ্যা এবং ধর্ম্ম, কর্ম্মাদি সকল প্রকার সাংসারিক সুখে সুখী হইয়াছি; কোন বিষয়েই ক্লেশের লেশমাত্র জানিতে পারি না, জননীর নিকট পুত্রেরা লালিত ও পালিত হইয়া যদ্রূপ উৎসাহে ও সাহসে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া অন্তঃকরণকে কৃতার্থ করেন, আমরাও অবিকল সেইরূপে পৃথিবীশ্বরী ইংলণ্ডেশ্বরী জননীর নিকটে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালিত হইয়া সর্ব্বমতে চরিতার্থ হইতেছি।...

"যবনাধিকারে আমরা ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই নাই, সর্ব্বদাই অত্যাচার ঘটনা হইত। মহরমের সময় সকল হিন্দুকে গলায় 'বদি' অর্থাৎ যাবনিক ধর্ম্ম-সূচক একটা সূত্র বান্ধিয়া দর্গায় যাইতে হইত, গাম অর্থাৎ নীরব থাকিয়া "হাঁসন" "হোঁসেনের" মৃত্যু জন্য শোকচিহ্ন প্রকাশ করিতে হইত। কাছা খুলিয়া কুর্নিস করিয়া "মোচেচ" নামক গান করিতে হইত। তা না হইলে শোণিতের

সমুদ্র প্রবাহিত হইত। এক্ষণে ইংরাজাধিকারে সেই মনস্তাপ একালেই নিবারিত হইয়াছে, আমরা অনায়াসেই "চর্চ্চ" নামক খ্রীষ্টিয় ভজনামন্দিরের সম্মুখেই গভীরস্বরে ঢাক, ঢোল, কাড়া, তাসা নহবৎ, সানাই, তুরী, ভেরী, বাদ্য করিতেছি ; "ছ্যাডাং" শব্দে বলিদান করিতেছি, নৃত্য করিতেছি, গান করিতেছি, প্রজাপালক রাজা তাহাতে বিরক্ত মাত্র না হইয়া উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। এই কল্পে ছোট বড় সকলকে সমভাবে স্বাধীনতা প্রদান করিতেছেন।"

এই সঙ্গে সম্পাদকীয় স্তম্ভে একটি সুদীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়। এর কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হল ঃ

জয় জগদীশ, জগতের সার।
লহ লহ নাথ প্রণাম আমার ॥
করি এই নিবেদন, দীন দয়াময় !
বাঞ্ছাফল পূর্ণ কর, হরে বাঞ্ছাময় ॥
চিরকাল হয় যেন, ব্রিটিশের জয়।
ব্রিটিশের রাজলক্ষ্মী, স্থির যেন রয় ॥
....
বিদ্রোহী সেফাইগণ, করি নিবেদন।
ছাড় দ্বেষ রণবেশ, কর সম্বরণ ॥
....
কার কথা শুনে সবে সেজেছ সমরে ?
পিপীড়ার পাখা উঠে, মরিবার তরে ॥
এখনই ছেড়ে দেও, মিছে ছেলেখেলা।
আকাশের উপরেতে, কেন মারো ঢেলা ॥

[৬] সম্বাদ ভাস্কর। ২০.৬.১৮৫৭

"হে পাঠকসকল, ঊর্দ্ধবাহু হইয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে নৃত্য কর...আমারদিগের প্রধান সেনাপতি মহাশয় সসজ্জ হইয়া দিল্লী প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছেন, শত্রুদিগের মোর্চ্চা শিবিরাদি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছেন, আমাদিগের তোপমুখে অসংখ্য লোক নিহত হইয়াছে, রাজসৈন্যেরা ন্যূনাধিক ৪০ তোপ এবং শিবিরাদি কাড়িয়া লইয়াছেন, হতাবশিষ্ট পাপিষ্ঠেরা দুর্গ প্রবিষ্ট হইয়া কপাট রুদ্ধ করিয়াছে, আমারদিগের সৈন্যেরা দিল্লীর প্রাচীরে উঠিয়া নৃত্য করিতেছে...ব্রিটিশরক্ষিত ভারতবর্ষবাসী প্রজাসকল নির্ভয় হও, 'ছেলেধরা' একটা কথামাত্র শুনিয়াছিল, সিপাহী ধরা প্রত্যক্ষ কর, গত বুধবারে গঙ্গাতীরে বহুলোক দণ্ডায়মান ছিলেন তাঁহারা দেখিয়াছেন হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ী, পাঁচশত সিপাহী ধৃত হইয়া আসিয়াছে, কলিকাতাবাসীদিগের আর ভয় নাই যে সকল বিদ্রোহীরা দিল্লী প্রদেশে শিবির স্থাপন করিয়াছিল তাঁহারা দুইবার বাহির হইয়া গাজীউদ্দিন স্থানে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল, রাজসৈন্যেরা তাহাদিগকে কচুকাটা করিয়াছে, অবশিষ্টেরা রণে হারিয়া পলায়ন-পর হইয়াছে।"

[৮] ১৮৫৭ সালের ১৭ই জুন উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখার্জীসহ সংলগ্ন অঞ্চলে মোট ৪২ জন জমিদার ও তালুকদার ভারত সরকারের সেক্রেটারীকে যে পত্র দেন তাতে বিদ্রোহীদের 'বদমাইশ' বলে আখ্যা দেওয়া হয়, বিদ্রোহে ভীতি ও দুঃখ জ্ঞাপন করা হয়, বিদ্রোহ দমনে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আবেদন জানানো হয়। ১৮৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বর্ধমানের মহতাবচাঁদ বাহাদুর, রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর এবং তৎসহ ২৫০০ অধিবাসী ভারতের গভর্নর ক্যানিং-এর কাছে লিখিত এক পত্রে বিদ্রোহের নিন্দা করেন, অকুণ্ঠ আনুগত্য জানান এবং বৃটিশের দিল্লী অধিকারকে স্বাগত জানান। পত্রটির শেষে বলা হয় যে, বৃটিশ শাসনের প্রতি স্বাক্ষরকারীদের আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা প্রশ্নাতীত। ১৮৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মহারাজ সুরেশচন্দ্র রায় এবং বাংলা বিহার উড়িষ্যার ৫০০০ অধিবাসী লর্ড ক্যানিং-এর কাছে অনুরূপ আবেদন জানান। বাঁকুড়া, শ্রীহট্ট নোয়াখালী, ভবানীপুর, শান্তিপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকেও আনুগত্যসূচক পত্র সরকারের কাছে পাঠানো হয়।

কালীপ্রসন্ন সিংহ হুতিশ স্মৃতিরক্ষার নিবেদনে সিপাহীদের নির্বোধ এবং বিদ্রোহকালীন সময়কে ভয়ানক দুর্বিপাক ও বীভৎস সময় বলে উল্লেখ করেছেন। "বিদ্রোহ সময়ে সর্বস্বহৃত, বিগতবান্ধব, বৈরনির্যাতনাক্রান্ত"—ইংরেজদের প্রতি তিনি সহানুভূতি জানান। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৮৫৭ সালের ৯ই জুন তাঁর ভ্রাতাকে লেখা এক পত্রে কলকাতায় সিপাহী বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়ায় ইংরেজদের আতঙ্ক ও ভীতিতে দুঃখবোধ করেন এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি জানান। ১৮৫৮ সলে কিশোরীচাঁদ মিত্র—"The Mutiny, The Government and the people" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি বলেন যে, এ বিদ্রোহ—"সৈন্যসংক্রান্ত বিপ্লব মাত্র, ইহাতে সমগ্র দেশের জনসাধারণের কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই। দেশবাসী রাজভক্তই আছেন।" এই গ্রন্থ রচনার পূর্বে কিশোরীচাঁদ প্রকাশ্য সভা করে লর্ড ক্যানিংকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

৩ পররাজ্য আক্রমণের নীতিটি যে ভ্রমপ্রমাদ পূর্ণ এবং এই নীতির ফলে এদেশের মানুষের অন্তরে যে ক্ষোভ-ক্রোধ-ঘৃণা জমেছে সে কথা স্পষ্ট করে বলেছেন হরিশ তাঁর একটি প্রবন্ধে : "The policy of annexation, lately so much in favour with the Government of India, and carried out with such a high hand in spite of the most solemn treaties, has been condemned by men possessing extensive powers of observation." এইভাবে বৃটিশ শাসক কেবল যে আপন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে তা নয় তারা মানবাধিকারকেও পদদলিত করেছে। পূর্বোক্ত প্রবন্ধে তিনি লিখছেন—"These involve not merely the violation of the most solemn promises, but also the wanton disregard of the most sacred rights cherished through ages and which no civilized monarch would attempt to deprive." দেশীয় রাজন্যবর্গের অন্তরের ক্ষোভও যে বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত সে সম্পর্কে হরিশ লিখেছেন—"It is admitted that the native princes have grievances of a weighty character Their social position is degraded by the surveillance exercised over their proceedings. They are not secure in their possession on their prospects. They feel that they have been barely tolerated."[২২]

সিপাহী বিদ্রোহের সঠিক কারণও যে হরিশের চিন্তা চেতনায ধরা পড়েছিল তার প্রমাণ আছে। ষাড়ের চর্বি বা ধর্মভীতি নয়, হরিশ বুঝেছিলেন যে বিদ্রোহের মূল কারণ আরো অনেক গভীরে নিহিত—"The disease seemed to have disappeared, when its symptoms broke out afresh, and in their indications showed that it was neither the fat of oxen nor the dread of proselytism, but a deep-rooted cause of estrangement that led to these mutinous outbreaks"[২৩] স্পষ্ট করেই তিনি বলেছেন যে সিপাহীদের সমস্ত কার্তুজ পুড়িয়ে ফেললেও তাদের অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধূমায়িত ক্ষোভকে বিতাড়িত করা যাবে না। অবিশ্বাস তো একদিনে জন্মায় নি যে একদিনেই তার উৎপাটন সম্ভব! হরিশ লিখেছেন—"All the cartridges in the stores of Bengal may be burned before the eyes of the men, yet they will not cease to murmur. The disaffection is too deep-rooted to be removed by such means. The officers have been disbelieved, their assurances have been set aside as of no value, their word of honor has been contemned, their persons have been despised Such feelings have not been engendered in a day and they cannot be cured in a day."[২৪]

সিপাহী বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে সুবাদার হায়দাৎ আলী যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার আলোচনা প্রসঙ্গে হরিশ বললেন যে, কেবলমাত্র—[ক] আফগান অভিযান. [খ] জাতিচ্যুতির ভয়, [গ] জীবিকার ক্ষেত্রে হতাশা, [ঘ] অযোধ্যা অধিকার, [ঙ] চর্বি মাখানো কার্তুজ নয়,—"The tempering with landed rights universally over the face of Northern India had generated a feeling of deep discontent If there be any one sentiment of affection with which the native views the soil he inherits, the homestead he dwells on, the relations which subsit between him and his landlord or his tenant. A rude shock was given to this sentiment." জমি হারানোর ভীতি ও বেদনা সিপাহীদের হৃদয় মথিত করে রেখেছিল, সেই যন্ত্রণায় নিরন্তর ইন্ধন সঞ্চার করেছিল সামন্তপ্রভুরা। হরিশ লিখেছেন—"The sepoys began to fear not only for their caste and their pay, but likewise for their lands. They struck the first blow. The feudal aristocrates urged them on. When a certain measure of progress was made, that aristocracy put itself at the head of the movement, and the sepoy mutiny became the Indian rebellion"[২৫] শেষের বাক্যাংশটি লক্ষণীয়। সিপাহী বিদ্রোহ ভারতীয় বিদ্রোহ হয়ে উঠল! অর্থাৎ হরিশ সিপাহী বিদ্রোহের দেশব্যাপী ব্যাপকতা সম্বন্ধে সন্দেহহীন ছিলেন। 'The country and the Government" প্রবন্ধেও তিনি স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন যে—"It is no longer mutiny but a rebellion." ভারতীয় জনমানসে বৃটিশ শাসন সম্পর্কে দীর্ঘকাল ধরে ক্ষোভ ও অসন্তোষ জমে উঠছিল। বৃটিশের ঔদ্ধত্যে ও অপমানে, অপশাসনে ও শোষণে রুষ্ট হচ্ছিল ভারতবাসী। তাই সিপাহীবিদ্রোহ নামক ঘটনার আশ্রয়ে ঘটল সেই সুচিরসঞ্চিত ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ। হরিশ লিখেছেন—"There is not a single native of India who does not feel the full weight of the grievances imposed upon him by the very existence of the British rule in India-grievances inseparable from subjection to a foreign rule. There is not among the educated classes who does not feel his prospects circumscribed and his ambition restricted by the supremacy of that power."[২৬] 'The real disease' প্রবন্ধে রাজা জালাল সিংহের বিচার প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে হরিশ বলেছেন যে মানুষ শুধু উদর-পূর্তিতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। স্বাধীনতা তার আকাংখিত বস্তু। হরিশ আবেগময় কণ্ঠে বলেছেন—"English statesmanship may secure our property, increase our wealth, multiply our comforts, strew the country with palaces and with plenty to fill them. But

man does not live by bread alone. So long as English rule means civil and political degradation, as it undoubtedly doth now ;—so long as to meet an Englishman is to be insulted and dishonored, as it undoubtedly the case now ;—so long as all that is noble and brave and aspiring in human nature is crushed and trodden down in us by English pride ;—so long as it shall be the Anglo-Indian creed that the fattest is for their board, the fairest for their bed ; so long shall proclamations like that we have printed be conceived, framed or promulgated, according to opportunity, even by the Hindoo and the Rajpoot."[২৭]

সিপাহী বিদ্রোহের গণচরিত্র সম্পর্কেও স্বচ্ছ ধারণা ছিল হরিশচন্দ্রের। তিনি দেখেছেন যে প্রথমাবধি সিপাহীরা দেশের জনসাধারণের সমর্থন লাভ করেছিল —"They have from the beginning drawn the sympathy of the country." সমস্ত অধিকার হারিয়ে দেশবাসীর কাছে শহীদের মর্যাদা লাভ করেছিল সিপাহীরা। হরিশ লিখেছেন—"They have hazarded all their most valuable interests ; and their countrymen view them as martyrs to a holy cause and a great national cause. The mutineets have been joined and aided by the civil population."[২৮]

বিদ্রোহী সিপাহীদের অত্যাচার ইত্যাদিকে কেন্দ্র ইংরেজরা অতিরঞ্জিত সংবাদ পরিবেশন করে বিশ্বজনমতকে বিভ্রান্ত করছিল। এই অতিরঞ্জনের বিরুদ্ধে হরিশ অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেন। একটি প্রবন্ধে তীব্র বিদ্রুপের সুরে বৃটিশ চরিত্রকে বিদ্ধ করে লিখেছেন—"The reaction in English opinion on the subject of the atrocities alleged to have been committed by the insurgents in India and the retribution to be dealt out to the people of India in consequence can not surprise those who have studied the English character."[২৯] অন্য একটি প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে বিদ্রোহী সিপাহীদের অত্যাচার সম্পর্কে ইংরেজের এমন উচ্চকণ্ঠ চিৎকার অর্থহীন। সুসভ্য পাশ্চাত্য দেশগুলির ইতিহাসে অনুরূপ অত্যাচারের দৃষ্টান্ত পর্যাপ্ত রয়েছে—"It is contended for by one that the crimes of the Indian rebels are unparalled in atrocity. This is urged by the generation which has just succeded the warriors of the peninsular campaign and by the contemporaries of the Border Russians and of the French pacificators of Algeria. The monster crime of Cawnpore will find

more than a parallel in the published and suppressed records of the crime of every civilized races "[৩০]

ক্ষুব্ধকণ্ঠে হরিশ প্রশ্ন করেছেন বিদ্রোহ দমনের নামে কতকাল ইংরেজ এমন অত্যাচার চালাবে! 'The pacification of the country' প্রবন্ধে তিনি লিখলেন :—"We say the bayonet has done its duty. During the period of its employment the pen was suspended. Civil authority was paralysed when the "will of the General" was the sole law. And our Generals have had resonable gratification of their wills. No quarter has been given. Whole lines of villages have been burnt down. For miles the trees have been ornamented with hanging peasants wholesale destruction has been meted out in retaliation for sepov massacres. Most budmash atrocities have been revenged in kind. An order to discriminate between the guilty and innocent has been derided as "clemency". The greatest charge that his enemy could invent against one of our first statesman was that he reprieved a hundred and fifty prisoners "

উপরের আলোচনায় আমরা দেখলাম সিপাহী বিদ্রোহের যে কারণ হরিশের চেতনায় ধরা পড়েছিল তার সঙ্গে আধুনিক ঐতিহাসিকরা ঐক্যমত পোষণ করেন। সিপাহী বিদ্রোহের গণচরিত্রও অনুধাবন করেছিলেন তিনি। এগুলি তাঁর ইতিবাচক ভূমিকা। সমকালীন অন্যান্য বাঙালী বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে তুলনায় এ বিষয়ে অগ্রপথিক তিনি। তবু শেষ পর্যন্ত দ্বিধামুক্ত তিনি নন। এ দ্বিধা অবশ্য সমকালীন যুগেরই দ্বিধা।

তাই সাম্প্রতিক কালের একজন আলোচক প্রশ্ন তুলেছেন : "হরিশ মহাবিদ্রোহে কোন পক্ষ নিয়েছিলেন? উপরোক্ত বিশ্লেষণের ধারাতে যুক্তিসংগত রাস্তায় এগিয়ে নিতে হ'লে অবশ্যই হরিশকে সমর্থন করতে হবে বিদ্রোহীদের। বিরুদ্ধতা করতে হবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের।

"এবং এই মূল প্রশ্নে এসেই তাঁর শ্রেণী চরিত্রটি পরিষ্কার হয়ে যায়। তিনি মহাবিদ্রোহের মূল কারণ নিয়ে, তার ব্যাপক চরিত্র নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে পারেন, কিন্তু যে মুহূর্তে সমর্থন অসমর্থনের প্রশ্ন ওঠে, তখনই তিনি বিনা দ্বিধায় নিঃসংশয়ে বৃটিশের পক্ষ নেন। এ বাবদে তিনি মুক্তকণ্ঠ।

"একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। হরিশ কি সামন্তদের অনুপ্রবেশের জন্যেই এ বিদ্রোহের এত প্রবল বিরোধিতা করেছেন? মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধি বহু দেশীয় রাজা মহাবিদ্রোহে অংশ নিয়েছিলো, এবং বহুলাংশে তাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যেই মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিলো। কাজেই প্রগতিশীল ইংরেজ আর

প্রতিক্রিয়াশীল রাজন্যবর্গের মধ্যে ইংরেজকে বেছে নেওয়ার জন্যে, অনেকে বলে থাকেন, হরিশকে দোষ দেওয়া যায় না।

"কিন্তু ঘটনা এর বিপরীত। তিনি সর্বান্তঃকরণে ঐ সামন্তদের হয়েই কথা বলেছিলেন, এই ভেবে আনন্দিত হয়েছিলেন যে সামন্তরা ছিলো বলেই শেষ অব্দি বিদ্রোহ ব্যর্থ হতে পেরেছিলো। তিনি লিখেছেন,—

'Anyone who has studied the incidents of the revolt and the history of its suppression, will admit that to the friendship, goodwill, assistance and devotion of Native princes was the salvation of India from the sepoy calamity mainly owing., [ভাবানুবাদ: বিদ্রোহের ঘটনাবলী ও তার দমনের ইতিহাস ভালো ক'রে পর্যালোচনা ক'রে দেখলে সকলেই স্বীকার করেন যে "সিপাহী দুর্যোগের" হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ভারতবর্ষ প্রধানতঃ নেটিব্ রাজন্যবর্গের বন্ধুত্ব, সহায়তা, শুভেচ্ছা ও একাগ্রতার কাছেই ঋণী। (২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৫৮; পৃঃ ৬৪)]

"এই 'ঋণ' পরিশোধে অবহেলার জন্য হরিশ ব্রিটিশ সরকারকে সমালোচনা করেছেন যেহেতু তারা রাজন্যবর্গের এহেন ঐতিহাসিক বীরত্ব ও কৃতিত্বের উপযুক্ত স্বীকৃতি দিতে গররাজি, তবে তাতে কিছু এসে যায় না, বলেছেন হরিশ; কারণ 'If the imperial majesty of England fail to requite their unsurpassed services, history will be proud to devote her pages to their glory' [ভাবানুবাদ: ইংল্যাণ্ডের সাম্রাজ্যিক (imperial) মহিমা যদি এঁদের এই অভূতপূর্ব সেবার উপযুক্ত পুরস্কার দিতে অপারগ হয়, ইতিহাস স্বয়ং তবে সগর্বে পাতার পর পাতা অলংকৃত করবে এঁদের গৌরবগাথা কীর্তনে। (ঐ)।

"কেবল বৃহৎ রাজন্যবর্গই নয়, জমিদারদের হয়েও প্রবল ওকালতি করতে ভোলেননি তিনি। জমিদারদের প্রতি বৃটিশ বাহাদুরের অকরুণ আচরণে প্রায় চোখে-জল-আসা কলমে তিনি লিখেছেন, 'The Zemindars of the Meerut district have given shelters to the Europeans who were driven from Delhi by the Violence of the mutineers···The feeling which promoted the act was one of genuine loyalty. A people feeling thus and acting thus are undoubtedly entitled to humane if not generous consideration.' [ভাবানুবাদ: দিল্লীর বিদ্রোহীরা যেসব ইউরোপীয়কে বলপ্রয়োগের দ্বারা বিতাড়িত করেছিলো, তাঁদের আশ্রয় দিয়েছিলেন মীরাটের জমিদারেরা।···নির্ভেজাল রাজভক্তিই তাঁদের এ কাজে প্রণোদিত করেছে, আর এই যখন তাঁদের মনোভাব ও কর্মের পরিচয়, তবে নিঃসন্দেহে তাঁরা, উদার না হোক্ অন্ততঃপক্ষে মানবিক বিবেচনার দাবী রাখেন।" (২১শে মে ১৮৫৭: পৃঃ ৫)]"[৩১]

বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী সিপাহীদের 'হত্যাকারী', 'ঘাতক' বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি, দাবি করেছেন তাদের শাস্তি—"We are not advocates for lenient measures when justice demands the adoption of stringent ones, we have no sympathy for murderers."[৩২] অন্য আর এক প্রবন্ধে বিদ্রোহীদের ক্রোধকে—"Dark surge of unreasoning angei" বলে উল্লেখ করে ন্যায়সঙ্গত শাস্তি দাবি করেছেন—"The time is certainly now come when the task of punishing the offenders should be entered upon systematically and in the spirit of pure justice."[৩৩]

সিপাহী বিদ্রোহের ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত হরিশ যে বৃটিশ প্রশাসনের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন তার সাক্ষ্য আছে তাঁর জীবনচরিত গ্রন্থে। রামগোপাল সান্যালের বক্তব্য প্রসঙ্গত উদ্ধৃতিযোগ্য: "সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজ ও এদেশীয়দের মধ্যে ঘোর মনান্তর জন্মিয়াছিল। তিনি এই সময় বিদ্রোহ-শান্তি ও ইংরেজ রাজার প্রতি জনসাধারণের ভক্তি যাহাতে অচল থাকে তাহার জন্য লেখনী চালনা করিয়াছিলেন।"[৩৮] অনুরূপ উক্তি করেছেন শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়। তিনি লিখেছেন—"পেট্রিয়ট সারগর্ভ সুযুক্তিপূর্ণ তেজস্বিনী ভাষাতে কর্তৃপক্ষের মনে এই সংস্কার দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিবার প্রয়াস পাইলেন যে…প্রজাকুল ইংরাজ গবর্নমেণ্টের প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুরক্ত এবং তাহাদের রাজভক্তি অবিচলিত রহিয়াছে। …পেট্রিয়ট এই সময় এদেশীয়গণের অদ্বিতীয় মুখপাত্র হইয়া উঠিল।…রাজপুরুষগণের নিকট ইহার আদর বাড়িয়া গেল। এরূপ শুনিয়াছি পেট্রিয়ট বাহির হইবার দিন লর্ড ক্যানিং-এর ভৃত্য আসিয়া পেট্রিয়ট আফিসে বসিয়া থাকিত প্রথম কয়েকখানি কাগজ মুদ্রিত হইলেই লইয়া যাইত।"[৩৫]

সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম শহীদ মঙ্গল পাণ্ডে সম্বন্ধে হরিশের বিস্ময়কর নীরবতা আমরা লক্ষ্য করিব। ১৮৫৭ সালের ৮ই এপ্রিল মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি হয়। ৯ই এপ্রিল সে ঘটনা উল্লেখ করে হরিশ সৈন্য বিভাগ ঢেলে সাজানোর প্রস্তাব দেন। (—"If any indication in the circumstances of the times be clear or definite, it is that the whole system of our military organization should be recast. The indication should no longer be discarded") ৩০শে এপ্রিল এবং ৭ই মে তিনি সৈন্য-বিভাগ ঢেলে সাজানোর প্রস্তাবে আরো বিশদ করে বলেন—"It is, in the first place, absolutely necessary to increase the strength of the European force in India…In the second place, the strength of the sepoy army must be reduced. The next reform ought to be made in the mode of officering the sepoy army…with a large European force, a large number of European commissioned, officers must always be employed."

'দয়াময় ক্যানিং'-এর 'দয়ার' উপর আস্থা রেখেছেন তিনি। লিখেছেন—"Canning's clemency will then prove the salvation of the English name as it has proved the salvation of many Indian lives." গবর্নর জেনারেলের বিদ্রোহ সংক্রান্ত কার্যক্রমের মধ্যে বিচক্ষণতা দেখতে পেয়েছেন—"To my feeling the serious and temperate conduct of the Governor-General contrasts very favourably with the furious rage of irresponsible individuals, delighting apparently in unlovely scenes and descriptions, which if unchacked, could not fail of stirring up matter for further retribution here after."[৩৬] ভারতবর্ষের ইংরেজ সিভিলিয়ান ও অফিসাররা সরকারপক্ষকে যেভাবে আক্রমণ করেছেন তাতে হরিশ বেদনাবোধ করেছেন—"The Government became an object of virulent attack for maintaining that the people of India at large had not risen, and that in these troubled times concession was due to their feelings."[৩৭] হরিশের মতে ভারতবর্ষের এক শ্রেণীর ইংরেজ—"Non-official class" ('বেসরকারী এই ইংরেজ' ঠিক কারা সে সম্পর্কে অবশ্য হরিশ বিধিবন্ধ কিছু মন্তব্য করেন নি)—ক্যানিং এবং প্রশাসন সম্পর্কে হট্টগোল তুলছে, বিদ্রোহের সুযোগ এরাই নিচ্ছে। তীব্র ব্যঙ্গ করে হরিশ এদের সম্পর্কে বলেছেন—"Instead of exhibiting their adsolute worth they took to finding fault with authorities and abusing the natives of the soil. The former have already been exculpated; and ere long the latter will appear to the English people in their true colours. Lord Canning was the special object of their indignation."[৩৮]

সিপাহী বিদ্রোহে হরিশচন্দ্রের ভূমিকাকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ এর মধ্যে হরিশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা দেখেছেন[৩৯], কেউ বলেছেন যে হরিশ মনে মনে বিদ্রোহীদের সমর্থন করতেন, সেন্সার ও নিপীড়নের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যই তিনি মুখে বিরোধিতা করেন।[৪০] আবার বিপরীত মতও আছে। শ্রীবিনয় ঘোষ লিখছেন যে, বিদ্রোহীদের প্রতি লেশমাত্র সহানুভূতি হরিশের ছিল না: "It is difficult to discern any ray of sympathy for the mutineers in H P. In most of its writings, Canning and his military and administrative collaborators were earnestly entreated by the editor to crush the rebels ruthlessly, even by gunning and hanging them when necessary, but with 'justice' and 'discrimination', not indiscriminately. There was an almost indecent haste

to demonstrate the loyalty and devotion of the Indian Princes, the Zaminders and the newly created educated middle class, particularly the Bengalis, to the British rulers. There was ceaseless trumpeting of the profound faith of the Bengali babus in the civilized behaviour and sense of justice of Englishmen. Unqualified reverence for English institutions,, political, legal and economic, was unbounded. This was how the myth of 'clemency Canning' was sedulously created and cultivated by the editor of H P. It proves that we are a myth-making people, particularly the educated among us, and not historians or fighters for a just people's cause."[৪১]

শ্রীঅর্চনা মিত্রের মতে হরিশ বিদ্রোহের পেছনের অর্থনৈতিক কারণ বা জন-সমর্থনের প্রসঙ্গ আলোচনা করে আদৌ শ্রেণীস্বার্থের বিরোধিতা করেন নি।[৪২]

কিন্তু হরিশের শ্রেণীগত অবস্থানটাই তো বিতর্কের বিষয়। তাঁর জীবন ও জীবিকার আলোচনায় দেখা গেছে যে ব্যক্তিগতভাবে স্বচ্ছল অবস্থার মানুষ তিনি ছিলেন না। অথচ তাঁর সমকালের বহু পূর্বেই অনেক বাঙালী বুদ্ধিজীবী ইংরেজ সংশ্রবে ধনে-মানে প্রতিপত্তি লাভ করেছেন। নিজে ভূস্বামী না হয়েও বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন তিনি, তথাপি এই সংস্থার স্বাধীন সদস্য অপেক্ষা অনেকটা যেন চাকুরীজীবীর ভূমিকা ছিল তাঁর। হিন্দু পেট্রিয়টও সর্বাংশে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মুখপত্র হয় নি। তাছাড়া আরো একটি প্রশ্নও আমাদের বিচলিত করে। হরিশ যদি প্রকৃতই ভূস্বামী স্বার্থে উৎসর্গীকৃত প্রাণ হন তাহলে তাঁর মৃত্যুর পরে সেই ভূস্বামীরা কেন তাঁকে এমন-ভাবে বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিক্ষেপ করলেন!

আসলে হরিশের রাজনৈতিক চিন্তার দ্বিধা দোদুল্যমানতাই সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে তাঁর দ্বিমুখী বক্তব্যের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা। যে বিনয় ঘোষ তীব্র ভাষায় হরিশের বৃটিশ তোষণকে নিন্দা করেছেন সেই বিনয় ঘোষই একই প্রবন্ধের উপসংহারে তাঁর চিন্তাগত দ্বিধার কথা স্বীকার করেছেন: "One cannot serve both master and servant or slave at the same time. If one tries to do that, one becomes ridiculous rather than a *tragic figure*. Ridiculous because, by doing that, one serves best the master and worst his servant. Hurish invariably tried to do that, both during the mutiny and the indigo-disturbances. For instance, just within a week of Mangal Pandey's hanging, H P wrote on the Bengal zamindars (16 April 1857): We admit the necessity of legislation in the

special interest and on special behalf of the ryots of Bengal. But we are not convinced that the condition will be bettered in the slightest degree by pensioning off the present race of landholders, and installing the various tribes of middlemen who now cover three-fourths of the surface of Bengal into the legal and social position of Zamindars."[৪৩]

সিপাহী বিদ্রোহের রাজনৈতিক তাৎপর্য হরিশ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। অন্যান্য বাঙালী বুদ্ধিজীবীর মত সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে তিনি ভীতি-উপেক্ষা পোষণ না করলেও এ ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকাকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা আখ্যা দেওয়াও বোধ করি সঙ্গত নয়। অন্যান্য বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মত তিনিও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে জাতীয় স্বাধীনতা বিষয়ে রোমাণ্টিক কল্পনা পোষণ করলেও তা সক্রিয় ইংরেজ বিরোধিতায় পর্যবসিত হয় নি বাস্তব কারণে। তিনিও, ১৮৫৭-৫৯ সালের বিদ্রোহকালীন পরিবেশে মনে করতেন যে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ইংরেজের শোষণ-অপশাসন, বৈষম্য ও নির্যাতনের অবসান ঘটবে এবং সেই সঙ্গে স্বশ্রেণীর মূল দুর্বলতাও তিনি অনুভব করেছিলেন।[৪৪]

সিপাহী বিদ্রোহ আয়ত্তে আসার পর ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ভারতের শাসনভার মহারাণীর হাতে ন্যস্ত হবার প্রস্তাব গৃহীত হলে নিম্ন ঘোষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়ঃ

শ্রীল শ্রীযুক্তা মহারাণী কুইন ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র

আলাহাবাদ ১৮৫৮ সাল, ১লা নবেম্বর সোমবার

শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনারল বাহাদুর শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আজ্ঞা পাইয়া, শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অনুগ্রহসূচক এই ঘোষণাপত্র ভারতবর্ষের রাজগণ ও সর্ব্বসাধারণ লোকের নিকট প্রকাশ করিতেছেন।

ভারতবর্ষের সকল রাজা, সর্দ্দার ও সর্ব্বসাধারণ লোকের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ঘোষণাপত্র।

আমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া পরমেশ্বরের অনুগ্রহে, গ্রেটব্রিটেন ও আয়ার্লণ্ড সংযুক্ত রাজ্যের এবং ইউরোপ, আসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া দেশের অন্তঃপাতী ঐ সংযুক্ত রাজ্যের যে সকল স্থান ও লোক আছে, তৎসমুদয়ের অধীশ্বরী ও ধর্ম্মরক্ষিকা।

ভারতবর্ষের মধ্যে যে সকল কার্য্যের ভার এতৎকাল পর্য্যন্ত আমাদের সপক্ষে কোম্পানী বাহাদুর নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন, সেই ভার পার্লামেণ্ট রাজসভার পারমার্থিক ও সাংসারিক লার্ড সাহেব ও কমন্স সাহেব মহোদয়গণের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে, আমরা নানাবিধ গুরুতর কারণে আপনারাই গ্রহণ করিতে স্থির করিয়াছি।

অতএব আমরা এই ঘোষণা পত্র দ্বারা সকল লোককে জানাইতেছি ও প্রকাশ করিতেছি যে, আমরা পূর্ব্বোক্ত সভার সভ্যগণের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে উক্ত দেশের কর্তৃত্ব কার্য্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছি। উক্ত দেশের মধ্যে আমাদের যে সকল প্রজা আছে, তাঁহাদিগকে এই আদেশ করি যে তাঁহারা সকলেই বিশ্বস্ত হইবেন, ও আমাদের ও আমাদিগের উত্তরাধিকারীগণের নিকটে রাজভক্তি প্রদর্শন করিবেন, ও আমাদিগের উক্ত দেশের কর্তৃত্ব কার্য্যে আমাদিগের পক্ষ হইয়া নির্বাহ করিবার জন্য, আমার ইহার পরে. সময়ে সময়ে, যাঁহাদিগকে নিযুক্ত করা উচিত জ্ঞান করি, তাঁহাদের আজ্ঞার বশে থাকিবেন।

আরও আমরা আপনাদের বিশ্বাসযোগ্য ও স্নেহপাত্র পরিজন ও মন্ত্রী শ্রীযুক্ত চার্লস্ জন ভাইকাউন্ট ক্যানিং সাহেবের ভক্তিগুণ, ক্ষমতা ও সদ্বিবেচনার উপর বিশেষরূপে বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া, তাঁহাকে অর্থাৎ উক্ত শ্রীযুক্ত ভাইকাউন্ট ক্যানিং সাহেবকে আমাদের উক্ত দেশের প্রথম প্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনারেল করিয়া আমাদের নামে উক্ত দেশের কর্তৃত্ব কার্য্য করিবার ও আমাদের নামে ও সপক্ষে সাধারণ মতে কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত করিলাম। কিন্তু আমাদের রাজ্যের প্রধান একজন সেক্রেটারি সাহেবের দ্বারা যে আজ্ঞা ও বিধি সময়ে সময়ে আমাদের নিকট হইতে পাইবেন তিনি তাহা বলবৎ মানিয়া কার্য্য করিবেন।

কোম্পানী বাহাদুরের অধীনে দেওয়ানী ও সৈনিক কর্মে যে সকল লোক যে যে পদে এইক্ষণে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগকে আমরা স্ব স্ব পদে বাহাল রাখিলাম, কিন্তু তদ্বিষয়ে আমাদের যে কোন বাসনা ইহার পর প্রকাশ হইবে, ও যে সকল আইন ইহার পর বিধিবদ্ধ করা যাইবে তাহা বলবৎ মানিয়া কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

ভারতবর্ষীয় রাজগণকে এই কথা জানাইতেছি যে কোম্পানী বাহাদুরের দ্বারা, কিম্বা তাঁহাদের দত্ত ক্ষমতানুসারে ঐ রাজগণের সঙ্গে যে সকল সন্ধি ও প্রতিজ্ঞাদি করা হইয়াছে, তাহা আমরা স্বীকার করিলাম ও তাহা অবিকল রূপে বজায় রাখিব এবং রাজন্যবর্গ তদনুসারে যথাবিহিত কার্য্য করিবেন ইহা আমরা আশা করি।

এইক্ষণে ভারতবর্ষে আমাদের যত অধিকারভুক্ত স্থান আছে তদপেক্ষা আর অল্পমাত্র দেশও অধিকার করিতে চাহি না। পরন্তু আমাদের অধিকারে যে সকল দেশ আছে, এবং সেই সকল দেশে যে স্বত্ব আছে তাহার উপর আক্রমণের কেহ উদ্যোগ করিলে, আমরা অবশ্য তাহার উপযুক্ত শাস্তি দিব, ইতিমধ্যে অন্য রাজগণের অধিকারের কি স্বত্বের উপর আক্রমণে অভিমতিও দিব না। আমরা নিজের স্বত্ব ও গৌরব, সম্ভ্রম যেমন মান্য করি সেইরূপ ভারতবর্ষীয় রাজগণের স্বত্বাদিও মান্য করিব। আভ্যন্তরিক শান্তি ও সুশাসনগুণে যে সামাজিক ও অন্যান্য সুখ সমৃদ্ধি উৎপন্ন হয়, আশা করি আমাদের নিজের ও অন্যান্য রাজগণের প্রজাগণ তাহা ভোগ করিবেন।

রাজধর্ম প্রতিপালন করিবার প্রতিজ্ঞাতে যেমন অন্য সকল প্রজার নিকটে আমরা বদ্ধ আছি, তেমনি আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রজার নিকটেও বদ্ধ থাকিব। আর সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের প্রসাদে আমরা সেই কার্য্য বিশ্বস্তরূপে ও সরল

মনে নির্বাহ করিব। খৃষ্টীয় ধর্ম সত্যজ্ঞান করি কিন্তু তাহাই বলিয়া প্রজাদিগের উপর জোর জুলুম করিয়া সেই ধর্মমত চালাইবার স্বত্ব ও ইচ্ছা আমাদের নাই। ধর্মবিশ্বাস কিম্বা ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করিয়া কাহারও প্রতি পক্ষপাত না হয় ও কেহ ক্লেশ দুঃখ না পায়, ইহাই আমাদের ইচ্ছা।

আইন অনুসারে সকলেই তুল্যরূপে ন্যায়মতে ও অপক্ষপাতে রক্ষিত হয় ইহা আমাদের বাসনা। আর আমাদের অধীনে যাহারা কর্তৃত্ব ভার পাইয়াছেন তাঁহাদিগকে আমরা আজ্ঞা করিতেছি যে প্রজার ধর্ম বিশ্বাসে কি আরাধনায় তাঁহারা হস্তক্ষেপ না করেন। এইরূপ হস্তক্ষেপ করিলে আমরা অসন্তুষ্ট হইব।

আর আমাদের বাসনা যে প্রজাদের মধ্যে যাঁহারা উপযুক্ত মতে শিক্ষিত হইয়া কার্যে নিপুণতা ও সত্যনিষ্ঠাদিগুণে গুণী হইবেন, তাঁহাদিগকে অবাধে, অপক্ষপাতে, জাতি, ধর্ম, ও বর্ণ অভেদে সকল রাজকার্য্যে নিয়োগ করা যাইবে।

ভারতবর্ষের লোকে পৈতৃক যে ভূমিসম্পত্তি অধিকার করেন তাহাতে তাঁহাদের অত্যন্ত মমতার কথা আমরা অবগত হইয়াছি, সেই মমতা ভাব মান্য করি, ও ভূমি সম্পর্কে তাহাদের যে সকল স্বত্ব আছে তাহা আমরা রক্ষা করিতে চাহি কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ন্যায্য প্রাপ্য অংশ তাহাদিগকে দিতে হইবে। আর আমাদের এই ইচ্ছা যে আইন প্রস্তুত করা ও সেই আইন অনুসারে কার্য্য করার সময়ে ভারতবর্ষের যে রীতি ও আচার ও ব্যবহার পূর্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহার প্রতি উপযুক্ত মনোযোগ ও দৃষ্টি রাখা যাইবে।

দুরাকাঙ্ক্ষী লোকেরা যে অমূলক জনরব রটাইয়া স্বদেশীয় লোকদিগের ভ্রান্তি জন্মাইয়া তাহাদিগকে রাজদ্রোহী করায় এবং তাহাদের কার্য্য দ্বারা ভারতবর্ষের যে সকল অমঙ্গল ও যন্ত্রণা হইয়াছে তাহাতে আমাদের অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে। সেই রাজবিদ্রোহ ব্যাপার যুদ্ধস্থলে দমন করিয়া আমাদের শক্তি প্রকাশ হইয়াছে। যাহারা উক্ত প্রকার ভ্রান্তিতে পড়িয়াছিল কিন্তু এখন পুনরায় কর্তব্য পথে ফিরিয়া আসিতে চাহে, তাহাদিগের অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদের দয়া প্রকাশ করিতে চাহি।

ইতিপূর্বে এক প্রদেশে অধিক রক্তপাত না হয় ও আমাদের ভারতবর্ষীয় রাজ্যের আরও শীঘ্র শান্তি স্থাপন অভিপ্রায়ে আমাদের প্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর বিশেষ সর্ত অনুসারে (for certain terms) ঘোষণা করিয়াছেন যে,, যে সকল ব্যক্তি ইদানীন্তন গোলযোগ সময়ে আমাদের শাসনের বিপক্ষে অপরাধ করিয়াছে তাহাদিগের অধিকাংশকে উক্ত সর্তানুসারে ক্ষমা করা যাইবে, এবং ক্ষমাতিরিক্ত ঘোর অপরাধ সকলের যে গুরুদণ্ড হইবে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। গবর্ণর জেনারেলের উক্ত কার্য্য আমরা স্বীকার করিয়া বলবৎ রাখিলাম। আর নিম্নলিখিত কথা ঘোষণা করিতেছি।

ব্রিটিশ প্রজার হত্যাকার্য্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংলিপ্ত হইবার অপরাধ যাহাদের বিরুদ্ধে সাব্যস্ত হইয়াছে কিম্বা হইবে, তাহাদিগের প্রতি ন্যায়বিচারানুসারে দয়া

প্রকাশ করা যাইতে পারে না। কিন্তু ঐ সকল অপরাধী ভিন্ন অন্য সকল অপরাধীকে দয়া প্রকাশ করা যাইবে।

জানিয়া শুনিয়া হত্যাকারীদিগকে যাহারা আশ্রয় দিয়াছে কিম্বা রাজবিদ্রোহে যাহারা নিতান্ত উদ্দীপ্তকারী হইয়াছিল তাহাদিগের প্রাণরক্ষা হইবেক ইহা প্রতিজ্ঞা করিতে পারি। কিন্তু যে যে অবস্থায় তাহাদিগের রাজভক্তি স্খলন হইয়াছে সেই অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অপরাধীদিগের দন্ড নিরূপণ হইবে। এবং যে সকল অপবাধ দুরভিসন্ধিবিশিষ্ট লোকের অমূলক জনরবে বিশ্বাস করিয়া উদ্ভূত হইয়াছে সেই সকল অপরাধের প্রতি অধিকরূপে অনুগ্রহ প্রকাশ করা যাইবে।

অন্য যে সকল লোক এক্ষণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতেছে— তাহারা ঘরে ফিরিয়া আসিয়া স্বীয় ব্যবসায় অবলম্বন করিলে আমাদের বিপক্ষে তাহাদের যে সকল অপরাধ হইয়াছে তাহা আমরা অবাধে ক্ষমা করিব ও মনে তাহার স্থান দিব না, এই অঙ্গীকার করিতেছি। যাহারা আগামী জানুয়ারী মাসের প্রথম দিবসের পূর্বে ঐ নিয়ম মতে কার্য্য করিবে তাহারা সকলেই আমাদের অনুগ্রহ ও রক্ষা পাইবে ইহা আমাদিগের বাসনা।

পরমেশ্বরের প্রসাদে যখন এদেশের মধ্যে শান্তি পুনর্বার স্থাপন হইবে, তখন দেশীয় কৃষিবাণিজ্য ব্যবসায় আদি কার্য্যের উৎসাহ দান, ও সর্বসাধারণের উপকার ও উন্নতি সাধনের সহায়তা করা ও ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের মঙ্গল ও উপকার সাধনে দেশের রাজশাসন কার্য্য নির্বাহ করা হইবে ইহা আমাদের অত্যন্ত বাসনা। তাঁহাদের সৌভাগ্যে আমাদের বল, তাঁহাদের সুখ শান্তিতে আমাদের নিরাপদতা, তাঁহাদের কৃতজ্ঞতায় আমাদের পুরস্কার লাভ হইবে। প্রজাদিগের মঙ্গলসাধন বাসনায় সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর আমাদিগকে ও আমাদিগের অধীনস্থ শাসন-কার্য্যকারীদিগকে শক্তি প্রদান করুন।"

[রামগোপাল সান্যালের অনুবাদ]

এবার দেখা যাক, ক্ষমতার হস্তান্তরকে হরিশ কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন। একবাক্যে একে যে তিনি স্বাগত জানান নি, তার প্রমাণ হরিশ কর্তৃক ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মপদ্ধতির প্রশংসা। ভারত শাসন সম্পর্কে মহারাণীর ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে কোর্ট অফ ডিরেক্টররা যে আবেদন জানান, হরিশ তাকে সমর্থন করেছিলেন।

তাঁর মতে কোম্পানীর আবেদনপত্র এক ঐতিহাসিক দলিল। পার্লামেণ্ট বা নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই কোম্পানীর সাফল্য এক নজির সৃষ্টি করেছে। কোম্পানী বৃটিশ আধিপত্য বা সম্মান বৃদ্ধি করেছে। সুতরাং তার প্রতি বৃটেনের কৃতজ্ঞ থাকা প্রয়োজন। কোর্ট অফ ডিরেক্টরদের আবেদনপত্রের অংশ বিশেষ উল্লেখ করে হরিশ লিখেছেন :

"These are telling facts, and put, as they are, definitely and in despair, they will enlist in favour of the Company the sympathy of all those who, disinterested in the final issue

of the question, are only desirous of seeing justice done to all parties. The paragraphs quoted speak enough of truth to lead men to think, and cure the population of the phrensy which would condemn the East India Company unheard It may occur to most people that no measure of administrative capacity could have held the American States in subjection to England to this day, and nothing could keep the Mogul Indian Empire from falling into foreign hands when the Company stepped in to take it But still the main argument is unanswerable. The Company had achieved success without parliamentary aid or control ; that the British nation owes much of its greatness to that success ; and that therefore it is bound in gratitude to least forbearance towards the Company."[৪৫]

হরিশের মতে ডিরেক্টরদের আবেদনপত্রের প্রতি এদেশের একাংশের জনসমর্থন আছে। এর কারণ বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছেন ঃ

"The Directors of the Company know, and in their petition to Parliament have urged, this fact. The part of the petition is most to the liking of the people of India, in which, after adverting to this important fact, the petitioners express apprehension respecting the fate of our countrymen. 'To their minds the abolition of the Company will mean the whole system of administration with which the Company is identified. The measure, introduced simultaneously with the influence of an overwhelming British force, will be coincident with a general outcry, in itself most alarming to their fears, from most of the organs of public opinion in this country as well as of English opinion in India, denouncing the past policy of Government on the express ground that it has been too forbearing, too considerate towards the natives.' The East India Company are undoubtedly in the right in taking credit to themselves for having done much to protect the natives from the 'public' of India. That 'public' if allowed to have its way would reduce the people to a condition of absolute helotry. The servants of the Company have usually made it a point of honour and of policy to

prevent the consummation of the devout wish. But sometimes, the temptation to earn the good opinion of the 'public' becomes irresistible, and official virtue yields reluctantly to the attractions of newspapers popularity. A few instance will suffice to show that the E. I. Co., and their servants are no longer that string and shield between the people of India and Anglo-Saxon aggressiveness that they claim to be."[৪৬]

হরিশ বলেছেন যে, ইংলণ্ড ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে ঋণী। এই কোম্পানী বৃটিশ সাম্রাজ্যকে আসমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত করেছে, মারাঠা ও মোগল শাসনের ধ্বংসস্তূপের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে বৃটিশ আধিপত্য ঃ

"The work of a century and more has too many and too powerful claims on public attention and parliamentary consideration to be destroyed without that degree of deliberation which is due to its long standing and importance. That England owes much to the East India Company for its power and prestige it is impossible to deny. Gradually, but certainly, the wave of British conquest in India has advanced from the Ganges to the Indus, absorbing all the petty nationalities that obstructed its progressive course, and erecting on the ruins of Mogul grandeur and Mahratta ascendency a monument of strength and glory for Britain."[৪৭]

হরিশ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্ষমতাচ্যুতি দিল্লীর রাজতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতি ঘটাবে। ডিজরেলি 'নিউ ইণ্ডিয়া বিলের' সমর্থনে যে বক্তব্য উত্থাপন করেন তার সমালোচনা করে হরিশ লিখলেন ঃ

"The position hitherto occupied by the East India Company as sovereign and subject at the same time was an anomaly in politics. It resembled in this respect one of those objects of metaphysical speculation which delight and embarass German philosophers and which are always expressed by two words joined by a hyphen. Were one of these philosophers to engage himself in defining the character of the Company in its dual relation as sovereign of one country and subject in another, we would receive deep and lengthy dissertations which would of themselves form an

important branch transcendental politics. Mr. D' Israeli, however in introducing the Bill, left this part of the subject on Eurasian mystery to be solved by the schoolmen of the thirty second century. He simply described the Company as a ministry of British power which had been left to play its functions with considerable liberty and independence and had on the whole possessed the respect of the British nation. To the people of India, however, the Company did not present the appearance of a representative of British power exclusively. It was in fact a successful Mogul Indian Satrapy, and in that light was universally viewed in India. Its displacement from political power severs the last link which connected the people of india with the throne of Delhi."

অবশ্য হরিশ যে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোন দোষ ত্রুটি উল্লেখ করেন নি তা নয়। হরিশের মতে ঃ

ক. ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কোন প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার নয়।

খ. ভারতীয় জনমতকেও তা কখনো কখনো অবজ্ঞা করেছে. ('The East India company' প্রবন্ধে ঃ—"Indeed one principal charge against it is that it pays too little homage to popular opinion")

গ. সিপাহী বিদ্রোহের ব্যাপারে তারা সমালোচনার যোগ্য ('The East India company' প্রবন্ধে ঃ—"we doubt whether they have acted wisely in this respect")

যে হরিশ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিবাচক দিকের উল্লেখ করেছেন, সেই হরিশই কিন্তু আবার স্বাগত জানিয়েছেন মহারাণীর ঘোষণাকে। বহু প্রবন্ধেই তিনি এই ঘোষণাপত্রকে প্রাজ্ঞজনোচিত বলে মন্তব্য করেছেন। যে উদাত্ত মহিমা ও গাম্ভীর্য ঘোষণাপত্রের ভাষায় প্রোজ্জ্বল তা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। এই উদাত্ত ভাষাকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করলে তার কতখানি রক্ষিত থাকবে তা নিয়ে সংশয় পোষণ করেছেন তিনি।

১৮৪৮ সালের ৪ঠা নভেম্বর তিনি এই ঘোষণাপত্র সম্বন্ধে হিন্দু পেট্রিয়টে লিখেছেন ঃ

"The matter of the proclamation was just such as was expected. On all the main points of policy the declaration of the Royal will is explicit and perfect. India shall henceforth be governed for the benefit of those who reside in its bosom, their feelings shall be respected, their traditions taken account of, their prejudices and likings not wantonly dis-

regarded. The rights of property, and specially of property in land are to be scrupulously protected from violation; and above all, none shall—neither sovereign nor neighbour—coerce their consciences."[৪৯]

তাঁর মতে এ ঘোষণা ভারতবাসীকে সন্তোষ দেবে। ঘোষণাপত্র যাঁরা কার্যকরী করবেন তাঁরা যদি ঠিক পথে চলেন শুভফল অবশ্যম্ভাবী।

"The proclamation will satisfy India. It invokes the strength of heaven to enable the sovereign and those in authority under her to carry out its declarations and intents. It is the heartfelt desire of the sovereign's subject that invocation may not be in vain. On the side of the sovereign as of her people it is doubtless sincere. It remains to be seen whether the executors of the sovereign's commands can raise themselves to the height of their charge, and render into their Royal Master a faithful account of the manner in which they shall have administered her gracious behests."[৫০]

বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের ঘরে রাণীর ঘোষণাপত্র পাঠের অনুষ্ঠান উপলক্ষে অন্য একটি প্রবন্ধে একই সুরে তিনি বলেছেন ঃ

"A fitting sequel to the great ceremony of the other day at the Government House was the meeting held on the 3rd instant at the rooms of the Chamber of Commerce. It would have argued something far worse than the complacent apathy for which alone Calcutta holds itself blamable to have remained silent to such an address from the throne as was recently given to the nations of India. The Queen's proclamation was addressed to a people of keen susceptibilities. It was directed to the heart as well as the understanding, and it succeeded in touching both. It inspired feelings which wanted vent. The meeting has afforded the outlet. It is absolutely necessary to the success of the great change that has been effected in the constitution that it should be received by the country at large in a new spirit. The royal call for the people's undivided allegiance demanded an audible and emphatic response. The meeting was a duty. It was fitting too that it in discharging this duty our countrymen should have followed the lead and guidance of our British fellow

subjects. They have been our political tutors since we have commenced to learn and practise politics. They know these things better. Above all, it was necessary for all to approach the sovereign as one united people, divided, it may be, by differences of other kinds, but united by the brotherly bond of a common allegiance to one sovereign. It was essential to this unity of appearance that our British fellow subjects should lead the rest of the community, and for the right excellent way in which they have done it we tender to them the thanks of the class we represent."[৫১]

হরিশ আশা করেছেন যে এই ঘোষণাকে সৎ ও আন্তরিকভাবে কার্যকরী করে তোলা হবে। সংস্কারমূলক কাজে কর্তৃপক্ষ অগ্রসর হবেন, ভারতবাসীর সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপন করবেন, আইনের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করবেন, এবং সর্বোপরি শিক্ষা বিস্তারে মন দেবেন। কারণ শিক্ষাই বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে শক্ত করবে।

"Babu Ram Gopal Ghose alluded to the famous speech of Lord William Bentinck in which that nobleman expressed his conviction that the best remedy for all evils in India was education and we may say that education is not only the besr remedy against all Indian evils but that it is and would be best guarantee to the stability of the British Empire in the East. And since the sovereign will has ordained that her auspicious reign will be marked by the promotion of all works of public utility, by the introduction ot general reforms and by the cultivation of good will and the amelioration of the condition of her subjects irrespective of colour and creed of which no distinction is professed to be observed, we feel assured that a better and a brighter day has now dawned on India and we must trust that by the blessing of kind providence, peace and tranquility may be speedily restored in the provinces infested by civil broils, and our Gracious Sovereign peaceably realise those improvements and works of public utility, tending to the welfare of millions, for the fulfilment of which their destiny has been cast into her hands by all wise providence "[৫২]

৭

সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর স্বদেশবাসীকেও দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান

জানিয়েছেন। মোহগ্রস্ত হরিশ মনে করেছেন যে শাসকের মৌখিকভাবে ঘোষিত সদিচ্ছার সঙ্গে শাসিতের দায়িত্বনিষ্ঠা সমন্বিত হলেই শুভ ফল দেখা যাবে। হরিশ লিখেছেন: "We have no doubt that since the sovereign will has been proclaimed it will be the duty and the interest of every loyal subject of the Queen to aid in realising those benevolent hopes and expectations which Her Majesty has so nobly expressed in Her Royal Proclamation."[৫৩]

উপরের উদ্ধৃতিগুলি খুঁটিয়ে পড়লেই বোঝা যাবে যে মহারাণীর ঘোষণা বা ক্ষমতার হস্তান্তরকে অন্ধভাবে হরিশ গ্রহণ করেন নি। তাঁর মনের কোণে একটা সন্দেহ ছিল। তাই বার বার তিনি বলেছেন যে, ঘোষণাপত্র নিঃসন্দেহে মহৎ, কিন্তু সেই মহত্বকে ফলপ্রসূ যারা করবে তারা কতখানি সৎ ও যোগ্য হবে সেইটাই প্রশ্ন। সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র অথবা শিল্প পুঁজি ও বাণিজ্য পুঁজির স্বরূপ না বুঝলেও হরিশের এই 'সন্দেহ' ঐতিহাসিক তাৎপর্যবাহী। শুধু সন্দেহ নয়, ক্ষমতার হস্তান্তরের প্রেক্ষাপটে হরিশ বেশ দৃঢ়কণ্ঠেই বলেছেন যে, এরপর থেকে শাসন ব্যাপারে ভারতবাসীর মতামত গ্রহণ করতে হবে, ভারতীয় সমস্যার সমাধান করবে ভারতীয়রা। হরিশ বলেছেন:

"Another thought arises in theorising about the Indian constitution. Can a revolution in the Indian government be authorised by Parliament without consulting the wishes of the vast millions of men for whose benefit it is proposed to be made? The reply must be in the negative. Great agitations are being made, it is true, for the overthrow of the East India Company, but until the national will of India goes to strengthen the enemies of the Directors the end will hardly be attained. The time is nearly come when all Indian questions must be solved by the Indian."[৫৪]

টীকা

১. British Rule in India, Jan, 25, 1853. Karl Marx
২. স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা। নরহরি কবিরাজ। পৃ. ৬৩-৬৪
৩. ভারতীয় মহাবিদ্রোহ। প্রমোদ সেনগুপ্ত। পৃ. ৪-৬
৪. Central India During the Rebellion of 1857-58. Thomas Lowe. P. 24. সুপ্রকাশ রায়ের গ্রন্থ 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম (১ম)' থেকে উদ্ধৃত।।
৫. স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা। পৃ. ৬৭—৬৮
৬ Civil Rebellion in the Indian Mutinies, S. B. Choudhuri. P. 260
৭. ভারতীয় মহাবিদ্রোহ। পৃ. ১২—১৩

৮. A Dictionary of Indian History. P. 321

৯. Civil Rebellion in the Indian Mutinies. P. 296-7.

১০. An Account of the Mutinies in Oudh. M. R. Gubins. P. 59

১১. History of the Indian Mutiny, vol. III. Malleson, P. 487

১২. Indian Mutiny, vol. II. Charles. Ball, P. 241

১৩. The sepoy Mutiny and Revolt. of 1857. Dr. R. C. Majumdar. P. 217

১৪. Central India During the Rebellion of 1857-8. Thomas Lowe. P. 24

১৫. Civil Rebellion in the Indian Mutinies. P. 263-4

১৬. Narrative of Events by G. F. Harvey, commissioner, Agra Divison, P. 43

১৭. Introduction, P—X. Shambhu Chandra Mookherjee's The Mutinies and the people or Statement of Native Fidelity.' edt by prof R. K. Chakraborty.

১৮. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম (১ম)। সুপ্রকাশ রায়। পৃ. ৩৬৬-৭১।

১৯. Burdwan Dist Gazetteer, P. 38

২০. Indian Field 11/2/1859

২১. How annexation was worked (Slections from the writings of Hurrish Chunder Mookerji). P. 1

২২. The Crisis and the Native Prince (Do). P. 66

২৩. The Mutinies (Do). P. 9

২৪. Do. P. 12

২৫. The causes of the Mutiny. (Do). P. 18-19

২৬. The Country and the Government. (Do) P. 15

২৭. The real disease (Do). P. 38

২৮. The Country and the Government (Do). P. 13

২৯. The atrocities and retribution (Do). P 92

৩০. The atrocities (Do). P. 97.

৩১. হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়: আত্মবিস্মৃত ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবী। অচেনা মিত্র। প্রস্তুতিপর্ব, জানুয়ারি, ১৯৭৪.

৩২. Confiscation of the property of rebels (Selections...Mookerji). P. 109

৩৩. Retribution (Do). P. 86

৩৪. এক্ষণ, পৃ. ৪৬

৩৫. The atrocities and retribution, (Selections...) P. 95

৩৬. Indiscriminate retribution and the 'antagonism of race.' (Do) P. 80

৩৭. The atrocities and retribution (Do). P. 93

৩৮. The atrocities and the atrocity mongers (Do), P. 104

৩৯. সুপ্রকাশ রায়ের পূর্ববর্তী গ্রন্থ।

৪০. India's Struggle for Freedom. Hiren Mukherjee

৪১. Frontier. 14.7.79

৪২. অচেনা মিত্রের পূর্ববর্তী প্রবন্ধ

৪৩. Frontier. 14.7.79

৪৪. নব্যবঙ্গে রাষ্ট্রচিন্তার ধারা। ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভৌমিক। পৃ. ১২৯-৩০

৪৫. The East India Company (Selections···). P. 116

৪৬. Abolition of the E. I. Company—one probable result (Do). P. 121-2

৪৭. The future of Indian Government (Do). P. 123

৪৮. The new India Bill. Constitutional points (Do). P. 130

৪৯. The Proclamation (Do). P. 143

৫০. Do

৫১. The Proclamation (Do). P. 144

৫২. The loyal Meeting and Address (Do), P. 149

৫৩. Do. P. 148

৫৪. The future of Indian Government (Do). P. 126

॥ সিপাহী বিদ্রোহকেন্দ্রিক উপন্যাস ॥

সিপাহী বিদ্রোহের মতো যুগান্তকারী ঘটনা বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের গভীরভাবে নাড়া দেয়নি। তার কারণ আমরা বর্তমান অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেষ্টা করেছি। বাংলার শিল্প সাহিত্যে এই বিদ্রোহের প্রভাব খুব গভীর ও ব্যাপক হয় নি। সিপাহী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে যে সব বাংলা উপন্যাস রচিত হয় সেগুলি হল :

১। চিত্ত বিনোদিনী। গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ। ১৮৭৫

২। নানাসাহেব। উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। ১৮৭৯

৩। বিজয়। কালীপ্রসন্ন দত্ত। ১৮৮৮

৪। চন্দ্রা। গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ১৮৮৩

৫। ঝান্সীর রাণী। চণ্ডীচরণ সেন। ১৮৮৮

৬। অমর সিংহ। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ১৮৮৯

৭। অশোকা। প্রসন্নময়ী দেবী। ১৮৯০

৮। স্বপ্নসুন্দরী। সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। ১৯০৮

৯। নানাসাহেব। দীনেন্দ্রকুমার রায়। ১৯২৯

বিদ্রোহকে কেন্দ্রে স্থাপিত করে ইংরেজ লেখকরা কিন্তু বহু উপন্যাস রচনা করেছেন। সংখ্যার হিসেবে প্রায় পঞ্চাশের উপর। এই জাতীয় উপন্যাসের প্রেরণাকেন্দ্র ছিল

ক) সাম্রাজ্যগত এবং জাতীয় প্রয়োজন,

খ) ইংলণ্ডের ভিকটোরীয় পাঠকের চাহিদা

গ) ভিকটোরীয় উপন্যাসের ঐতিহ্য,

ঘ) বৃটিশ লেখক ও পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গিগত ঐক্য।

এই চতুর্বিধ প্রেরণার মধ্যে লুকিয়ে আছে আর একটি বিষয়। বৃটিশ গর্বপূর্ণকারী এই সব উপন্যাসের ব্যবসায়িক সাফল্যও হয়ে উঠেছিল অনিবার্য।

সিপাহী বিদ্রোহকেন্দ্রিক ইংরেজি উপন্যাসের সাধারণ বিষয় : নায়ক কোন এক ইংরেজ অফিসার, নায়কের ভারতে আগমন—আগমন পথে জাহাজে বা ভারতে এসে সুন্দরী ইংরেজ রমণীর সঙ্গে পরিচয়—নায়ক ও নায়িকার প্রেম সঞ্চার—নায়ক বিদ্রোহের আবর্তে জড়িয়ে পড়ল—যুদ্ধে প্রচণ্ড বীরত্ব প্রদর্শন—ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন। দি ওয়াইফ এণ্ড দি ওয়ার্ড, সীতা, দি সোর্ড অফ আজরাল প্রভৃতি কিছু উপন্যাসের পরিণতি অবশ্য বিয়োগান্তক। বিয়োগান্তক পরিণতি ভিকটোরীয় আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এইসব উপন্যাসের যুদ্ধদৃশ্যে বৃটিশ আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত। অধিকাংশ-ক্ষেত্রে বিদ্রোহীনেতাদের ভিলেনরূপে চিত্রিত করা হত। এক্ষেত্রে বৃটিশ ঐতিহাসিকদের সঙ্গে ঔপন্যাসিকদের নিবিড় সৌসাদৃশ্য।

সিপাহী বিদ্রোহকেন্দ্রিক ইংরেজী উপন্যাসের প্লট দ্বিধাবিভক্ত। একদিকে আছে ইতিহাস অংশ, অন্যদিকে আছে কাল্পনিক প্রেমোপাখ্যান। কিন্তু এই দুই অংশের সমন্বয় খুব ঘনিষ্ঠ নয়। স্কটের আদর্শকে এঁরা সামনে রেখেছিলেন বটে কিন্তু যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস এঁরা রচনা করতে

পারেন নি। মোটামুটি এগুলিকে পীরিয়ড নভেল আখ্যা দেওয়া যায়। কিছু কিছু উপন্যাস অবশ্য রচয়িতাদের তটস্থ দৃষ্টিভঙ্গির গুণে সামাজিক ইতিহাস হয়ে উঠেছে—যেমন ক) ফ্লোরা অ্যানি স্টিলের অন দি ফেস অফ দি ওয়াটার্স, খ) মীডোজ টেলরের সীতা, গ) প্যাট্রিসিয়া ওয়েন্টওয়ার্থের দি ডেভিলস উইণ্ড।

এই ধরণের উপন্যাস শিল্পসৃষ্টির দিক থেকে খুব সার্থক নয়। একান্তভাবে বহিঃপ্রেরণা নির্ভর কোন সাহিত্যই শেষ পর্যন্ত সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। শিল্পসৃষ্টিগত ব্যর্থতার কারণ এ ধরণের উপন্যাসে সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়ঃ

ক) বিবরণধর্মিতা,

খ) চরিত্রগুলি স্থির, বিবর্তনধর্মী নয়,

গ) চরিত্র-চিত্রণ ঔপন্যাসিকের মুখ্য অভিপ্রায়ও নয়, মূল অভিপ্রায় এডভেঞ্চার এবং উত্তেজনার স্বাদ সৃষ্টি,

ঘ) বাহিরের ঘটনার প্রভাব,

ঙ) নায়কের বিদ্রোহ দমনে জড়িয়ে পড়ার পর নায়িকাচরিত্র প্রায়-উপেক্ষিত।

বিদ্রোহকেন্দ্রিক প্রথম পর্যায়ের ইংরেজী উপন্যাসের কালসীমা ১৮৫৭-৯০। এই পর্যায়ের ঔপন্যাসিকেরা অধিকাংশই প্রত্যক্ষ ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাই এ সময়ের উপন্যাসে কল্পনার অংশ কম।

এ পর্যায়ের প্রথম উপন্যাস দি ওয়াইফ এণ্ড দি ওয়ার্ড। লেখকের নাম এডওয়ার্ড মানি। তৎকালীন ক্যানটোনমেন্ট জীবনের চমৎকার চিত্ররূপ আছে এতে—আছে কানপুর হত্যাকাণ্ডের বিবরণ। দ্বিতীয় উপন্যাস চাইল্ডহুড ইন ইণ্ডিয়া এক ইংরেজ অফিসারপত্নীর রচনা। বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজের প্রতিহিংসার বিবরণ আছে মরিস ডেরি-তে। জেমস গ্রান্টের ফার্স্ট লাভ ও লাস্ট লাভ উপন্যাসে বিদ্রোহীদের ষড়যন্ত্র, সেনাজীবন ও দিল্লীর বাস্তব চিত্র পরিবেশিত। মীডোজ টেলরের সীতা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য? এ উপন্যাসে এক দেশীয় রমনী—সীতার সঙ্গে ইংরেজের প্রেম ও বিবাহ বর্ণিত হয়েছে। টেলরের দৃষ্টিভঙ্গি নিরপেক্ষ—হয়তো এই নিরপেক্ষতা কিছুটা শিল্প-সাফল্য এনেছে। এতে চরিত্রগুলি জীবন্ত, সুচিত্রিত। নূরপুরের ইঙ্গবঙ্গ সমাজের বিবরণ সমুজ্জ্বল। এছাড়াও প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসের মধ্যে আছে হাফিজ আলার্ডের নার্গিস, মলেটের লষ্ট লিংক ইন দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি, জর্জ-চীশনের দি ডিলেমা। ষ্টার্নডেলের দি আফগান লাইকের পটভূমি বিস্তৃত—ফ্লোরেন্স কলকাতা ও লণ্ডন। ওয়াহাবি আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ এতে আছে। গিলেনের 'দি রানে' উপন্যাসে আছে আছে ঝাঁসীর রাণীর চিত্র। তবে নিঃসন্দেহে সে চিত্র বিকৃত।... রাণীকে কাপুরুষ এবং হিংস্র করেই আঁকা হয়েছে। ভি এইচ. টমাসের দি টাচষ্টোন অব পেরিল গ্রন্থে হাজিগঞ্জের বাস্তব বিবরণ আছে এবং ভাবতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সংকটও সংকেতিত হয়েছে।

বিদ্রোহকেন্দ্রিক ইংরেজী উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্যায়ের কালসীমা ১৮৯১—১৯০৯। এ পর্বে বৃটিশ সাম্রাজ্য বহু বিস্তৃত। অ্যাংলো স্যাক্সন জাতির গর্বও বিস্তৃত হয়েছে। আর. ই. ফরেষ্টের এইট ডেজ, জি. এ. হেন্টির রুজুর, দি জাগলার, ম্যাকসওয়েলের গ্রেব ইন দি হার্ট অব:দি ষ্টর্ম, এইচ. এম গ্রীনহাউএর দি বাউ অফ ফেট, জে. ই. মাডকের দি ষ্টার অফ ফরচুন, ইত্যাদি উপন্যাসে সমকালীন বৃটিশ জাতির গর্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ববোধ প্রতিফলিত।

তৃতীয় পর্যায়ের কালসীমা ১৯১০-৪৭। এ সময়ে বিদ্রোহের 'মোথ' হ্রাস পেতে থাকে। তার কারণ—

ক) অপ্রতিহত সাম্রাজ্যের দুর্বলতা-প্রতিপাদক ব্য়র যুদ্ধ,

খ) নৌশক্তিতে বৃটিশ আধিপত্য হ্রাস,

গ) দুই সন্ধিচুক্তিতে ইউরোপ দ্বিধাবিভক্ত—ইংলণ্ড বিচ্ছিন্ন,

ঘ) ইংলণ্ডের অভ্যন্তরে সামাজিক অশান্তি—ধর্মঘট।

এই সব কারণে এ পর্বে বিদ্রোহকেন্দ্রিক উপন্যাসের সংখ্যাল্পতা। উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে আছে সীডনী গ্রীয়ারের দি কীপার্স অফ দি গেট, চার্লস ই পীযার্সের দি ষ্টার অফ দি ঈষ্ট প্যাট্রিসিয়া ওয়েন্টওয়ার্থের দি ডেভিলস উইণ্ড, এসকর্ট লীনের এ হীরো অফ দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি।

দশম অধ্যায়

হরিশচন্দ্রের সমাজ ও শিক্ষা ভাবনা

১. যুক্তিবাদ ও ঐতিহ্য নির্ভর রক্ষণশীলতা—উভয়ের প্রভাব পড়েছিল হরিশচন্দ্রের মনোজগতে। ডিরোজিয়ানদের মত তিনি অতীত ভারতের যাবতীয় ঐতিহ্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নি, অন্যদিকে 'ধর্মসভা'র সদস্যদের মত ঐতিহ্যের অন্ধ সমর্থনও করেন নি। আমরা অন্য অধ্যায়ের আলোচনায় দেখেছি যে ভারতে বৃটিশ শাসনকে 'মঙ্গলজনক' বলে মনে করেছেন তিনি, কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ইংরেজের বিদ্রূপ বা বক্রোক্তিকে বিদ্ধ করেছেন সমালোচনায়।

প্রসঙ্গত প্রথমেই আমাদের মনে পড়বে 'English and Hindoo civilisation :—a contrast'[১] নামক প্রবন্ধটির কথা। হরিশের জীবনচরিতকার রামগোপাল সান্যালের লেখা থেকে জানা যায় যে, এই প্রবন্ধটি সেকালে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। হরিশের মতে ইউরোপীয় সভ্যতা একান্তভাবে বস্তু-নির্ভর সভ্যতা, তার মূলে লক্ষ্য হল 'Survival of the fittest.' মানুষের একান্ত বস্তুগত প্রয়োজন সাধনই তার ধ্যানজ্ঞান। হরিশের এই বক্তব্যই পরবর্তীকালে আরো সূক্ষ্মতরভাবে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে শোনা গেছে।

প্রবন্ধের তৃতীয় অনুচ্ছেদে হরিশ লিখছেন :

"This conviction we share with the mass of our countrymen. Enunciated, however, in a European language, it appears to be novel to the extent of being paradoxical. Europeans in general are so accustomed to confound civilisation with material prosperity, they hold the moral and intellectual parts of human nature in such inferior consideration as compared with man's animal necessities, their views of social organization are so moulded by living under a political system the fundamental principle of which assumes every member of the community to be a rogue, that they are incapable of appreciating the excellence of an order of things different from what they are habituated to—an order of things that does not comprise railroads, meat rations and universal suffrage."

হরিশ অবশ্য স্বীকার করেছেন যে ইউরোপীয়দের মধ্যে কিছু কিছু মানুষ আছেন যাঁরা ইউরোপীয় সভ্যতার ফাঁকি ও ত্রুটির দিকগুলি স্বীকার

করেন। তবে সংখ্যায় তাঁরা নগণ্য। আর সংখ্যায় কম বলেই অধিকাংশ ইউরোপীয়রা তাদের সভ্যতার গর্বে আত্মহারা। তারা মনে করে যে তাদের সভ্যতাই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ—"It is haditual with them to consider no civilisation equal." হরিশ বলেছেন, ইউরোপীয় সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতার মতো সহযোগিতায় নীতিকে বিশ্বাস করে না, প্রতিযোগিতার নীতিকেই জীবননীতি বলে গ্রহণ করেছে। মেজাজ ও চরিত্রের দিক থেকে ইউরোপীয় ও ভারতীয় সভ্যতা একান্তভাবেই বিপরীতধর্মী। হরিশের অনুরূপ উক্তি অর্ধশতাব্দী পরে আমেরিকাবাসী ভারতপ্রেমিক ইংরেজ জে. টি. সাণ্ডারল্যাণ্ডের মুখেও শোনা গেছে।[২] হরিশ উভয় সভ্যতার চরিত্রগত পার্থক্য নির্দেশ করে বলেছেন যে ফলাফলের ক্ষেত্রেও উভয়ের পার্থক্য দেখা গেছে সঙ্গতকারণেই :

"The radical difference in the social condition of the two communities consits in this, that whereas the competetive principle has been carried out to its utmost length in England. the principle of co-operation thoroughly pervades the structure of Hindoo society. Everyone for himself and God for all, is the expressive motto of the Englishman's active life, everyone for his community and the community for me is at onee the rule and the reliance of the Hindoo. The results of these two opposite principles of action have developed themselves markedly in the respective communities in which they prevail and they forcibly demonstrate the general superiority of our social arrangements on whichever side we turn, but one."

নানাদিক থেকে হরিশ উভয় সভ্যতার তুলনা করেছেন। প্রথমতঃ অর্থনৈতিক তুলনা। হরিশের মতে ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যমণি ইংলণ্ডে বস্তুসম্ভার প্রচুর উৎপন্ন হলেও বণ্টনের বৈষম্যে তা সর্বশ্রেণীর মানুষের ভোগে ব্যবহৃত হয় না। দারিদ্র্য সেখানে বিতাড়িত হয় নি, আপাত চাকচিক্যের অন্তরালে তা অব্যাহত রয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের অবস্থাও সেখানে যথেষ্ট দুর্গতিপূর্ণ। ধনীর জীবন সেখানে স্বাচ্ছন্দময় হলেও দরিদ্র নিয়ত দারিদ্র্যের গর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়। শ্রেণাদৃষ্টি না থাকা সত্ত্বেও হরিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্গত ক্ষত অচেতনভাবে যে ভেদ করেছিলেন তার প্রমাণ নিম্ন অংশ :

"First economically—The quantity of the material products of labour in England is enormously large, the number of consumers much smaller than it is in this country : yet so utterly vicious is the mode of distribution that the greater portion of the English population are generally

uncertain of their means of living, while not a considerable section is actually always on the brink of starvation. Such appalling scenes of destitution as are common throughout the length and breadth of the United kingdom have no exiestence in this country. And yet the population of the kingdom is worked to a degree which leaves them no leisure for other exercise or enjoyment and deprives them of all healthy relish for existence. The terrible extent of this evil is evidenced by its Statute Book and writngs of its political economists and social philosophers. The pressure upon working classes must have been intolerably severe when in a country priding itself upon its constitutional freedom, the ligislature was obliged to interfere in order to forcibly set limits to the hours of their daily drudgery and the drudgery of their wives and children. The working population of England have few holidays save those which are created by want of employment and sickness. The poor laws—that caricature of upon God's laws for mitigating the severety of the primeval curse (as Christian Europe calls man's obligation to labour) are another evidence of the magnitude of the evil. It can argue nothing, but a radical defect in social organisation that the indigent and the superannuated of a community should depend upon the compulsory benevolence of the propertied classes stimulated by pains and forfeitures. Had this been the consequence of insufficiency in the funds of general maintenance, had the productive power of England not immeasurably exceeded her increase of population, there would have been reason for the extent of want felt for the means of subsistence. But the case is directly opposite, and that again forms a source of complaint among the classes above the working classes. The miseries of over-production are felt as extensively among the capitalists as those of scarcity are felt by lower classes. The extremely unnatural character of these sources of suffering is proved by the efforts made by the father of political economy and Mr. Malthus to prove the beneficial effects of luxury. English civilisation

stands condemned by the single fact that the relief of propertied working classes of England lies in the promotion of enervating, demoralising and spite—arousing luxury and that of the pauper working classes in penal sanctions for the exercise of individual benevolence. In no respect, however, is English civilisation found so utterly at fault than in the impediments which it lays to the indulgence of the social affections arising out of the conjugal and maternal relations. The measure of this privation must exceed all natural limits when it is considered that it is become an established truth in economical science that the demands of increasing population transcend the means of subsistence that the population can provide. Marriage, the natural provision of the weaker sex is barred to many. Those Englishmen who shower their pity on the widows of Hindoostan ought to remember that England, as Mr: Wakefield says, is the greatest missionary in the world. These are but a few of the phases of English misery caused by radical vices in social arrangement and they are anough to show that English civilization, whatever be its other merit, artificially entails an amount of suffering far beyond what those merits can compensate for."

দ্বিতীয়তঃ, নৈতিক দিক থেকে উভয় সভ্যতার পার্থক্য আছে। অপরাধ প্রবণতা বৃটেনে অনেক বেশী। মদ্যাশক্তি ইংলণ্ডের একটা ব্যাধি। সেখানে কেউ-ই আপন অবস্থায় সুখী নয়—"It is the discontent with one's situation in life."

তৃতীয়তঃ, নান্দনিক দিক থেকেও দেখা যায় সাধারণ ইংরেজের মধ্যে সূক্ষ্মতর চেতনার একান্ত অসদ্ভাব।

চতুর্থতঃ, বুদ্ধিগত দিক থেকেও পার্থক্য। অভিজাত ইংরেজরা বুদ্ধিসম্পন্ন হলেও সাধারণ ভারতবাসীর যা বুদ্ধি আছে তা সাধারণ ইংরেজের নেই।

পঞ্চমতঃ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকেও পার্থক্য আছে উভয়ের মধ্যে।

খ্রিস্টান মিশনারীরা হিন্দুধর্ম ও সামাজিক আচারের স্থূলতা প্রতিপাদনে প্রথমাবধি সচেষ্ট ছিল।[৩] রামমোহনের সময় থেকেই এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। হরিশও তাঁর 'Christianity in India'[৪] প্রমুখ প্রবন্ধে মিশনারী ক্রিয়াকলাপের সমালোচনা করেছেন। 'অন্যের কাছে শিক্ষা নেবার কিছু নেই—কেবল শিক্ষা দেবার জন্যই আমাদের আগমন'—মিশনারীদের এই পূর্বকল্পিত ধারণার গোড়ায় ভ্রান্তি আছে। তারা শুনতে চায় না, শোনাতে চায়; বুঝতে

চায় না, বোঝাতে চায়। এভাবে খ্রিস্টধর্মের মৌলতত্ত্বেরই বিরোধিতা করে তারা। "They are too learned in theology to have anything left to learn in the subject, far less to learn it from either Hindoos or Mahomedans" সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রতি তাদের অজ্ঞতাপ্রসূত উপেক্ষাকে তীব্র ব্যঙ্গেবিদ্ধ করে হরিশ লেখেন: "When the missionary expresses commisseration for our degraded moral and religious being, all we do is to laugh at the presumption of a man, poor in knowledge and poorer in thought, the great grandfather of whose great grandfather was, we know, a painted savage."

খ্রিস্টান মিশনারীদের অগ্রদূত ডঃ আলেকজান্ডার ডাফ ভারতের জাতিভেদকে যখন আক্রমণ করেন তখন অনেকটা রক্ষণশীলের মতোই হরিশ তাকে অন্য যুক্তির সাহায্যে খণ্ডন করতে চেষ্টা করেন। একথা অবশ্য সত্য যে, ইংরেজরা ভারতের সামাজিক কদাচার বা জাতিভেদ সম্পর্কে বহু অতিরঞ্জিত সংবাদ পরিবেশন করত।[৫] হরিশ যখন বলেন, শুধু ভারতে নয়, পৃথিবীর অন্যত্রও জাতিভেদ আছে—তখন ইতিহাসগতভাবে সে কথা মেনে নিতে দ্বিধা থাকে না,[৬] কিন্তু হরিশ যখন সেই সূত্র ধরে বলেন—"Caste is creation, because caste is harmony and harmony is creation"[৭]—তখন মনে হয় তিনি যুক্তির জন্যই যুক্তি উত্থাপন করছেন।

যুক্তির জন্য যুক্তির আরো দুটি দৃষ্টান্ত:

ক. হরিশ বলেছেন স্বর্গেও জাতিভেদ আছে। তা না হলে দেবতা ও দেবদূতদের পার্থক্য কেন![৮]

খ. মানবজন্মের সূত্রপাত থেকে জাতিভেদ চলে আসছে। প্রাচীন সমাজে সবল ও দুর্বল এই দুই পার্থক্যের মধ্যেই জাতিভেদের বীজ লুকিয়ে ছিল। আপন যুক্তির সমর্থনে ইতিহাসকে স্বমতে নিয়ে আসতে গিয়ে হরিশ লিখেছেন:

"Transporting ourselves back to our own world we see the germs of caste in the earliest and rudest forms of human society. Prior even to the formation of society itself, the germs may be said to exist in the inevitable inequality which naturally subsists between man and man. No human precaution can prevent one man from being stronger than another, or both being wiser than a third; and in the absence of any impracticable attempt at precaution it may well be supposed that great will be the dissimilarity of men to each other. A combination of circumstances will be in favour of one and disadvantageous to another. There will be strong and weak

men, good and bad huntsmen, any less of a superior or an inferior order, and schemers generally more or less ingenious. Invention, the power to create resources out of nothing, is the most needed in such communities, if communities they may be called, and there is no reason why all will be blessed with an equal portion of it. Besides, the strong, whether in physical power, intellectual superiority or acquired accomplishments, has always a tendency to oppress and encroach upon the rights of the weak. The state of nature, such as the one we have been indicating, is substantially what Hobbes has asserted of the original state of mankind—a state of war and mutual endeavours at injustice, in which every one wrongs his neighbour whenever he thinks he will profit by it and safely can. The result is that the weak draw towards each other for purposes of mutual protection, and remedy by combination as much as possible the original want of individual strength. They naturally keep themselves aloof from the men of the stronger class, have, for their companions, men of like strength and consequently like mind, entertain as a matter of course a degree of hatred for those more powerful than they are, intermarry among themselves from necessity as well as from motives of self-interest and convenience, and therefore form a caste of themselves. Writers and orators with incorrect ideas regarding the origin of society, and ignorant of the true influence which led the primeval wanderers and huntsmen to form nations and communities attribute the formation of castes to the hauteur and contempt of powerful men for their inferiors. The fact however appears to be what we have stated. No doubt strong men, good huntsmen, good anglers and swift runners were in the infancy of our race a sort of aristocracy in their time and were in fact the primitive aristocracy of the world, the unrecongnized ancestry of many of the present lords of very Ancients' Houses of every country. They must be supposed naturally to conceive a liking for men of their own stamp. It is human

nature to wish to give over, sons or daughters in marriage with the daughters or sons of another who is sufficiently on a par with him in sense, habits. modes of thought, physical strength and mutual skill. Reason has in this case at least to find no fault with the instinct of mankind. It is not otherwise possible to live in ease or attain convenience. For instance, it is not possible for the daughter of a man, weak in body and lethargic in spirit and consequently bred up in the associations of a weak and lethargic family, to be anything but miserable if married to a member of a family, strong, robust, active, fond of athletic exercises, and of sanguine temperament Examples might be multiplied ad infinitum, but it is unnecessary seeing that they can easily be imagined by the reader. But though the strong and the weak exhibit a natural inclination to keep aloof from each other, it is pretty clear that in the formation of castes, the latter began the initiative"[৯]

জাতিভেদের প্রশ্নে হরিশচন্দ্রের রক্ষণশীল মানসিকতা দৃষ্টিগোচর হলেও অন্যত্র আমরা দেখতে পাই সমাজ সংস্কার বিষয়ে তিনি উৎসাহী। বিধবা বিবাহকে সমর্থন করেছেন তিনি। বিধবা বিবাহের প্রবক্তাদের উৎসাহ দিয়ে বলেছেন :

"Let not therefore the friend of the widow be dismayed into a pusillanimous neutrality or discouraged by an impending interdict from acting conscientiously his part in the important drama. Instance have come to our notice in which native gentlemen residing in some of the villages about Calcutta who had openly espoused the case of Hindoo widow marriage, have succeeded in putting down the voice of schism and still maintain the social position which the bigotry of a few ill-educated conservatives had faintly challenged. It is time that enlightened men begin to have a strong party of their own."[১০]

শুধু উৎসাহ নয়, বিধবা বিবাহের ব্যাপারে তাঁর কিছু সক্রিয় ভূমিকা ছিল। 'সমাজোন্নতিবিধায়িনী সমিতি ও হরিশচন্দ্র' শীর্ষক অধ্যায়ে সে কথা আলোচিত হয়েছে। শিক্ষিত দেশবাসীকে ডাক দিয়ে হরিশ বলেছেন যে তারা যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হয় তাহলে রক্ষণশীলদের প্রতিবন্ধকতা চূর্ণ হবেই—"If the educated amongst us display a resolute

front, and are true to their professions, not all the shasters in India can prevent them from carrying out a just and wholesome reform."[১১]

রাজনৈতিক চিন্তার মত হরিশচন্দ্রের সমাজচিন্তাও দ্বিধামুক্ত ছিল না; গিরিশচন্দ্র ঘোষের মত তিনিও বিধবা বিবাহ সমর্থন করেছেন, ধর্মীয় বা সামাজিক গোঁড়ামির দ্বারা আচ্ছন্ন হন নি, তথাপি হিন্দু ধর্ম বা সমাজের মূলগত ঐতিহ্য রক্ষা করার ব্যাপারে সক্রিয়তা দেখিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ইয়ং বেঙ্গলের যুক্তিবাদী মানসিকতা ও ভিক্টোরীয় ঐতিহ্যচেতনার সমন্বয় ঘটেছিল। [Nineteenth century Bengal · Aspects of Social History by Pradip Sinha P. 102]

যদিও হরিশ মনে করেন নি যে, হিন্দুধর্ম—

ক. সামাজিক বিশ্বাস হিসেবে মানবজীবনের যথার্থ প্রতিনিধি, এবং

খ. সর্বৈব কুসংস্কার মুক্ত—

তথাপি তিনি ইউরোপীয় ধর্ম ও সভ্যতার সঙ্গে তুলনা করে এর শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পেয়েছেন।

১৮৫৪ সালে 'হিন্দু পেট্রিয়টে' হিন্দু ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার সমর্থনে পর পর অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আমাদের অনুমান, এগুলি সম্ভবতঃ গিরিশচন্দ্র ঘোষেরই রচনা। মনোমোহন ঘোষ সম্পাদিত Selections from the writings of Girish Ghosh গ্রন্থে এগুলি সংকলিত হয়েছে।

একদিকে হরিশ বিধবা বিবাহকে সমর্থন করেছেন, অন্যদিকে কিন্তু জোর গলায় বলেছেন যে ভারতে রমণী যে সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত তার তুলনা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। হিন্দু বিধবার পবিত্র জীবনবোধেরও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন তিনি, সতীপ্রথার অপরিমেয় নৈতিক প্রভাবের কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি। এইভাবেই তাঁর মধ্যে উদারনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে রক্ষণশীল মানসিকতার আশ্চর্য যৌগপত্য ঘটেছে—"Liberal and traditionalist notions were thus curiously intermingled in Victorian thinking about women. While reform of female education was strongly advocated, the traditional status of women in society was firmly defended." [Nineteenth···P 105]

২.

অ্যাকাডেমিক শিক্ষা হরিশ ব্যক্তিগত জীবনে লাভ করতে পারেন নি। কিন্তু শিক্ষার প্রতি তাঁর জীবন্ত আগ্রহ ছিল। অ্যাকাডেমিক শিক্ষার ফাঁক তিনি অনেক বেশী পূর্ণ করেছিলেন ব্যক্তিগত অধ্যয়নে। বহু খণ্ডে সমাপ্ত 'এডিনবরা রিভিউ' কয়েক দিনে তিনি পাঠ করেছিলেন কিনা সে বিতর্কে অংশগ্রহণ না করেও তাঁর রচনাবলীর সাক্ষ্য থেকে দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় যে, তাঁর পাঠ বহু বিস্তৃত ছিল। আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি বিদেশী বহু কবি-দার্শনিক-রাজনীতিবিদের

উক্তির তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহার করেছেন। বিষয় আয়ত্তে না থাকলে উদ্ধৃত যে বাড়তি বোঝা হয় সে কথা তো সুবিদিত। দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নকে আপততঃ এড়িয়ে বলা যায় নিম্ন প্রবন্ধগুলির মধ্যে মানবপ্রজ্ঞার নানা শাখা সম্বন্ধে হরিশের পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রতিফলিত হয়েছে ঃ

১. **The necessity of a language in India.**

২. **Christianity in India.**

৩. **English and Hindno civilisation.**

৪. **The Patriarchal system.**

৫. **Federalization.**

৬. **India in the house of commons**

৭. **Indiscriminate retribution and antagonism of race.**

ইত্যাদি।

প্রমথ চৌধুরী একদা লিখেছিলেন যে প্রত্যেক সুশিক্ষিত মানুষই স্বশিক্ষিত। হরিশ তার প্রোজ্জ্বল উদাহরণ। হরিশের নির্বাচিত রচনাবলীর সম্পাদক নরেশ সেনগুপ্ত লিখেছেন ঃ "For of the little band of earnest men who flourished in the early days of English education in India and helped to drag India out of the slough of ignorance and inertia into which she has fallen, Hurrish chunder was about the foremost."[১৩] ভারতবর্ষের সমূহ পাপ ও অসঙ্গল, কুসংস্কার ও সামাজিক কদাচারকে দূর করার একমাত্র উপায় যে শিক্ষা তা তিনি বহু প্রবন্ধে[১৪] উল্লেখ করেছেন।

ভারতবর্ষে শিক্ষার প্রসার সর্বান্তঃকরণে হরিশ কামনা করেছেন বলেই ইণ্ডিয়ান রিফর্ম লীগের কর্তাদের 'Don't educate the natives'[১৫] শ্লোগানকে তীক্ষ্ম সমালোচনা করেছেন, অন্যদিকে তেমনি চার্লস উডের 'এডুকেশন ডেসপ্যাচ' বা শিক্ষাবিষয়ক অনুশাসনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এই অনুশাসনে শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের উদ্দেশ্যে নিম্ন প্রস্তাবগুলি করা হয় ঃ[১৬]

১ শিক্ষার জন্য পৃথক শাসন বিভাগের সৃষ্টি,

২. কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা,

৩. সকল শ্রেণীর বিদ্যালয়ের শিক্ষকের শিক্ষার নিমিত্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন,

৪ বর্তমানে যে সকল সরকারী স্কুল ও কলেজ আছে তার পরিচালনায় সুব্যবস্থা ও প্রয়োজনানুসারে তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি,

৫. নতুন নতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন,

৬. প্রাথমিক শিক্ষার পাঠশালার সংস্কার সাধন,

৭, বেসরকারী শিক্ষায়তনে ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে সরকারী সাহায্য দান,

৮. জীবিকার্জনের উপযোগী কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা,

৯. উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেধাবী ছাত্রদের শিক্ষালাভের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা,

১০ ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা ও মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা,

১১ স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য সরকারী সাহায্য দান,

১২. সরকারী পদে নিয়োগের জন্য শিক্ষার প্রাধান্য স্বীকার।

হরিশ চার্লস উডের প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে একবার যখন দেশীয় মানুষের ইংরাজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে তখন তা পূর্ণ করার দায়িত্বও ইংরেজ শাসকদের, "The desire for a high English education, being thus created, the means of its attainment must also be furnished. It is the natives with a high English education who are to receive the first impulse of European instruction, to act as the medium of Communication between the nation and its educators, to be eventually the most active agents in the work, to raise the standard of national culture, to implant in the heart of native society seeds of national progression. Viewed in this light, the cost of rearing the few young natives annually turned out with a high English education by the government colleges. high though it be—sixty rupees each per month as it has been accurately calculated appears to greater than the nation ought to incur."[১৭]

কিন্তু প্রস্তাব ভালো হলেও এ প্রস্তাব যে সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হবে অথবা শাসকের যে সত্যকারের সদিচ্ছা আছে—সে ক্ষেত্রে সর্বাংশে সন্দেহমুক্ত হতে পারেন নি হরিশ। পারেন নি বলেই প্রশ্ন তুলেছেন :

"The question then is, is the Government of India satisfied with the existing state of knowledge among the people and willing to circumscribe it to the limit within which it has hitherto ranged? Or does it feel its mission to be to introduce in these vast regions and amongst this intellectual people the knowledge and the civilization of Europe? Until the educational despatch of 1854 is recalled or cancelled, we shall accept that authority, and believe that the Government of India really wishes the people of India to share in intellectual advancement of the empire."[১৮]

তাঁর সন্দেহকে আরো দৃঢ় করেছে শিক্ষার্থীর মাইনে বৃদ্ধি। তিনি বলেছেন যে স্কটল্যাণ্ড ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন দেশে শিক্ষার এমন বিপুল ব্যয়ভার নেই। কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ, সরকারী স্কুল ও এমনকি বেসরকারী

স্কুলের ছাত্ররা এই বিপুল ব্যয়ভারে পীড়িত। সুতরাং উডের ডেসপ্যাচ কতখানি কার্যকরী হবে তা সন্দেহের বিষয়ঃ

"We have said that the doctrine enunciated in the Education Despatch is a most sound one. But in its practical application, as in that of other theoretical doctrines regard must be had to existing circumstances. It is one of those abstract propositions which should form the basis of systems not their superstructure. It is the like doctrine of perpetual motion in mechanics, which no philosopher will deny, yet no machinist may act upon in its purity. It is like the maxims of politics that the end of all government is to fit a people for self-government, a maxim valuable while it lends its spirit to public measures, but simply anarchical if reduced without modification into practice."[১৯]

দেশব্যাপী শিক্ষাবিস্তারের আকাংখা হরিশ পোষণ করলেও, এবং জাতীয় শিক্ষার (Education National প্রবন্ধে বলেছেন—"It is in this view alone that national instruction is held to be a branch of Government in India" ইত্যাদি) গুরুত্ব উপলব্ধি করলেও বাস্তব কারণে শিক্ষাচিন্তাকে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন। এ ক্ষেত্রে হরিশের চিন্তার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের চিন্তার সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।[২০] তৎকালীন ছোটলাটের জিজ্ঞাসার উত্তরে ১৮৫৯ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখের এক পত্রে বিদ্যাসাগর লেখেনঃ "At the best, if not the only practicable means of promoting education in Bengal, the Government should, in my humble opinion, confine itself to the education of the higher classes on a comprehensive scale···To educate a whole people is certainly very desirable, but this is a task which, it is doubtful, whether any Government can undertake or fulfil."[২১]

হরিশচন্দ্র জাতীয় শিক্ষার পাঁচটি পথের কথা বলেছেনঃ

১. বাংলা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা—কেন্দ্রীয় কলেজ ও জেলা স্কুলগুলির মাধ্যমে,

২. উত্তরাঞ্চলের শিক্ষাব্যবস্থা—জেলা তহশিলদারী ও গ্রাম স্কুলগুলির মাধ্যমে,

৩. মিশনারী স্কুলগুলির মাধ্যমে,

৪. পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি জেলার জনপ্রিয় শিক্ষার মাধ্যমে,

৫. জনগণকে স্বশিক্ষায় প্রবৃত্ত হবার উৎসাহ দানের মাধ্যমে।

হরিশ লিখেছেন : "But how to do it, or rather how to set about it is the question. A hundred and fifty millions cannot be put in school at once. There must be a beginning. (The present minister of education in Bengal thinks there must be an end too and has been snubbed for so telling his government, who are as clearly in the wrong there as when they got the Chowkeedaree Act passed). Well begun is half done. There are a few tangible propositions put forward from time to time on this subject. We shall note down those most often urged. 1st. To extend the Bengal system of central colleges and zillah schools for imparting instruction chiefly through the medium of English language. 2nd. to extend the system in force in the upper provinces before, of zillah, tehsildary and village schools, which imparted instruction principally through the vernacular. 3rd, To subsidize Missionary schools. 4th. To begin with an elaborately constructed system of popular instruction in some limited district and after such district has been educated to perfection to transfer the machinery to the next until the whole area of the country is swept over something after the fashion of the trigonometrical survey. 5th. To encourage by direct grants of money spontaneous efforts of the people to educate themselves"[২২]

বাংলায় প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সুফলের যে সব দিক তিনি উল্লেখ করেছেন সেগুলি হল :

১. উচ্চশ্রেণীর শিক্ষার প্রভাব নিম্ন শ্রেণীর উপর বর্তেছে,

২. নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার আগ্রহের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে।

The benefits of Bengal system of public instruction have been confined to the upper classes alone, and in no other part of India is the influence of the upper over the lower classes so potent as in Bengal. Hence the enlightenment of the upper classes in Bngal has tended more to the enlightenment of the upper classes below them than effects of education directed to that special purpose could have effected. It is not the numerous schools for popular instruction founded by Zemindars in Bengal that we allude to. We attach far greater importance to the force of opinion, and the unper-

ceived, but pervading force of the example which the conduct to the upper classes never fails to exhibit to the lower. No Bengalee peasant shares the delusion that the British Government in India is determind to make Christian by force and fraud of all the natives of the country. No Bengalee artificer on the other hand feels less than the British Indian Association that the Chowkeedaree Act is a piece of tyranny."[২৩]

বিদ্যাসাগরের উপরে উদ্ধৃত কথাগুলির পাশাপাশি হরিশের নিম্ন বক্তব্য রাখলে বোঝা যাবে উভয়ের মধ্যে চিন্তাগত ঐক্য ছিল। হরিশ লিখছেন: We-have not the means of giving proper instruction education as distinguished from a knowledge of reading, writing and arithemetic—to every class in the country. That requires an amount of resources which India is yet far from yielding. Necessity compels us to content ourselves with taking care of class. What class shall that be we should declare and decide."[২৪]

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে হরিশের চিন্তাগত ঐক্য দেখা গেলেও একটি ক্ষেত্রে গুরুতর অনৈক্য আছে। অন্তত একটি প্রবন্ধে বেশ চড়া গলায়, যুক্তিজাল বিস্তার করে হরিশ বলেছেন যে ভারতবাসীকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করা প্রয়োজন এই কারণেই যে এর ফলেই ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি পোক্ত হবে। প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিতে হরিশ তাঁর বক্তব্যকে বেশ হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন:

ভারতে বৃটেন কিসেব জন্য রয়েছে?

নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের জন্য।

কোন্ উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রণ ও শাসন?

সভ্যতার আলোকে আলোকিত করার জন্য।

সেজন্য প্রাথমিক প্রয়োজন কিসের?

ভারতে বৃটিশ শক্তির স্থায়িত্ব ও শক্ত প্রতিষ্ঠাভূমির।

স্থায়িত্ব কিসের উপর নির্ভরশীল?

ভারতীয় জনগণের সন্তোষের উপর।

সন্তোষ কিভাবে আসবে?

প্রকৃত ও পর্যাপ্ত শিক্ষা থেকে।

হরিশ নিজ বক্তব্যের সমর্থনে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের সরকারের শিক্ষানীতির ব্যর্থতা ও তার মারাত্মক ফলাফলের কথা উল্লেখ করেছেন:

"And first, an essential requisite to the attainment of the object proposed is the stability of the British power in India. In no other capacity than as the political ruler of the Indian

nations can Great Britain realize the end in view ; and she must act long, aye, for centuries before the end is realized. The first maxim of British Indian policy therefore is that British powet in India must be placed on a footing of the greatest possible security. All that compromises that security is inconsistent with the great theory. Secondly, the chief element of security is the contentment of the people. If that be distrubed or diminished the security proportionately diminishes. It is easier to extirpate than to maintain dominion for a long period over a nation universally hostile. The second maxim of British policy in India therefore should be that no measure however consonant to what are called enlightened principles of legislation and government should be enacted which is likely to produce extensive discontent. It is against this second maxim that the educational measures of the North-Western Provinces government for the last ten years have systematically and griyevousl offended. of the sum total of discontent which the rebellion in those provinces has disclosed a large portion was the result of those measures."[২৫]

রাজনৈতিক চিন্তার দৈন্য ও স্ববিরোধিতা থেকে হরিশের শিক্ষাচিন্তায় বৃটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন এসেছে। তথাপি তাঁর শিক্ষাচিন্তায় দুটি গুরুত্ব-পূর্ণ উপাদান উত্তরকালের ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেছে।

ক] হরিশ বাস্তবমুখী শিক্ষার কথা বলেছেন। প্রুশীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে ভারতীয় শিক্ষানীতির তুলনা করে তিনি ভারতীয় শিক্ষানীতির ত্রুটি সন্ধান করেছেন। তাঁর মতে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, আড়ম্বর করা হচ্ছে, তবু বাস্তবমুখী শিক্ষা কই? কই রাজনৈতিক শিক্ষা?

"State education in India, so far as it has hitherto proceeded, has been grandly defective in this very respect. Schools and colleges have been established, learning has been encouraged, and the intense ardour which has been the fashion of late to display in behalf of popular education is certainly not meant to deceive. But political education, the education derived from newspapers, at public meetings, in the jury box, in deliberative assemblies, in offices of trust and responsibility is unattainable to every class of our

countrymen. The consequences have been as might be conceived. With the exception of those engaged in the exciting profession of commerce and the law, the upper class in the metropolis displays the most pitiable condition to which intelligent human nature can be reduced."[২৬]

খ) হরিশ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে ঊনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশ চল্লিশের দশক থেকেই সচেতনতা জাগতে শুরু করে। লর্ড বেণ্টিঙ্কের শিক্ষানীতি বাংলাভাষা মাধ্যমের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। অভিজাত নাগরিক শ্রেণীর মানুষ ও নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাত্ররা শহরের বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষা নিয়ে সরকারী চাকুরিতে যোগ দিয়ে নতুন আমলাশ্রেণীতে পরিণত হচ্ছিল। ফলে নবশিক্ষিত শ্রেণীর সঙ্গে সাধারণ মানুষের বৈষম্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছিল।[২৭]

এই রকম বৈষম্যের প্রতিবাদ ও বাংলা ভাষায় শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন সেকালের সংবাদপত্রগুলির লেখক ও সম্পাদকেরা।

'সংবাদ প্রভাকর' লিখেছে—"রাজপুরুষেরা সমুদয় বিচারালয়ে বঙ্গভাষা ব্যবহৃত হইবার অনুমতি দিয়াছেন বটে, কিন্তু বঙ্গভাষার উন্নতি বিষয়ে তাঁহাদিগের কিছুমাত্র যত্ন দেখি না. তাঁহারা এই দেশে ইংরাজী ভাষা প্রচারের নিমিত্ত বিবিধ প্রকার বিদ্যালয় ও পুস্তকালয়, স্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গভাষার প্রাচুর্যার্থ অল্প ব্যয়ও করিতে পারেন না।"[২৮]

'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' মন্তব্য করে: "এ দেশের লোকদিগকে সভ্য করিতে হইলে এ দেশের ভাষা আলোচনা করা অতি কর্তব্য। ছাত্রেরা মাতৃক্রোড়াবধি যে ভাষা ব্যবহার করিয়া আসিতেছে এবং যদ্দারা মনের তাবৎ ভাব অনায়াসে প্রকাশ করিতে পারে সেই ভাষায় শিক্ষাদানের নিয়ম করিলেই তাহাদিগের মানসান্ধকার দূর হইবেক।"[২৯]

'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় লেখা হয়: "বর্তমান সময়ে বঙ্গদেশে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষার চর্চা একসঙ্গে চলিতেছে। কিন্তু ইংরাজী ভাষার যেরূপ আত্যন্তিক চর্চা ও অনুশীলন হইতেছে তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে. ইংরাজী ভাষা বঙ্গভাষার উন্নতির বিশেষ হানিকর হইতেছে এবং ঐ ভাষায় প্রতিভাসম্পন্ন লেখক উদিত হইবার পক্ষে ব্যাঘাত জানাইতেছে।"[৩০]

'সোমপ্রকাশ' লিখল: "ভাষার উন্নতিই মানুষের শরীর মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের উন্নতির মূল। ভাষার উন্নতি ব্যতিরেকে ধর্ম, ধর্মনীতি, স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি কোন গুণই বিশুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। ভাষার যে এত গুণ আছে, সাধারণ লোকে তাহা বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা আপাত ফল দর্শনে মোহিত হন। মোহিত হইয়াই অনেকে বাঙ্গলা ভাষায় একান্ত উপেক্ষা করিয়া স্ব স্ব সন্তানদিগকে একবালে ইংরাজীতে হাতে খড়ি দিয়া থাকেন। এটী বাঙ্গলাদেশের অদৃষ্টের সামান্য বিড়ম্বনা নয়।"[৩১]

হরিশচন্দ্রও লক্ষ্য করেছিলেন ঃ

১. ইংরাজী ভাষার উপর অতিরিক্ত গুরুত্বারোপের ফলে জাতীয় উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে,

২. মাতৃভাষাই উন্নতির সোপান—পৃথিবীর ইতিহাসেই তার প্রমাণ আছে। তাই তাঁর প্রস্তাব ঃ

১ পাশ্চাত্য চিন্তা, দর্শন ও বিজ্ঞান মাতৃভাষার মাধ্যমেই আয়ত্ত করার চেষ্টা হোক,

২ ইংরাজী না-জানা ও ইংরাজী জানা—এই দুই সম্প্রদায়ের বৈষম্য দূরীভূত হোক,

৩. মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ পরে বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করার পক্ষেও সুফলপ্রদ হবে।

মাতৃভাষার পক্ষে অত্যন্ত জোরালো যুক্তি উত্থাপন করে, ডি মর্গান ও ড. স্পেঙ্গার প্রমুখের বক্তব্য উদ্ধৃত করে হরিশচন্দ্র লিখলেন ঃ

"The vernacular languages also have fared no better at the hands of the public, though their uses are quite palpable. With regard to this question they have raked up a principle, which is entitled to some consideration. They believe in the difficulty of educating the vast conglomerations of Indian nations in a foreign language widely different from theirs, but they maintain that unless an unifomity of language is established no homogeneousness can be attainded among them. And this section measures the utility of the English in as much as it is calculated to cement more firmly than ever the affections of the people to their rulers. But this is a descent into the depth of which we fail to penetrate. The real object of the Indo-Europeans is the national degradation of the people, and they have not miscalculated the chances of the English language effecting it. It is, however, not so much the English becoming the medium of popular instruction as becoming the language of communication in all State matters and Law Courts for which these men contend. That their opinion involves a transparent fallacy they do not condescend to see. It is indeed impossible to make the English language for the ordinary transactions of the people, without making it like their mother tongue equally familiar to them. The Romans failed

though their civilization centred in cities and boroughs. And history records no other instance of sush success. Even Mahomedans than whom no nation had, or have become so assimilated in thoughts, habits and feelings with the Hindus, have not succeeded. And the British, whose civilization and teachings distinguish the masses, can scarcely hope to achieve such a revolution. The Court of Directors in their able document above referred to have magnanimously acknowledged the difficulties. we are of course aware of the good results of instructions carried on in English, and believe that a thorough diffusion of it will further the cause of Indian progress infinitely better than any other conceivable agency bearing on popular interests. But we must bear in mind that English education, unless of a high order, is fraught with danger If the position of Bengal under English education encourages the promoters of the English language as an instrument of popular instruction, they should not forget that an elementary education would not achieve the results so much coveted. 'The Friend of India' raises a pert question, "which is most convincing, the Hindu Patriot or the Bhaskur", and arrives at a conclusion complaisant to our self-esteem. Bnt let the Friend consider whether a smattering of knowledge acquired through the English language would make us so acceptable or convincing as the Bhaskur with his reputed Sanskrit attainments has failed to be We therefore maintain that when the people cannot receive and the State cannot grant them a high English education, it is better that the wise policy of the Directors should be adhered to. Let them imbibe English thoughts, and the leading facts of the European sciences and philosophy, but think and write in their own dialects. Indeed all thinkers on the national advancement of any country will admit that neither its natural resources, power, nor greatness can be promoted or confirmed without a respectable national literature Dr. Sprenger very justly remarks that no nation has ever been great with locked science in a dead or

foreign language. And the neat mathematician De Morgan, in a laudatory letter to Professor Ramchunder of Delhi College on his high Scientific acquirements, writes, "Rely on it, that it is in the native tongue of the country that the sciences must be really and effectually taught to the people." This worthy object can only be attained by a simultaneous study of the Sanskrit and Vernacular languages of the country ; and any measure calculated to thwart it will be postponing the better day of India. Of course the court jargon of the present day is far from easy, agreeable or useful, and good sense and good taste, combined with a steady resolution on the part of the Government, will reform it. We are also of opinion that the advance of the Vernacular literature seconded by an extensive diffusion of popular instruction will necessarily introduce improvements into the language now used in Law Courts and in law matters in our country. But the conversion of the English into the language of the Indian Courts will serve only to give the penniless European sauntering in this country a hold on the ladder of office. We have reasons to believe that an organized effort is being made to accomplish this object, and we would warn our rulers against the selfish calculations of a few interested Europeans."[৩২]

মাতৃভাষা চর্চার সঙ্গে সঙ্গে হরিশ অবশ্য সংস্কৃত ভাষা চর্চার গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে ময়ূরপুচ্ছধারী কাক হতে গিয়ে আমরা ময়ূরও হতে পারিনি, কাকও হইনি। হরিশের মতে সংস্কৃত সুপ্রাচীন ঐতিহ্যশালী ভাষা। বিদেশী পণ্ডিতরাও স্বীকার করেছেন যে সংস্কৃত হল প্রাচ্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ভাষা। তাছাড়া সংস্কৃত, হরিশের মতে ভারতীয় ভাষার জননী। সংস্কৃত ভাষাচর্চার উন্নতিকল্পে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন তিনি।[৩৩]

শিক্ষায় ভাষার স্থান যে গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি হরিশের ছিল। তার প্রমাণ 'The necessity of a language for India' প্রবন্ধটি।[৩৪]

তিনি বলেছেন যে রীতিনীতি বা প্রথার মত ভাষাও একটা জাতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।—"Language, more than custom or anything else, is the most distinguishing characteristic of a nation, and cons-

titutes the touchstone by means of which a countryman may be known even in a foreign land "

ভাষার একটা ঐক্যবিধায়ক শক্তি আছে। কিন্তু ভারতের বহুবিধ উপভাষা বিনষ্ট করে তার সংহতিকে। এই বিরাট দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষাগত প্রভেদ এত প্রকট যে এর ফলে জাতিবৈরও উদ্ভূত হচ্ছে। ভারতীয় হিন্দু জাতির উদ্ভবের উৎস এক হলেও মাদ্রাজী ও হিন্দুস্তানীর মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদের রেখা রয়ে গেছে। হরিশ লিখেছেন—"But the twenty dialects which have since superseded the Sanskrit have had the effect of making strangers of one's own countrymen owing to these lingual difference. So great has been the estrangement between the different sections of the Hindu nation that a sort of antipathy, of bitter repugnance, of 'antagonism of race', if we may call it, is manifested towards each other."

ভাষাগত এই পার্থক্যের জন্য হরিশের ক্ষোভের কারণ আছে। তিনি সমগ্র দেশের রাজনৈতিক সংহতি চান। ভাষাগত বৈচিত্র্য সেক্ষেত্রে বাধা—"It is a deplorable fact that were it necessary to rouse the Indian population to any united movement, whether social or political, it cannot be done except with the aid of twenty different tongues."

ভারতবর্ষের একটি সাধারণ ভাষার প্রয়োজনীয়তা হরিশ অনুভব করেছিলেন। তাঁর মতে দেশপ্রেমিকের মহান কর্তব্য হল সেই সাধারণ ভাষার সূত্রসন্ধান। হরিশ লিখেছেন—"To call the Bengalee, the Oriah and Guzeratee languages, as we have of late been accustomed to hear them called, is as wretched a perversion of the meaning of words as to argue that a part is equal to the whole is a perversion of reasoning. In fact we have only dialects without number. The work of patriots and philanthropic statesman therefore lies clear. They should join in supplying for India a much needed want ; they should give her a language."

টীকা

১. Selections from the writings of Hurrish Mookerji P. 322-8.

২. India in Bondage গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। বর্তমান লেখকের 'সাণ্ডারল্যাণ্ড ও শৃঙ্খলিত ভারত' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৩. আলেকজাণ্ডার ডাফ ও অনুগামী কয়েকজন। অশোক রায়।
সংবাদপত্রে সেকালের কথা গ্রন্থটিও দ্রষ্টব্য।

৪. Selections···P. 328-31

৫, এই ধারাটি যে শেষ পর্যন্ত বহমান ছিল তার প্রমাণ 'Mother India'র লেখিকা মিস মেয়ো প্রমুখের বক্তব্য।

৬, নিরপেক্ষ বিদেশীরাও সে কথা স্বীকার করেছেন। সাণ্ডারল্যাণ্ড লিখেছেন—"In having serious social evils to contend with, India is simply like all other nations. Probably her social evils are no more numerous and no worse than were those of Europe or America a hundred years ago. Any of us who are disposed to look down on her because of her supposed inferiority or our supposed superiority in these respects may well turn our thought to the past of our western nations and call to our mind our own terrible social and other evils and crimes." (India in Bondage P. 245)

৭' A plea for Caste (selections...) P. 316

৮, Caste: Its attribute and history (Do). P. 318

৯, Do. (Do) P. 318-9

১০, Divisions in Hindoo Society (Do). P. 313-4

১১. Do. P. 313.

১২. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত, ১৯১০ সালে প্রকাশিত 'Selections from the writings of Hurrish Chunder Mookerji' গ্রন্থ থেকে।

১৩. ঐ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখিত ভূমিকা।

১৪. যেমন The loyal meeting and address প্রবন্ধে (Selections P. 147)।

১৫, Lord Ellenborough on education, (Selections...P. 349,)

১৬. ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের বাংলা দেশের ইতিহাস (আধুনিক) পৃঃ ১০১

১৭. Matters educational (Selections...P. 345,)

১৮. Do, পৃঃ 344,

১৯. Do, Do

২০, বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর, খোন্দকার সিরাজুল হক, পাণ্ডুলিপি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮০, পৃঃ ৮৮.

২১, Do, Do

২২. Educational—National. (selections···P. 352.)

২৩. Do, Do

২৪. Lord Ellenborough on education, Do, পৃঃ 350.

২৫, Our Educational policy. Do. পৃঃ 346.

২৬. National Education. Do, পৃ. 353-9.

২৭. বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালীর নবজাগরণ। ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ১৭৭.

২৮. সংবাদ প্রভাকর, ৫/৪/১৮৪৮,

২৯. বেঙ্গল স্পেকটেটর. ৯/৮/১৮৪৩.

৩০, তত্ত্ববোধিনী। কার্ত্তিক, ১৮০১ শক,

৩১. সোমপ্রকাশ। ১২ই ভাদ্র, ১২৭১.

৩২ The Sanskrit and Vernacular Languages (Selections.. P. 341-3.)

৩৩. Do, Do, P, 340.

৩৫. Do, P XVIII

একাদশ অধ্যায়

নীলবিদ্রোহ ও হরিশচন্দ্র

ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লবের পরে বস্ত্র শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নীলের চাহিদা বেড়ে যায়। ইংরেজরা ভারতবর্ষে—বাংলাদেশে নীলচাষ শুরু করে এই চাহিদা থেকেই। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রপ্তানি কারবারে একসময় নীল ছিল প্রধান দ্রব্য। পরে কোম্পানি ইউরোপীয় বণিকদের হাতে নীলের ব্যবস্থা ছেড়ে দেয়।[১] বাংলার উর্বর ভূমিতে সুলভ চাষী এবং সুলভ মজুরীর সাহায্যে খাদ্য ফসলের পরিবর্তে বাণিজ্য ফসল উৎপাদিত হলে বিপুললাভের সম্ভাবনা ইংরেজ বণিকদের এ বিষয়ে আকৃষ্ট করে এবং এর থেকে নীলচাষ শুরু হয়।[২] দুটি ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে নীলচাষ শুরু হয়। নিজ আবাদি প্রথায় নীলকর সাহেবরা নিজেদের জমিতে আপনার খরচে ও আপন তত্ত্বাবধানে নীলচাষ করাতেন। দ্বিতীয়তঃ, রায়তী প্রথায় নীলকরেরা চাষীদের চুক্তিতে আবদ্ধ করে তাদের দ্বারা জমিতে নীল চাষ করাতেন। চুক্তি অনুযায়ী চাষীকে দাদন অর্থাৎ অগ্রিম কিছু টাকা দেওয়া হত এবং উৎপন্ন নীলের দাম কি হারে চাষী লাভ করবে তারও উল্লেখ থাকত। যে হারে চাষীদের নীলের মূল্য দেওয়া হত তা বাজার দরের চেয়ে অনেক কম ছিল। এর থেকে আবার বীজের দাম, চুক্তিপত্রের স্ট্যাম্প-এর মূল্য, গাড়ী ভাড়া ইত্যাদি বাবদ টাকা কেটে রাখা হত। নীলকুঠীর নায়েব, গোমস্তা এবং পাইকরাও চাষীদের কাছ থেকে বখশিস আদায় করত। নীল ওজন করার সময়েও চাষীদের ঠকানো হতো। উৎকৃষ্ট জমিগুলিতে চাষীদের নীলচাষ করতে হতো। চুক্তির শর্তানুযায়ী উৎপন্ন নীলের মূল্য হতে দাদনের টাকা কেটে রাখার নির্দেশ ছিল। যে সকল চাষীর উৎপন্ন নীলের মূল্য থেকে দাদনের টাকা শোধ হত না তাদের আগামী প্রতি বৎসর নীলচাষ করে সেই টাকা শোধ করতে হত।[৩] ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রায়তদের উপর নীলকরদের অত্যাচার যে হয় নি তা নয়। এই সময়ের মধ্যে লাঠিয়াল এবং পাইক বরকন্দাজের সাহায্যে নীলচাষে অনিচ্ছুক চাষীদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, গরুবাছুর কেড়ে নেওয়া, নীলকুঠিতে আটকে রাখা, কৃষকরমণীদের উপর অত্যাচার, বেত্রাঘাত প্রভৃতি শারীরিক দণ্ড বিধানের বিক্ষিপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮১০ সালে নীলকরদের এইসব অত্যাচার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বাধ্য হয়ে বাংলা সরকার ১৮১০ সালে ৪ জন নীলকরের ব্যবসার লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করে। ঐ বছরে প্রচারিত একটি সার্কুলারে নীলকরদের দ্বারা অনুষ্ঠিত নিম্নলিখিত অনাচারগুলির উল্লেখ রয়েছে—(ক) কুঠিয়াল কর্তৃক অবলম্বিত নিষ্ঠুর পন্থা যা রায়তদের মৃত্যু

আহ্বান করে আনে। (খ) কুঠিয়ালদের নিজস্ব কয়েদখানায় বেআইনিভাবে রায়তদের আটক রাখা। (গ) শ্যামচাঁদ নামে পরিচিত বেত্রের আঘাত। (ঘ) লাঠিয়াল নিযুক্ত করে প্রজাদের ভীতি প্রদর্শন।[৪]

এইসব অত্যাচার সত্ত্বেও এই সময়ে কৃষকরা নীলকরদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয় নি। হয়ত তার প্রধান কারণ এ সময় দেশীয় জমিদারবর্গের সঙ্গে নীলকরদের আঁতাত ও সহযোগিতা। শ্রীচিত্তব্রত পালিত বলেছেন "At the initial stage, they entered into a collaboration with landlords for a foothold in the interior by paying large premia and high rent and forming a political alliance with them against Government measures like land resumption."[৫] তবে শ্রী পালিত একথাও স্বীকার করেছেন যে, "The period of collaboration was not a picture of perfect harmony, followed by that of complete disharmony. It is also arbitarary to say that collaboration ended at a point and confrontation succeeded it immediately. one might have such an idea from the chapter that follows dealing primarily with confrontation alone. They, in fact, overlapped before one had receded, the other came upon it like waves upon waves. • The hostilites around 1830 remained a sharp under-current while collaboration was the stronger tide in the period, 1843-45. Again, even before collaboration had spent itself, new grounds of hostility are into the period of harmony."[৬].

নীলকরদের সঙ্গে জমিদারদের সংযুক্তি কিংবা কৃষকদের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ আন্দোলনের অভাব যে কারণেই হোক না কেন নীলের চাষ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮১৯-২০ হতে ১৮২৬-২৭ সালের মধ্যে কোম্পানি বছরে প্রায় ১০—১২ লক্ষ টাকা লাভ করে। নদীয়া, যশোর, বর্ধমান, মেদিনীপুর, বীরভূম, হাওড়া, হুগলী, প্রভৃতি জায়গায় ব্যাপকভাবে নীলচাষ আরম্ভ হয়।[৭]

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সূত্রপাত থেকে কিন্তু দেশীয় জমিদারদের সঙ্গে নীলকরদের সংঘর্ষ শুরু হয়। এই সংঘর্ষের ফলে এবং অন্যান্য কারণে নীলকররা দ্রুত জনমানসে অপ্রিয় হয়ে পড়ে, কৃষকরাও তাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে থাকে। চিত্তব্রত পালিত বলেছেন—"The planters did not attempt capitalist farming by organising the whole process of production. They did not even use their own land on a large scale, not did they employ their own labour. They wanted to manipulate the existing agrarian framework by nominal advances and remained at its mercy. When they outlived

their utility and became a nuisance to the parties constituting that framework, they were expelled by them. Their attempts at agrarian change was half-hearted and could not bring about a substantial material improvement in which the primary producer could have a share. That would have rallied them to their side against the landlords. As that did not happen, the indigenous patrons and clients joined hands to expel the foreign element by what is know as the Blue Munity."[৮]

এইসব কারণে পঞ্চাশের দশকে উৎপাদন দ্রুত কমে যাচ্ছিল। নিচে নীল-চাষের প্রধান দুটি কেন্দ্র কৃষ্ণনগর এবং যশোরের নীল উৎপাদনের (মণ হিসাবে) তালিকা প্রদত্ত হচ্ছে :[৯]

সাল	কৃষ্ণনগর	যশোর
১৮৪৯—৫০	১৩৭০২	১৬৮১৮
১৮৫০—৫১	১৮৭১৮	১৫৯৫৫
১৮৫১—৫২	১৫৫২৮	৯৫৭২
১৮৫২—৫৩	১০২৭৬	৯৬৫৪
১৮৫৩—৫৪	১১৩৭৭	৭৮১১
১৮৫৪—৫৫	১১৬৫০	১২৩০৫
১৮৫৫—৫৬	১০৩৬২	৬৫৮৫
১৮৫৬—৫৭	১০২০৫	১০২২৭
১৮৫৭—৫৮	১৩০৮৪	১০৩৫৩
১৮৫৮—৫৯	৮০২৩	৮৬৩৫

মুনাফা যত কমতে লাগল, দেশীয়দের অসন্তোষ যত বাড়তে লাগল নীলকররাও তত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগল। রাজকর্মচারীদের সাহায্যে নীলকররা নিত্যনতুন অত্যাচারে প্রবৃত্ত হতে লাগল। এই সব অত্যাচারের মধ্যে গৃহদাহ, গুমখিরী, বাজারদাহ, নারীনির্যাতন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। জমিদারদের কাছ থেকে জমি পত্তনি কিংবা ক্রয় করার জন্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং অত্যাচার দ্বারা তাঁদের ভীতি প্রদর্শন করা হত, এবং বলপূর্বক তাদের জমি কেড়ে নেওয়া হত। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় এরকম বহু অত্যাচারের বিবরণ প্রকাশিত হয়। ইন্ডিগো কমিশনের রিপোর্টেও এরকম অত্যাচারের বিবরণ কৃষক ও অন্যান্য মানুষেরা দেয়। হরিশচন্দ্রের জীবনচরিতকার রামগোপাল সান্যাল তাঁর হরিশজীবনীতে এরকম কয়েকটি অত্যাচারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। জোরপূর্বক গৃহনষ্টের দৃষ্টান্ত হিসাবে নদীয়া জেলার অন্তর্গত বাগদা থানার খাঁপুর নিবাসী আমির মল্লিকের জবানবন্দী, অন্যায় অবরোধের দৃষ্টান্ত হিসাবে রতনপুর কুঠির নিকট হান্স্রী থানা এলাকায় বারপুর গ্রামের নিবাসী গণি দফাদারের জবানবন্দী এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।[১০]

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করে লিখেছিলেন—"এই বিদ্রোহে রায়তেরা অপরিসীম কষ্ট সহ্য করেছে। তারা প্রহৃত, কারারুদ্ধ অপমানিত, গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়েছে। তাদের সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে, অনেকদিন অনশনে কেটেছে, কল্পনায় যতরকম অত্যাচার সম্ভব তা তাদের কপালে ঘটেছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালান হয়েছে, পুরুষদেব ধরে নিয়ে গিয়েছে, নারীদের চরম লাঞ্ছনা করেছে, ঘরের সঞ্চিত শস্য নষ্ট করা হয়েছে।"[১১] এই সমস্ত অত্যাচারের ফলে প্রতিবাদী আন্দোলনও জোরদার হয়ে উঠতে থাকে। এই আন্দোলনে ভূস্বামীরা যোগ দেবার ফলে আন্দোলন আরো সংগঠিত হয়ে ওঠে। রামগোপাল বাবুর হরিশ জীবনী থেকে জানা যায়, রাণাঘাটের গোপাল পালচৌধুরী, শান্তিপুরের উমেশচন্দ্র বায়, উলার বামনদাস মুখোপাধ্যায় এবং শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, লাটুদহের পরাণ পাল, নড়াইলের রতনবন্ধু, কলকাতার প্রসন্নকুমার ঠাকুর, উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য জমিদারেরা এই নীলবিদ্রোহে সংলিপ্ত হন।[১২]

১৮৫৯-৬০ সালে কেন নীল বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করল তার কারণ নির্দেশ করেছেন তদানীন্তন লেফটন্যান্ট গভর্নর নিজেই। তিনি লিখেছেন যে, এসময়ে পূর্বের অত্যাচার অনাচার তো ছিলই তার উপর নতুন একটি সমস্যার উদ্ভব ঘটে। এই সময়ে প্রতিটি কৃষিজাত দ্রব্যের দাম দ্বিগুণ বর্ধিত হয়েছিল। তাই স্বভাবত নীল চাষের ব্যয়বৃদ্ধিও ঘটল। তাছাড়া নীলচাষেব বাবদ যেটুকু অর্থ আইনত রায়তদের পাওনা হত সেটুকুও তাদের হাতে গিয়ে পৌঁছত না।[১৩] ভারতবন্ধু পাদ্রি লঙ্‌সাহেব নীলবিদ্রোহের নিম্নলিখিত কারণগুলি উল্লেখ করেছেন। (ক) জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি (খ) শ্রমের মূল্যবৃদ্ধি (গ) কৃষকদের প্রতি শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের সহানুভূতি (ঘ) আধুনিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীসঞ্জাত রাজনৈতিক উত্তেজনা।[১৪] শেষের কারণটির দ্বারা সম্ভবত লঙ্‌ সাহেব সিপাহী বিদ্রোহেব প্রভাবের কথাই উল্লেখ করতে চেয়েছিলেন।

সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন যে, সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী ৬০ লক্ষাধিক কৃষক নীলবিদ্রোহে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু এই বিদ্রোহ কেউ সুপরিকল্পিতভাবে সংগঠিত করে নি। নদীয়া, যশোর, খুলনা, চব্বিশ পরগনা প্রভৃতি জেলায় সমগ্র কৃষক জনসাধারণের উপর বহুকালের ঘৃণ্য শোষণ এবং অত্যাচার বিদ্রোহকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছিল। এই বিশাল গণবিদ্রোহকে বাইরের কোন নেতৃত্ব পরিচলেনা করতে আসে নি। বিদ্রোহী কৃষক সমাজের গণনেতৃত্বে এটি সংঘটিত ও পরিচালিত হয়।[১৫] সতীশচন্দ্র মিত্রও লিখেছেন, 'এই বিদ্রোহ স্থানিক বা সাময়িক নহে; যেখানে যতকাল ধরিয়া বিদ্রোহের কারণ বর্তমান ছিল সেখানে ততকাল ধরিয়া গোলমাল চালিয়াছিল। উহার নিমিত্ত যে কত গ্রাম্যবীর ও নেতার উদয় হইয়াছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহাদের নাম নাই।"[১৬] পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত, নির্মল সিংহ কর্তৃক সম্পাদিত **Freedom Movement in Bengal (1818-1904)** গ্রন্থে নীল বিদ্রোহের

বীরদের যে তালিকা দেওয়া আছে সেটি উদ্ধৃত হচ্ছে : মদনমোহন বসু, নফর দাস, সিরাজ বিশ্বাস, দীনু মণ্ডল, জমির মণ্ডল, দুঃখীশেখ, হাজিমল্লা, পুলিন মণ্ডল, ভিখু মণ্ডল, জহুরুন মণ্ডল, আলম বিশ্বাস, ইসলাম মণ্ডল, মাণিক শেখ গদু বিশ্বাস, কাদির বিশ্বাস, আবু জোদ্দার, বারসাৎ উল্লাস, ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরী, আমির বিশ্বাস, আদুম মণ্ডল, যদু বিশ্বাস, বিশ্বনাথ ঘোষ, তিলক প্রামাণিক, মিনু শেখ, সাবির বিশ্বাস, মিরজা মণ্ডল, দুধু মল্লিক, সাদু শেখ, রামচরণ বিশ্বাস, চৈতন মণ্ডল, করিম বিশ্বাস, মন্দারি বিশ্বাস, বুদুন মণ্ডল, নুসি জোরদার, জালাল মল্লিক, জিরাবাদি কারিগড়, পাজু মল্লা, অনাদি কুলহু, আস্তুল মণ্ডল, সিকেন্দর মণ্ডল, জয়চাঁদ পাল চৌধুরী, বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী, মুন্সী হোসেন, মহেশচন্দ্র চ্যাটার্জী, গোপাল পালচৌধুরী, প্রাণকৃষ্ণ পালচৌধুরী, জয়কৃষ্ণ মুখার্জী, উমেশচন্দ্র রায়, গিরিশচন্দ্র বসু, হরিশচন্দ্র মুখার্জী, জিষু চ্যাটার্জী, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস, দিগম্বর বিশ্বাস, মথুরানাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীহরি রায়, বঙ্কুবিহারী মিত্র, কেদারনাথ ঘোষ, আশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রকুমার রায়, যদুনাথ মজুমদার ইত্যাদি।[১৭] সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন যে, নীল বিদ্রোহে বিশুচরণ বিশ্বাস, দিগম্বর বিশ্বাস, শিশিরকুমার ঘোষ, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তৎকালীন মধ্যশ্রেণীর কতিপয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মানবতাবোধের প্রেরণায় বিদ্রোহী কৃষকদের পাশে দণ্ডায়মান থেকে বিদ্রোহে সহায়তা দান করেন।

নীলবিদ্রোহে হরিশচন্দ্রের যে ভূমিকা পালন করেন তা বিশ্লেষণ করলে নিম্ন উপাদানগুলি পাওয়া যায়—

ক. নীলচাষীদের আশ্রয়, উপদেশ ও পরামর্শ দান,

খ. 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় নানা সংবাদ প্রকাশ,

গ. নীলকরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য 'গ্রাম বাংলার শিক্ষিত সাংবাদিক বাহিনী' গঠন, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনকে এ বিষয় সক্রিয় রাখা,

ঘ. নিজস্ব রচনাদি মাধ্যমে নীলচাষের স্বরূপ উদঘাটন।

ঙ. নীল কমিশনে সাক্ষ্য দান,

চ. শেষ পর্যন্ত বিপর্যয় ও মৃত্যুবরণ।

দৈহিক ও আর্থিক দিক থেকে হরিশ আপ্রাণ সাহায্য করেছিলেন নীলচাষীদের। তাঁর জীবনচরিতকার রামগোপাল সান্যাল লিখেছেন যে নীলবিদ্রোহের সময় তাঁর ভবানীপুরের গৃহ নীলরায়তের ধর্মশালায় (—"His house at Bhowanipur became an asylum for them") পরিণত হয়। তিনি নীলরায়তদের দরখাস্ত লিখে দিতেন, আহার দিতেন, বন্ধুত্বমূলক আচরণ করতেন।[১৮]

সতীশচন্দ্র মিত্র লিখেছেন, "তিনি শুধু সম্পাদকতা করিতেন না, রোমান ট্রিবিউনের মত তাঁহার গৃহদ্বার সর্বদা অনর্গল থাকিত, সে গৃহপ্রাঙ্গণ নিত্য অসংখ্য

নীলকরপীড়িত রাইয়তের অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইত। তিনি উহাদিগকে আশ্রয় দিতেন, অন্নদান করিতেন।"[১৯]

নীলবিদ্রোহের সময় হরিশের অমানুষিক পরিশ্রমের বর্ণনা পাওয়া যাবে শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনায়—"সে সময় যাঁহারা হরিশের দুরন্ত পরিশ্রম দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, রাত্রির কয়েক ঘণ্টা কাল ব্যতীত হরিশের আর বিশ্রাম ছিল না। একে 'প্যাটিয়ট' পত্রিকার সম্পাদকতার কাজ, সেজন্য তাঁহাকে রাশি রাশি সংবাদপত্র পড়িতে হইত ও প্রবন্ধাদি লিখিতে হইত, তদুপরি দিবারাত্রি নীলকর প্রপীড়িত প্রজাবৃন্দের সমাগম। তাঁহার ভবন সর্বদা লোকারণ্য থাকিত। কাহারও দরখাস্ত লিখিয়া দিতে হইতেছে, কাহাকেও উকীলের নিকট সুপারিশ চিঠি লিখিয়া দিতে হইতেছে, কাহারও মোকদ্দমার হাল শুনিতে হইতেছে;— বিশ্রাম নাই।"[২০]

নীল কমিশনে সাক্ষ্য দেবার সময় হরিশ নিজেই স্বীকার করেছেন যে তাঁর কাছে নানান মানুষ আসত পরামর্শের জন্য।[২১] নীল কমিশনের সামনে নদীয়ার জেলাশাসক হার্সলেও বলেছিলেন—"I have heard that they used to go to the Editor of the Hindoo Patriot ; and the ryots, in the case which I referred to before admitted the fact."[২২]

হরিশের বাড়ী যেমন হয়ে উঠেছিল নীলরায়তদের ধর্মশালা তেমনি তাঁর কাগজও হয়ে উঠেছিল নীলবিদ্রোহের মুখপত্র। এ সম্পর্কে বহু চিঠিপত্র ও সংবাদ প্রকাশিত হত 'হিন্দু পেট্রিয়টে'।

উপযুক্ত সংবাদেব জন্য উপযুক্ত সাংবাদিক চাই। সরজমিনে থেকে যাঁরা ঘটনার সজীব বিবরণ দিতে পারবেন। হরিশচন্দ্র—"নীলকরদেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণায় অবতীর্ণ হয়ে গ্রামবাংলার শিক্ষিত সাংবাদিক বাহিনী গঠন করেছিলেন। ইতিপূর্বে সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার ঈশ্বরগুপ্তও নানা স্থান থেকে লোকমারফৎ সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করতেন। মেদিনীপুরে কর্মরত রাজনারায়ণ বসুকে নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সংবাদ সংগ্রহ করে প্রভাকরে পাঠানোর অনুরোধ জানিয়েছিলেন। হরিশচন্দ্রের প্যাট্রিয়ট পত্রিকাকে আশ্রয় করে গ্রামবাংলার যে সাংবাদিকদল গঠিত হয়েছিল তার মধ্যে ছিলেন যশোহরের শিশিরকুমার ঘোষ, নদীয়ার দীনবন্ধু মিত্র ও মনোমোহন ঘোষ, কৃষ্ণনগরের দারোগা গিরিশচন্দ্র বসু, নদীয়ার স্কুল সমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্টার রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।"[২৩]

ইতিপূর্বে আমরা বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সঙ্গে হরিশের সম্পর্ক আলোচনা করেছি। প্রধানতঃ ভূস্বামীদের সংগঠন ছিল এটি। এই ভূস্বামীরা সকলেই যে একবাক্যে নীলকরবিদ্রোহী ছিলেন তা নয়। চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে হরিশ সে কথা নীল কমিশনের সামনে অকপটভাবে বলেছিলেন।[২৪] বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনেব সদস্যদের হরিশ নীলবিদ্রোহের সময় সক্রিয় রাখার চেষ্টা করেন। এই তৎপরতার অন্যতম নিদর্শন হরিশকে কেন্দ্র করে Indigo Fund গঠন।[২৫] উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় Indigo

Fund গঠনের ব্যাপারে উদ্যোগী হন। জয়কৃষ্ণ—"Forced the Association to this measure of base justice, and an Indigo Fund, as it was called, was placed in the hands of the individul who had devoted his life to the good cause."[২৬]

১৯১০ সালে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত হরিশ মুখার্জীর যে রচনা সংকলন প্রকাশ করেন তাতে নীলচাষ বা নীল আন্দোলন সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলী তুলনামূলকভাবে কম।[২৭] নরেশচন্দ্র মোট সাতটি রচনা সংকলিত করেছেন ঃ

১. Indigo planting in Nuddia
২. Indigo planting in Rajshaye
৩. Indigo planting
৪. The Zamindars and the planters
৫. Planters' portraits
৬. Indigo planting and the Mofussil justice
৭. The planters and the official

আপাততঃ এই রচনাগুলিকে সামনে রেখে আমরা এ সম্পর্কে হরিশের চিন্তাচেতনার পরিচয় গ্রহণ করতে চেষ্টা করব।

হরিশ তাঁর তৃতীয় প্রবন্ধটিতে বলেছেন যে, যদিও—

ক. নীলচাষ ব্যাপকতায় অনুল্লেখযোগ্য,

এবং,

খ. নীলকরেরা দেশের মোট জনসংখ্যার ক্ষুদ্রাংশ—

তথাপি—"No question of domestic interest in Bengal which presses so urgently for a clear adjustment as the one connected with the system of indigo planting."[২৮]

এই প্রবন্ধটিতেই হরিশ নীলচাষের পদ্ধতির সাধারণ বর্ণনা দিয়েছেন। হরিশ লিখেছেন ঃ

"Let us see what the system really is. We lay aside exceptiona lcases. A lease for a long term or for perpetuity is taken, factory and works are established with money advanced by a Calcutta firm of merchants. The ryots are called on to grow indigo for the factory, each according to his resources in agricultural implements and the quality and capacity of the lands he held, and for that purpose are made to take advances of money to be repaid in produce in kind at a price fixed at the time. The lands to be cultivated and their extent are determined by agents of the factory. The seed is supplied by the factory to be paid for by the cultivator. The cultivation is subject to more than the usual risks.

of cultivation in Bengal. The crop is raised, and carried to the factory where it is taken at the original valuation. The value is carried to the credit of the ryot's account, which is then adjusted according to the balance struck. The business of the factory, it will be observed, is confined to manufacturing the raw produce into the saleable drug and to send it down to Calcutta for sale."[২৯]

এই পদ্ধতির মধ্যেই প্রতারণার বীজ আছে। সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজেই এই প্রতারণা আবিষ্কার সম্ভব নয়। নীলচাষ কিভাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতারণামূলক, হরিশ বর্তমান প্রবন্ধে তা বিশ্লেষণ করেছেন। নীলচাষ রায়তদের সর্বস্ব দুর্গতির গর্ভে নিক্ষেপ করে ক্রমানুক্রমিক শোষণের ক্ষেত্র রচনা করে। হরিশ লিখেছেন:

"To the most ignorant reader, the facilities which such a system affords for fraud and oppression would be apparent. It is fraud and oppression from beginning to end. First, there is the essential connection between the factory and proprietory right over the lands surrounding. What necessity is there, an honest enquirer may ask, for the successful prosecution of a manufacture, for the manufacturer to be proprietor of the soil on which the raw produce is raised? Why, it is this. But for the tremendous power which the landed proprietor in Bengal, specially if he be an European, wields over his tenant, the ryot would not cultivate indigo at the ruinously low price at which he is made to do it. A ryot who enters into engagements for the cultivation of indigo on a fourth of the lands he holds can scarcely meet the losses consequent to such engagements with the profits of the remaining three-fourths. Again, there is the whole race of factory servants from the dewan to the khalasee to be propitiated. No body of men more incessantly accuse the civil servants of the East India Company of being under the influence of their amlah.

"But the last appointed Assistant Magistrate and Deputy Collector is scarcely more helpless without his amlah than the indigo planter without his dewan and gomashta. And as a class, cutchery amlah are saints compared to factory amlah. Then there is the item of interest The rate at

which debts owing by a ryot to a factory swell by the accumulation of interest is such as a pawnbroker in town would stand aghast at. It is a current remark that a ryot who has once touched factory money can never be clear of his obligations while he lives. The ryot as may well be supposed, is not a first rate accountant, nor does he keep books in double entry of his transactions. Disputes about accounts, if carried a little too long or too warmly, may end in the administration of a course of shoebeating or a night's lodging and fasting in a godown. All these contingencies taken fogether render the life of the indigo planting ryot one of intense suffering."[৩০]

এই ধরণের প্রতারণামূলক পদ্ধতিকে তবু গ্রাহ্য করা যেত, যদি—

ক. এর উপর বাংলার সামগ্রিক উন্নতি নির্ভর করত, এবং

খ. নীলচাষীদের জীবনের মানোন্নয়ন সম্ভব হত।

কিন্তু তা তো হয় নি। নীলকরদের অত্যাচারী না হয়ে উপায় নেই—"the system makes him so." অথচ, হরিশ দুঃখ করে বলেছেন যে এই অত্যাচার ও প্রতারণামূলক পদ্ধতির কথা বৃটিশ আইন স্বীকার করে না, বৃটিশ জনগণ বা পার্লামেণ্ট জানে না, বৃহত্তর সভ্যজগতও এ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়।

নীলচাষের পদ্ধতিগত অত্যাচার এবং প্রতারণার কথা বেশ চড়া গলায় বললেও এই প্রবন্ধে হরিশের দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতাও দৃষ্টিগোচর হয়। হরিশের দুঃখ, নীলকররা ভারতীয়দের কাছে কলঙ্কিত করছে বৃটিশ ভাবমূর্তি। জমিদার হিসেবে একজন ইংরেজ দেশীয় জমিদার অপেক্ষা অনেক বেশী বিবেচক, বরং রায়তের বন্ধু; বণিক ও ব্যবসায়ী হিসেবে সে ভারতের জীর্ণ পল্লীতে অর্থনৈতিক প্রাণরস সঞ্চারিত করে—কিন্তু নীলকর হিসেবে সে-ই আবার পরিকল্পিত প্রতারণা ও অত্যাচারের নায়ক হিসেবে দেখা দেয়ঃ

"We have always regretted the circumstances which make the indigo planter the chief representative of the independent British community in India in the eyes of its people, the type of the unofficial and ordinary Englishman. He cannot help being an oppressor; the system makes him so, he must submit to it or give up his business. As a merchant the independent Englishman seems commissioned to diffuse wealth in our villages and towns. As a Zeminder he is generally more indulgent, more considerate, than the native landholder. He is a sure and valuable fried of the artisan. In

all these characters he succeeds in making the best impression upon the minds of our countrymen. But while an indigo planter he represents and he is an active agent of a system of organized fraud and oppression. The system is thoroughly bad, and towards its reform should be directed the most strenuous efforts of patriotism, philanthrophy and public spirit"[৩১]

একাধিক প্রবন্ধে হরিশ নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচার বর্ণনা করেছেন। দু একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাক ঃ

ক] নদীয়া জেলার রাজধানীর ৬ মাইলের মধ্যে মাথাভাঙ্গা নদীতীরবর্তী নীলকুঠি। জেলাশাসকের সঙ্গে নীলকরের দারুণ হৃদ্যতা। অঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা নীলকরদের হাতে। কথায় কথায় তারা জরিমানা করেন। দৈহিক শাস্তি তো আছেই। বেত্রাঘাতের একটা তালিকা ঃ গোলাব বিশ্বাস—৩০ বার, রামচন্দ্র ব্যানার্জী—৩০ বার, ক্ষুদিরাম ঘোষ—৫২ বার. জনৈক গোয়ালা ৪০ বার। নীলকুঠিতেই একটা কয়েদখানা আছে। সেখানে লোহার বেড়ী. হাতকড়া—সব আছে। পুলিশ নীলকুঠির হুকুম মেনে চলে।

খ] রাজশাহী জেলার এক নীলকর গ্রাম কে-গ্রাম লুণ্ঠন করেছে। বহু মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছে। নীলকুঠির কয়েকটি লাঠিয়াল এজন্য শাস্তি পেয়েছে। নীলকরের গায়ে কিন্তু আঁচড় পড়ে নি।

গ] রাজশাহী জেলার নীলকর কুকবার্ণ। গারগাছা গ্রামের চাষীদের ধান চাষ করতে দেবেন না। গ্রামবাসীরা নাছোড়বান্দা। সুতরাং লাঠিয়াল নিয়ে আক্রমণ। হত্যা। পুলিশের ভূমিকা নিষ্ক্রিয় দর্শকের।

ঘ] নদীয়ার নীলকরদের সম্বন্ধে স্বয়ং বাংলার লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণরের অভিযোগ। নীলকরের সহায়তায় জেলাশাসক।

নীলচাষী পল্লী অঞ্চলে যে সুবিচার পায় না. তার অন্যতম কারণ হল নীলকর ও জেলাশাসকের আঁতাত। এই বিষয়টি হরিশ তাঁর 'Indigo planting and Mofussil justice' প্রবন্ধে তীব্রভাবেই তুলে ধরেছেন। এই প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন—

ক. জাত্যাভিমানের বশবর্তী হয়ে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ নীলকরদের পক্ষ নিয়েছে,

খ. এই অশুভ আঁতাত শত অন্যায় ও অত্যাচারের মধ্যে নীলচাষের গতিকে অপ্রতিহত রেখেছে,

গ. এই আঁতাত ইংরেজ তথা ইউরোপীয়দের সম্বন্ধে দেশীয়দের বিশ্বাসও বিনষ্ট করছে। হরিশ লিখেছেন ঃ

"Irrespective of the sympathies of colour and creed and the influence of a mistaken and misappropriated public opinion, the official is tempted, in consequence of his isolation

from European society, to social dealings and particulars with his planter neighbours, which give his mind little scope for an independent judgment in his judicial capacity on their character and qualities. The natives, whose practice and interest is to observed with a critical eye the movements and habits both private and public of the judicial officers of their district, thus lose confidence in those of them who betray an intimacy with the non-official Europeans of their stations, and instances are not rare, though the moral causes of all of them may not be alike, which warrant the distrust cherished. We have ourselves mentioned as many of those instances as we could without making ourselves liable to consequences of the law of libel. Lastly, the Government publicly noticed the case of Mr. Tripp, an Indigo planter, who though proved to have plundered another man's property and kidnapped a "fellow creature," was discharged with paying a simple fine, on which neither he nor his masters, as can be easily supposed, have bestowed a passing thought But not a word was said about the justice of the case or any steps taken to canvass its merits."৩২

হরিশ উল্লেখ করেছেন নীলকর মিঃ ট্রিপের কথা, গুরু পাপে যাঁর লঘুদণ্ড হয়েছে। 'Indian Field' পত্রিকায় অনুরূপ আর একটি ঘটনা প্রকাশিত হয়েছিল! ঢাকার নীলকর মিঃ ওয়াইসের ম্যানেজার মিঃ লেডলের কাহিনী।

লেডলে তাঁর নায়েবকে নিজস্ব কয়েদখানায় আটকে রেখেছিলেন দীর্ঘ দু' মাস। ইতিমধ্যে চলেছিল অত্যাচার, নায়েবের সম্পদ লুণ্ঠনের কাজ। সৌভাগ্যক্রমে জেলাশাসক মিঃ ল্যান্স ছিলেন একটু অন্য প্রকৃতির। তিনি লেডলের শাস্তি ঘোষণা করলেন। লেডলে দরবার করলেন সেশন জজের কাছে। জজসাহেব লেডলের অপরাধ স্বীকার করলেন বটে তবে শ্বেতাঙ্গকে গুরুতর শাস্তিবিধানের বিপক্ষেই রায় দিলেন। তিনি বললেন ঃ

"I have no doubt as to the guilt of the appellant, but I do not think that under the circumstances, it is just to subject a person of English habits and English ideas to personal imprisonment where no suitable accommodation exists. Without therefore entering into the question of whether Mr. Laidlay is a British subject or not, a question hitherto not mooted before the magistrate, I think it right to commute the sentence of imprisonment to an additional fine of Rs. 200"৩৩

এই জরিমানাও শেষ পর্যন্ত রায়তদের ঘাড় ভেঙেই আদায় করা হত। বা নাম 'ফৌজদারী কুরচা'। এই ধরণের বিচার নীলকরদের আরো অত্যাচারে প্রকারান্তরে উৎসাহিত করে। হরিশ লিখেছেন ঃ

"So now Mr. W. Tayler announces from the Bench that confining a Native Babu for six weeks or two months in a dirty, damp godown, and scantily feeding him, laying aside altogether the charge of personal violence, and forcibly making him sign certain bonds and deeds of sale and plundering him of his property, are English habits and English ideas and lets him off altogether (the fine will of course, as usual be paid by the factory, and ultimately by the ryots as "fauzdaree kurcha", or law expense)"[১৪]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'নীলদর্পণ' নাটকের চতুর্থ অংকের প্রথম গর্ভাংকে জেলাশাসকের সঙ্গে নীলকরদের সৌহার্দের চমৎকার ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। এই দৃশ্যের একটি চরিত্র আই আই উড একজন নীলকর। তাঁর সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটের পরামর্শ চলছে অথচ উড তথা নীলকরের বিরুদ্ধে অভিযোগকে কেন্দ্র করেই বিচার হচ্ছে ঃ

প্রঃ মোক্তার। অধীনের এই দরখাস্তের প্রার্থনা মঞ্জুর হয় (সেরেস্তাদারের হস্তে দরখাস্ত দান)

মাজিস্ট্রেট। আচ্ছা পাঠ কর। (উঠ সাহেবের সহিত পরামর্শ ও হাস্য)

সেরেস্তা। (প্রঃ মোক্তারের প্রতি) রামায়ণের পুঁথি লিখেছে যে. দরখাস্ত চুম্বক না হইলে কি সকল পড়া গিয়া থাকে (দরখাস্তের পাতা উলটায়ন)

মাজি। (উড সাহেবের সহিত কথোপকথনান্তর হাস্য সম্বরণ করিয়া) খোলোসা পড়।

চতুর্থ অংকের দ্বিতীয় গর্ভাংকে পণ্ডিতের উক্তিও স্মরণযোগ্য ঃ

বিন্দু। কমিশনর সাহেব পিতার নিষ্কৃতির জন্য গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছেন।

পণ্ডিত। এক ভস্ম আর ছার, দোষগুণ কব কার। যেমন ম্যাজিস্ট্রেট, তেমনি কমিশনার।[১৫]

'The planters and the official' প্রবন্ধেও হরিশ আঞ্চলিক প্রশাসন-যন্ত্রের সঙ্গে নীলকরদের যোগাযোগের প্রশ্ন তুলেছেন। মাঝে মাঝে নীলকররা সোচ্চারকণ্ঠে বলার চেষ্টা করে যে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বৈরীভাবাপন্ন ; প্রশাসন বরং জমিদার ও রায়তদের পক্ষ নেয়, তাদের সাহায্য করে এবং এইভাবে নীলচাষ ও নীলকরের সর্বনাশ করে। কিন্তু বাস্তবে ঘটনা বিপরীত—

ক. নীলকুঠি সংখ্যায় বাড়ছে,

খ. নীল উৎপাদন বাড়ছে,

গ নীলকরদেব ক্ষমতা বাড়ছে।

এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় ঃ

ক. নীলকররা নির্দোষ বা অত্যাচারিত নয়,

খ আইনকে তারা তোয়াক্কা করে না।

হরিশ সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন তুলেছেন আঞ্চলিক প্রশাসনের সঙ্গে নীলকরদের সম্পর্ক কেন বৈরীভাবাপন্ন হতে যাবে! যে প্রশাসন জমিদারের হাত থেকে রায়তকে রক্ষা করতে পারে না, সে কিভাবে নীলকরের হাত থেকে রায়তকে রক্ষা করবে? হয়ত দু' একজন জেলাশাসক নিরপেক্ষ, ভালোমানুষ, কিন্তু নিয়মের ব্যতিক্রমের মত এটি শেষ পর্যন্ত নিয়মকেই প্রতিষ্ঠিত করে। হরিশ বললেন ঃ

"Among the wails and misericcordiam of the planting community of Bengal one of the loudest is about the antagonistic feeling which is alleged to be borne towards them by district officials. It is enough, say they, to have to deal with Zemindars and ryots "dishonest to the backbone", but the antagonism of the Zillah officials towards indigo planting and indigo planters aids both, and threatens to complete the ruin of the interest. It is a fact nevertheless that indigo factories have not decreased in number: that they are more powerful than ever: that the extent of their operations judging from the quantity of their produce has increased. With this fact in view we can scarcely bring ourselves to believe that the planter is the innocent and oppressed being he represents himself to be the persecuted of ryot and zemindar, mahajan and magistrate. We can scarcely bring ourselves to sympathise with grievances of a class composed of individuals in body irresponsible to the law, in estate irresponsible to the law, in estate irresponsible to every one but absentee masters and credulous creditors. A class subsisting upon the produce of forced labour, and eluding the penalties of oppressive conduct by the aid of the most unjust of laws has prima facie little reason for complaints against the authorities. We can believe it possible that a majority of the Civil service are impressed with a vague idea of the oppressive character of indigo operations in Bengal, but this

idea can hardly exercise a practical influence over their official conduct. Nobody will deny that a majority of the Civil Service are impressed with a stranger and a clearer idea of the nature of Zemindaree oppression, yet though no class of the community is more entirely at the mercy of district officials than the native Zemindars, district officials are unable in the long run to protect ryots from the oppressions of a hostile Zemindar. How much less then must it be in the power of the district officials to coerce the European planters who are personally above the law, who have the press in their favour, who have what is called public opinion on their side, who are able really to injure the best official reputation, and who can always make powerful influences to bear on the fountain sources of administration? In fact, the power, influence and legal immunities of the planting body are more than sufficient to protect them from the hostility of the official class, supposing such active hostility at all exists. We deny, however, that the relations between district officials and the Planting interest are of so hostile a cast as the latter find it to their purpose to represent. Why should they be enemies? Is it because the planters oppress and it is the duty of the officials to protect the ryots? That would be the first solution that would occur to common sense, but that is not the fact. Is it because the district officials form a social caste and affect an exclusiveness that hurts the pride of the planter class? The fact even in its exaggeration is not a conclusive one. Is it because the official class and the planter class are opposed to each other in most questions of Indian politics. That would hardly generate this sort of antagonism complained of. But as matters actually stand, it will be found that the alleged feeling of hostility does not exist. It may happen that an individual magistrate may contract a prejudice against an individual and give him a good deal of annoyance, but the instances are too few to warrant the assertion that official feeling is against the planters. On the contrary the junior members

of the district magistracy are generally on terms of cordial intimacy with the planters in their neighbourhood. The reasons are obvious and many. It is to these junior members of the service that the largest numbers of cases in which planters are interested are referred for decision."[৩৫]

হরিশ প্রসঙ্গত জেলাশাসক মিঃ ককরেলের মামলার কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রথমতঃ, ককরেল নীলকর হিল কোম্পানির দোষ স্বীকার করেছেন, স্বীকার করেছেন, যে সম্পত্তি নিয়ে বিতর্ক তা হিল কোম্পানির বৈধ অধিকারের মধ্যে পড়ে না,

দ্বিতীয়তঃ, হিল কোম্পানির দোষ স্বীকার করেও ককরেল কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রজাবর্গকেই কেন শান্তি রক্ষিত হবে না তার কারণ দর্শাতে বলেছেন।

এই রায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত যারা অত্যাচারিত তাদেরই বিপর্যস্ত করল। পরিহাস করে হরিশ বলেছেন : যার ঘরে ডাকাত পড়েছে তারই আহ্বানে পুলিশ এসে যদি তাকেই প্রথম নিরস্ত্র করে এবং শান্তি বজায় রাখতে বলে তাহলে যেমন হয় এ ঘটনাও তদ্রূপ।

লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে নীলকরদের সমিতি জমিদার ও রায়তদের 'অত্যাচারের হাত থেকে' নিষ্কৃতি লাভের জন্য যে আবেদনপত্র প্রেরণ করে তাকে হরিশ তীব্র ব্যঙ্গে বিদ্ধ করেন। নীলকররা—

ক. রায়তদের চুক্তিভঙ্গের অপরাধের জন্য, এবং

খ. চুক্তিভঙ্গের ব্যাপারে জমিদারদের উস্কানির জন্য—

আইনের শাস্তি দাবি করেছে। এক্ষেত্রে হরিশের বক্তব্য :

ক. অধিকাংশ চুক্তি নীলচাষীদের উপর জোর করে চাপানো হয়,

খ জমিদারের প্রতি নীলকরদের আক্রোশের মূলে আছে নীলকরদের পল্লী অঞ্চলে ক্ষমতা কুক্ষীগত করার অভীপ্সা।

ভাড়াটে হিসেবে নীলকররা জমিদারদের কাছে তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বড় উপাদান। তবুও জমিদাররা নীলকরদের সমর্থন করতে পারে না, কারণ—

ক. রায়তদের উপর নীলকরদের অত্যাচারের জন্য, এবং

খ. জমিদাররা জানে যে, নীলব্যবসা ভালোভাবে চলতে পারে না যদি না নীলকরদের জমিদারের মত ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি থাকে। অথচ জমিদারী ক্রয়ের অর্থ নীলচাষীদের নেই। তাই তারা জমিদারী ক্রয় অপেক্ষা 'অনেক অসাধু উপায়ে জমিদারী অধিকার আয়ত্ত করতে চায়।

হরিশ তাঁর 'The Zemindar and the Planter' প্রবন্ধে লিখেছেন—

"The case as between the planter and the Ryot was, we trust placed clearly enough before our readers in an article that we published a few weeks ago. We believe we succeeded in showing that the obligations into which the

Ryots enter to the factory are in the vast mojority of cases forced upon him by compulsion. Practical ethics, and the law which is the expression of practical ethics in every country, have decided that such obligations are not binding on the party acting under compulsion. The case as regards the Zemindar is even less to the Association's purpose. The Zemindar, if he looked to his own profit, could not for obvious reasons have a better tenant than a planter. The planter can afford to pay better rent than others. The pergunnah chowrassie would yield two thousand rupees less than it does if Mr. Hampton would give up his lease. The risk and expenses of collection are infinitely less. Who would not prefer a solvent tenant paying at once the rental of five villages to a numerous peasantry doling out the rent of cottahs? When Mr. Welby Jackson visited patkabaria, he urged this view of the question upon the Zemindar to induce him to desist in his resistance to factory aggression. The reply was one that would do honour to the chivalry of any age and any nation. "Sir, we would undoubtedly benefit, but what will become of our ryots?" Ramruttan Roy would add twenty five percent. to his income if he would but shut his eyes to planters 'oppression. The Naldungah Rajah who has had to pay such heavy bloodmoney for the attack upon Mr. Oram might have sat quietly and in ease, and seen his tenants forced into contracts with which he had no concern. We could multiply such cases ad infinitum but it is needless.

"The indigo planter, as we showed before, connot carry on his business unless he can appropriate the power and influence of a landholder over the ryots of the villages around his factory. But the planter seldom has the capital to purchase the Zemindaree. His aim therefore is to possess himself of the Zemindaree rights by means less fair than purchase. The most common artifice used is to take a putnee lease from a shareholder or a mortgagee. Of course possession is refused to one who is at once an intruder and an oppressor and then follow fights, forgeries, and petitions to the Legislative Council"[৩৭]

সরকারের কাছে নীলকর সংঘের আবেদনক্রমে ১৮৬০ সালের ৩১শে মার্চ এক নতুন আইন পাশ হয়। ফলে প্রজারা চুক্তিভঙ্গ করলে সরাসরি বিচারের ব্যবস্থা

হল। এই নতুন আইন পাশ হওয়ায় রায়তরা নীলচাষের বিরুদ্ধে আরো দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়। এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করে হরিশচন্দ্র 'হিন্দু পেট্রিয়টে' লেখেন—

"বাংলাদেশ তার কৃষকদের সম্বন্ধে নিশ্চয়ই গর্ব করতে পারে। নীল আন্দোলন আরম্ভ হবার পর থেকে বাংলা দেশের রায়তরা নৈতিক শক্তির এরকম স্পষ্ট পরিচয় যে দিয়েছে তা আর কোন দেশের কৃষকদের মধ্যে দেখা যায় না। দরিদ্র, রাজনৈতিক জ্ঞান ও ক্ষমতাবিহীন এবং নেতৃত্বহীন হয়েও এই সমস্ত কৃষক এরকম একটা বিপ্লব ঘটাতে সফল হয়েছে, যা গুরুত্বে এবং মহত্বে কোন দেশের সামাজিক ইতিহাসের বিপ্লবের তুলনায় কোনক্রমে নিকৃষ্ট নয়। তাদের এ রকম একটা শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম কবতে হয়েছে, যার হাতে ছিল দুর্ধর্ষ ক্ষমতার সব রকমের উপকরণ। সরকাব, সংবাদপত্র, আইন-আদালত—এতগুলি শক্তির বিরুদ্ধে কৃষকরা যে সাফল্য অর্জন করেছিল তার সুফল সমাজের সমস্ত শ্রেণী এবং দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা উপভোগ করতে পারবে।"[৩৮]

নীলবিদ্রোহের ব্যাপ্তিতে ভীত হয়েই হোক অথবা বঙ্গীয় সরকার নীলচাষের পক্ষপাতী না হওয়ার জন্যই হোক শেষ পর্যন্ত জে. পি গ্রান্টের উদ্যোগে ১৮৬০ সালের মে মাসে নীল কমিশন[৩৯] গঠিত হয়। কমিশনেব সদস্য নিম্নরূপ ঃ

সভাপতি ঃ ডব্লু. এস. সীটনকার।

সদস্য ঃ স্যর রিচার্ড টেম্পল, রেভারেণ্ড জে. সেল, চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, ডব্লু. এফ ফার্গুসন।

১৮ই মে কমিশনের প্রকাশ্য অধিবেশন শুরু হয় এবং তা চলে ১৪ই অগাস্ট পর্যন্ত। কমিশনে যাঁদের সাক্ষ্য গৃহীত হয় ঃ

৭৭—রায়ত
২১—নীলকর
১৩—জমিদার বা তালুকদার
৮—মিশনারী
১৫—সরকাবী কর্মচারী
———
১৩৪

নীল কমিশনে হরিশচন্দ্রের সাক্ষ্য উদ্ধৃত হল ঃ

ইণ্ডিগো কমিশনের নিকট হরিশের জবানবন্দী

৩০শে জুলাই ১৮৬০ সাল।

ডর্ব্লিউ, এছ, সিটন্‌কার ছি, এছ সাহেব সভাপতি।

সভ্য

আর, টেম্পল, ছি, এছ
ডর্ব্লিউ এফ, ফার্গুছন
রেভারেণ্ড জে, সেল
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

উক্ত সভ্যগণের মধ্যে সিটনকার ও টেম্পল মহোদয়গণ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি,

ফার্গুসন সাহেব নীলকরের প্রতিনিধি, ও রেভারেণ্ড সেল সাহেব মিসনারীগণের প্রতিনিধি, ও চন্দ্রমোহন বাবু জমিদার ও প্রজার প্রতিনিধি ছিলেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত ভবানীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র হাজির হইয়া শপথ করিয়া বলিলেন—

সভাপতির প্রশ্ন। আপনি কি কাজ করেন?

উ। আমি মিলিটারী অডিটর জেনারলের অফিসে গবর্ণমেণ্টের একজন কর্মচারী।

সভাপতি। আপনি কি হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক?

উ! ঐ কাগজের দায়ী (Responsible) সম্পাদক বলিয়া আমি স্বীকার করি না, কিন্তু উহার স্বত্বাধিকারীর উপরে আমার প্রচুর ক্ষমতা থাকায় আমি তাঁহাকে ঐ কাগজের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমার যাহা ন্যায় বোধ হয় তাহা তাঁহাকে গ্রহণ করাইতে পারি।

সভা। আপনি বিশেষ যত্নের সহিত নীল হাঙ্গামার বিষয় পর্য্যালোচনা করিবার কি সুবিধা পান নাই?

উ। হাঁ, পাইয়াছিলাম।

সভা। নীল হাঙ্গামার সময় প্রজাগণ কিম্বা অন্য কোন পক্ষ আপনার নিকট কি পরামর্শ চাহেন নাই?

উ। হা, অনেক জমীদার, প্রজা ও মধ্যবর্তী ভূম্যধিকারীগণ অনেক জেলা হইতে আমার নিকটে আসিয়া উপদেশ চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা আমার নিকট স্বয়ং আসিয়াছিলেন।

সভা। কোন্ কোন্ বিষয় সম্বন্ধে তাঁহারা সাধারণত আপনার উপদেশ চাহিয়াছিলেন?

উ। নীল চাষের সরাসরি বিচার ও দাদন চুক্তিভঙ্গ সম্বন্ধে ১৮৬০ সালে ১১ আইন জারী হইবার পূর্বে অনেক প্রজা নীল বপন করিতে কিসে না হয় তাহার সম্বন্ধে আমার পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। পরে ঐ আইন জারী হইলে তাহারা কিরূপে জবর্দ্দস্তি ও অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে তাহার সম্বন্ধে পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিল। নীলের দাদন কিসে না লইতে হয় তদ্বিষয়েও পরামর্শ চাহিয়াছিল। এ সকল ব্যতীত, আমি অনেক সময়ে, তাঁহাদের জন্য দরখাস্ত লিখিয়া ও অন্যান্য পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিয়াছিলাম।

সভা। পূর্বোক্ত বিষয় সম্বন্ধে আপনি মোটামুটি কি কি উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা কি বলিতে পারেন?

উ। আমি সচরাচর তাঁহাদিগকে জেলার প্রধান কর্মচারীদিগের নিকট যথা-নিয়মে, তাহাদের ক্লেশ নিবারণের জন্য দরখাস্ত করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম। যদি তাহারা সেখানে অকৃতকার্য্য হয়, তবে জেলার রাজকর্মচারীদিগের উপর আওলার (যেমন কমিশনার ও ছোটলাট) নিকট তাহাদের ক্লেশ জানাইতে পরামর্শ দিয়াছিলাম। আমি তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম যে, তাহারা

কখন কোন হাঙ্গামা কিম্বা আইনবিরুদ্ধ কাজে প্রবৃত্ত না হয়। আমি তাহাদিগকে আরও বুঝাইলাম যে উক্ত ১১ আইন অল্পকালের জন্য বাহাল থাকিবে; এবং ভবিষ্যতে ভাল আইন হইবার সম্ভাবনা আছে। যদি ঐরূপ হয়, তাহা হইলে তাহারা ইচ্ছাপূর্বক দাদন লইতে পারিবে। আমি তাহাদিগকে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা করিতে পরামর্শ দি। দেওয়ানী আদালতে প্রজাদিগের যত যাওয়া উচিত ছিল তত তাহারা যায় নাই। ক্ষতিপূরণের জন্য যে আইন হয়, আমি তাহারই কথা বলিতেছি।

সভা। আপনি ইংরাজী কাগজের সম্পাদক ও আপনার কাগজ সম্ভবত সাহেবেরা পাঠ করেন। এমন অবস্থায় আপনি মফস্বলের কোন লোকের নিকট হইতে পত্রাদি পাইয়াছিলেন কি না এবং তাঁহারা আপনার উপদেশ চাহিয়াছিলেন কি না?

উ। হিন্দুপেট্রিয়ট সম্পাদকের নামে যে সকল চিঠি আসিত আমি তাহা খুলিতাম ও পড়িতাম, এবং উহার মধ্যে অনেক চিঠি ও কাগজে অত্যাচার সম্বন্ধে ও আমার উপদেশ গ্রহণ সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা থাকিত।

সভা। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত খবরের কাগজের (যথা ভাস্করের) অপেক্ষা ঐরূপ চিঠিপত্র হিন্দুপেট্রিয়ট সম্পাদকের নামে বেশী আসিবার সম্ভাবনা ছিল কি না?

উ। সম্ভবত বেশী আসিত।

সভা। যশোহর, কৃষ্ণনগর ও মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি নীলের জায়গায় আপনি কখন স্বয়ং গিয়াছিলেন কি না, এবং ঐ সকল স্থানের অধিবাসীর সঙ্গে আপনার আলাপ পরিচয় আছে কি না?

উ। বারাসত ও হুগলী ব্যতীত আমি উক্ত জেলায় কখন যাই নাই। নদীয়া জেলার অনেক লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে এবং রাজসাহী ও ময়মনসিংহের কতক কতক লোকের সঙ্গে জানাশুনা আছে। ঐ সকল লোক আমার সহিত ভবানীপুরে আসিয়া আলাপ করিয়াছিলেন।

সভা। নীল হাঙ্গামার সময় ঐ সকল জেলার অবস্থা জানিবার জন্য আপনি লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন কি না?

উ। কেবলই খবরের জন্য নহে। মোক্তার ও উকীলদিগকে প্রজাপক্ষ হইয়া মোকদ্দমা চালাইবার জন্য আমি অনুরোধ করি এবং ঐ সকল আইনব্যবসায়ীরা হিন্দুপেট্রিয়টের সংবাদদাতা হয়েন। আমি সময়ে সময়ে ঐ সকল জেলার লোকদিগের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় সকল ঘটনা ও মোকদ্দমার সংবাদ পাইতাম।

মেঃ ফার্গুসন। আপনি কলিকাতা হইতে মোক্তার কিম্বা অন্য আইনব্যবসায়ী এজেণ্ট পাঠাইয়াছিলেন কি না, এবং রাইয়তদিগকে ঐ সকল এজেণ্টকে নিযুক্ত করিতে বলিয়াছিলেন কি না?

উ। রাইয়তেরা কলিকাতা হইতে তাহাদিগকে লইয়া যায়। আমি কেবল একজন প্রজার জন্য মোক্তারদিগের পুরস্কার সম্বন্ধে কথাবার্তা স্থির করিয়া দিয়াছিলাম। জিতুবাড়ুর্য্যে নামক দামুড়হুদা সভাডিবিজনের মোক্তার যখন

রাইয়তদিগকে নীলকরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন বলিয়া অপবাদ দিয়া কারারুদ্ধ হয়েন, তখন কৃষ্ণনগরের সদর মহকুমার মোক্তারগণ ব্যতীত অন্য মোক্তারগণ ভয়ে প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিতে অস্বীকার করিলে আমি ঐরূপে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলাম।

সভা। তবে আপনি একথা স্পষ্ট বলিতেছেন যে আপনি কখন থানা বর থানা, কিম্বা গ্রামে গ্রামে প্রজাদিগকে উত্তেজিত করিবার মানসে দূত প্রেরণ করেন নাই।

উ। না. আমি কখনই ঐরূপ কার্য্য করি নাই। এই কথা অস্বীকার করিবার যে আমায় সুযোগ প্রদান করিলেন, তাহার জন্য এই সভাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

রেভারেণ্ড সেল। আপনার জ্ঞানানুসারে কয়জন মোক্তার কলিকাতা হইতে কোন কোন নীল হাঙ্গামার জায়গায় গিয়াছিল, এবং তাঁহাদের সহিত আপনার কি কথাবার্তা হইয়াছিল?

উ। তিনজন মাত্র মোক্তার জেলায় গিয়াছিল। তাঁহাদের সহিত আমার এই কথাবার্তা হইয়াছিল যে তাঁহারা মেহনতআনা পাইলে প্রজার পক্ষ হইয়া মোকদ্দমা চালাইবেন।

মেঃ ফাগুসন। আপনি নীলের সম্বন্ধে সারকুলার নোটিস প্রস্তুত করিয়া তাহা প্রজাদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিয়াছেন এই যে জনরব শুনা যায় তাহা সত্য কি না?

উ। আমি ঐ সকল বিষয় কিছুই জানি না ও উক্ত সারকুলার চক্ষে দেখি নাই।

রেভারেণ্ড সেল। সরাসরি আইন (১১ আইন) জারী হইলে আপনি বলিয়াছেন যে প্রজারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে তাহারা কিরূপে জবর্দস্তির হাত হইতে রক্ষা পাইবে। তাহারা উক্ত আইনের কার্য্য কিরূপে একেবারে রহিত হইতে পারে তাহার সম্বন্ধে আপনার মত কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল? না, ঐ আইনের আছিলা করিয়া, রাজকর্মচারীরা ও নীলকরেরা যে সকল অত্যাচার করিতেন তাহার সম্বন্ধে আপনার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন?

উ। প্রজারা উক্ত আইন কার্য্যে যাহাতে পরিণত না হইতে পারে তৎসম্বন্ধে পরামর্শ চাহিয়াছিল। ঐ আইনের আছিলা করিয়া রাজকর্মচারী নীলকরগণ যে ঘোর অত্যাচার করিতেন তৎসম্বন্ধে পরামর্শ দিয়াছিলাম।

রেভারেণ্ড সেল। কি রকম অত্যাচার হইত আপনি কি বলিতে পারেন?

উ। সেঁতা, ছোট ও সংকীর্ণ গুদামে অনেক লোক কয়েদ করিয়া রাখা, বলপূর্বক সম্পত্তি লুণ্ঠন, ও নীলকর দ্বারা উত্তেজিত হইয়া পুলিশের কর্মচারী দ্বারা প্রজাদিগের স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার প্রভৃতির কথা বলিতেছিলাম।

মেঃ ফাগুসন। আপনি কি ইহা বিশ্বাস করেন যে এই সকল অত্যাচার ১৮৬০ সালের ১১ আইনের জন্য হইয়াছে?

উ। হাঁ, আমি বিশ্বাস করি। গুদামে বন্দ করিয়া রাখাব বিশ্বাস অনুসন্ধান দ্বারা দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। ইহা আদালতের বিচার দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে।

সভা। আপনি কি জানেন যে এই ১১ আইন জারী হওয়ার পর বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট উক্ত অত্যাচার নিবারণ মানসে স্থানীয় কর্মচারীদিগের উপর দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন ?

উ। ঐ আইন জারী হওয়ার ২।৩ মাস পর পর্যন্ত গবর্ণমেণ্টের তদারক ভাল হয় নাই। ঐ কয়েক মাসেব পর তদন্ত আরম্ভ হইয়াছিল।

বাবু চন্দ্রমোহন। কমিশনের সময় লারমুর সাহেব জবানবন্দী দেন যে ভূতপূর্ব লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর হ্যালিডে বাহাদুর নীলকরদিগের মধ্যে কোন কোন সাহেবকে অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া নীলকরদিগের প্রতি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সভ্যদিগের হিংসা হইয়াছে। আপনি ঐ সভার সভ্য হইয়া ঐ বিষয়ে কিছু বলিতে পারেন কি?

উ। লারমুর সাহেবের কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভায় নানাপ্রকার রাজনীতি মতধারী সভ্য আছেন। কেহ বা নীলকরের মিত্র, কেহবা শত্রু। উক্ত সভা হইতে ছোটলাটের নিকট ১৮৫৭ সালে ২৯ আগষ্ট তারিখে অনরারী মাজিষ্ট্রেটের নিয়োগ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া এক দরখাস্ত করা হয়। তাহার এক খণ্ড নকল আমি দাখিল করিলাম।

সভা। নীলের সম্বন্ধে আধুনিক তর্কবিতর্ক সময়ে, আপনি কি ইহা কর্তব্য জ্ঞান করিয়াছিলেন যে, বহুসংখ্যক প্রজার হিতাহিত যে সকল প্রশ্নের উপর নির্ভর করে, তাহার বিষয় স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া, মত সকল ব্যক্ত করা উচিত।

উ। আমি এই নীল হাঙ্গামার বিষয় বিশেষ যত্ন ও সাবধানে পর্য্যালোচনা করিয়াছি, এবং ইহা আমার নিঃসন্দেহ বিশ্বাস যে বর্তমান নীলচাষ প্রজার অহিতকারী, এবং আমি এই মত সময়ে সময়ে প্রকাশ করিয়াছি। ভবিষ্যতে নীলকর ও প্রজার মধ্যে কিরূপে সম্বন্ধ স্থাপন হইবে এই বিষয়ে আমার কেবল এক মাত্র সন্দেহ আছে।

[রামগোপাল সান্যাল অনূদিত]

নীলবিদ্রোহে হরিশের ভূমিকা নীলকরদের প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। তারা প্রায়ই তাঁকে চিঠিপত্রের মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করত। এই রকম এক চিঠির নমুনা[৪০] :

"ওহে, কালা আদমী, দিনকে দিন তোমার বড় বাড় বাড়ছে। ভদ্রলোককে অপমান করে যাচ্ছ। তুমি যে বিজেতার দাস, সে কথা ভুলেই গেছ বোধ হয়। পলাশীর পর থেকে নিপীড়নই তো তোমাদের ভাগ্যলিপি। তোমার নোংরা কাগজখানার ভালো বিক্রি আর অবাঞ্ছিত প্রশংসা বোধহয় আমাদের মত ভদ্র-লোককে অপমান করার সাহস দিয়েছে। শয়তান, সতর্ক হোস। কলম যদি বন্ধ না করিস তাহলে কপালে কষ্ট আছে। এরপর শহরে বা মফস্বলে যদি তোর সাথে দেখা হয় তাহলে বেশ খানিকটা চাবকে দেব।"

শুধুমাত্র চিঠিপত্র নয়, নীলকররা হরিশের নামে মামলাও দায়ের করেছিলেন। যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন ঃ

"নীল কমিশনে সাক্ষ্য দানকালে পাদ্রী সি বসওয়েলস বলেন যে, হরমণি নাম্নী জনৈক বালিকাকে কৃষ্ণনগরের কাছিকাটা নীলকুঠিতে অপহরণ করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এই নীলকুঠির ভারপ্রাপ্ত সাহেবের নাম ছিল আর্চিবল্ড হিলস। কমিশনের সভাপতি সীটনকার কৃষ্ণনগরের ম্যাজিস্ট্রেট ডবলিউ জে. হার্সেলকে দিয়া অনুসন্ধান করান। হার্সেল অনুসন্ধানে হরমণির ব্যাপার যে সত্য তাহা বুঝিতে পারেন। কিন্তু ইহার জন্য দায়ী কে তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। হিন্দু প্যাট্রিয়ট কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা যাচাই করিয়া হিলস সাহেবকেই দোষী করেন।"[৪১]

হরমণি ও হিলসের এই ঘটনার প্রতিফলন পড়েছে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে। নীলকর রোগ সাহেব জনৈকা কুলকামিনী ক্ষেত্রমণির উপর পাশবিক অত্যাচারে উদ্যত।[৪২]

রোগ। ডিয়ার, ডিয়ার, (দুই হস্তে ক্ষেত্রমণির দুই হস্ত ধরিয়া টানন) আইস আইস—

ক্ষেত্র। ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, ও সাহেব তুমি মোর বাবা, মোরে ছেড়ে দাও……

রোগ। তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে, আমি কোন কথায় ভুলিতে পারি না, বিছানায় আইস, নচেৎ পদাঘাতে পেট ভাঙ্গিয়া দিব।

ক্ষেত্র। মোর ছেলে মরে যাবে, দই সাহেব, মোর ছেলে মরে যাবে—মুই পোয়াতি।

রোগ। তোমাকে উলঙ্গ না করিলে তোমার লজ্জা যাইবে না।

[বস্ত্র ধরিয়া টানন]

ক্ষেত্র। ও সাহেব, মুই তোমার মা, মোরে ন্যাংটো করো না, তুমি ছেলে, মোর কাপড় ছেড়ে দাও—

হিন্দু পেট্রিয়টে আর্চিবল্ড হিলসের ঘটনা প্রকাশিত হবার পর হিলস প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উদ্যত হন। যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন—

"হিলস প্যাট্রিয়ট সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামে দশ হাজার টাকার খেসারত দাবি করিয়া ২৪ পরগণার সদর আমীনের এজলাশে মানহানির মামলা আনেন। নীল আন্দোলনে হরিশচন্দ্র যেরূপ নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন তাহাতে তাহারা তাঁহার উপর অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিয়াছিল। মোকদ্দমা রুজু হইবার পরই হরিশচন্দ্র ১৮৬১, ১৪ জুন মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু হিলস সাহেব ছাড়িবার পাত্র নয়, হরিশচন্দ্রের সদ্য বিধবা পত্নীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা লড়িতে বদ্ধপরিকর হইল। হরিশচন্দ্রের পত্নী আর মোকদ্দমা পরিচালনে রাজি হইলেন না। হাজার টাকা খেসারত দিয়া হিলস সাহেবের সঙ্গে আপোষ করিয়া লইলেন।"[৪৩]

শিবনাথ শাস্ত্রী কিন্তু লিখেছেন যে হিলস প্রথমে সুপ্রিম কোর্টে এবং পরে আলিপুর কোর্টে দেওয়ানী মোকদ্দমা চালান।[৪৪]

শিবনাথ শাস্ত্রীর বক্তব্য যে ঠিক নয়, তার প্রমাণ 'Friend of India' পত্রিকার একটি সংবাদ।[৪৫] ঐ সংবাদ থেকে জানা যায় ঃ

ক. হিলস ২৪ পরগণার কোর্টে হরিশের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন,

খ. মামলা দায়ের করা হয় প্রধান সদর আমীন বাবু তারকনাথ সেনের কাছে,

গ হিলসের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন ব্যারিস্টার বেলসাহেব,

ঘ. হরিশের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন মণ্টিয়ো।

ঙ. মামলার পরিণতি—"Finally an apology was offered and accepted. A verdict to be entered for the plaintiff for nominal charges, but costs to be paid to the plaintiff upon the amount of suit as brought."

হরিশচন্দ্রের 'জীবনীকার অবশ্য এ কথা স্বীকার করেন নি যে হরিশ ক্ষমা প্রার্থনা করে মামলার নিষ্পত্তি করেছিলেন।[৪৬]

যোগেশচন্দ্র বা শিবনাথ উভয়ের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে হরিশের মৃত্যুর পর মামলার জন্য তাঁর বিধবা পত্নীকে এক হাজার টাকা দিতে হয় এবং—"হরিশের বিধবার পশ্চাতে কেহই ছিল না।"

কিন্তু নানা তথ্য প্রমাণ করে যে যোগেশচন্দ্র ও শিবনাথের বক্তব্য অভ্রান্ত নয়। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্যরাই তাঁর মৃত্যুব পর বাড়ি ক্রোক করার সময় টাকা পরিশোধ করেন। তাছাড়া হরিশের বিধবা পত্নীকেও এসোসিয়েশন আমৃত্যু বার্ষিক সাহায্য দান করত।[৪৭]

নীলবিদ্রোহে হরিশের ভূমিকা সম্পর্কে কয়েকজন ঐতিহাসিক ও গবেষকের মতামত উদ্ধৃত হল ঃ

ক) প্রমোদ সেনগুপ্ত লিখেছেন ঃ—

"নীলকরদের অত্যাচারের কথা বাঙালী পরিচালিত সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে বের হত, কিন্তু নীলচাষীদের পক্ষে কোনপ্রকার আন্দোলন বলে কিছু গড়ে ওঠে নি। রামমোহন ও দ্বারকানাথ নীলকরদের ও নীলচাষকে সমর্থন করেছিলেন বলে শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে অনেকদিন পর্যন্ত এ বিষয়ে অনেক রকম বিভ্রান্তিও ছিল। তাছাড়া তখনকার শিক্ষিত বাঙালীরা নিজেদের চাকরীর সমস্যা, নয়তো অত্যন্ত উচ্চ ধরনের আধ্যাত্মিক চিন্তা, নয়তো সমাজ সংস্কার ইত্যাদির সমস্যা নিয়েই বেশীর ভাগ ব্যস্ত থাকতেন। বাংলাদেশের শতকরা ৮০।৯০ জন লোক গ্রামে বাস করলেও এবং তাদের অধিকাংশ কৃষক হলেও তাঁরা দেশের অগণিত কৃষকদের দুরবস্থা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অভিশাপ, জমিদার মহাজনদের শোষণ ও অত্যাচার—এইসব গুরুতর জাতীয় সমস্যাগুলি নিয়ে বড়ো একটা মাথা ঘামাতেন না।

১৮৪৯ সালে অক্ষয়কুমার দত্তই সর্বপ্রথম 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় পরিষ্কার-ভাবে নীলচাষীদের দুর্দশার কথা প্রকাশ করেন। তারপর থেকেই এইসব খবর বাঙালী পরিচালিত কাগজগুলিতে বার হতে শুরু করে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'প্রভাকর' পত্রিকায় নীলকরদের বিরুদ্ধে রাণী ভিক্টোরিয়ার দয়া ভিক্ষা করে কবিতা লিখেছিলেন। হরিশচন্দ্র মুখার্জী তাঁর 'হিন্দু পেট্রিয়টে' এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে লাগলেন এবং সিপাহী বিদ্রোহ শেষ হতে না হতে নীল আন্দোলনই হরিশচন্দ্রের নিকট প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াল এবং হরিশচন্দ্রের চেষ্টাতেই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নীলচাষীদের পক্ষ অবলম্বন করেন।

হরিশচন্দ্রের এই গৌরবময় কাহিনী সম্বন্ধে যোগেশচন্দ্র বাগল বলেছেন: "ইংরেজের স্বৈরাচারের কথা হিন্দু পেট্রিয়টে যেরূপ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতে লাগিল এমনটি তখনকার কোন পত্রিকায়ই বাহির হইত কিনা সন্দেহ। যশোহরের শিশিরকুমার ঘোষ, কৃষ্ণনগরের মনোমোহন ঘোষ, কুমারখালির হরিনাথ মজুমদার ও মথুরানাথ মৈত্রেয়, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতির দ্বারা প্রেরিত নীলকরদের অত্যাচারের কথা হরিশচন্দ্র যথারীতি পেট্রিয়টে প্রকাশ করিতেন এবং তাহার উপর টিপ্পনী ও মন্তব্যাদি লিখিতেন। এ কারণে কলিকাতার ইংরেজ ব্যবসায়ী মহল এবং ইংরেজ পরিচালিত পত্রিকাসমূহ তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইল। কিন্তু ১৮৬০ সালে নিরীহ নীলচাষীরা যখন নীলকরদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে, জীবন যায় তাও স্বীকার তবু তাহারা নীল বুনিবে না এবং কলিকাতার হিন্দু পেট্রিয়ট তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়া ইহার ন্যায্যতার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিলেন তখন তাহাদের ক্রোধের সীমা রহিল না। ইহার ফল হরিশ চন্দ্রের নিজের পক্ষে…বিষময় হইয়াছিল।"

১৮৬০ সালে যখন নীলচাষীদের বিদ্রোহ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে ও চাষীরা যখন কিছুতেই আর নীলচাষ করতে রাজী হচ্ছে না, তখন সরকার ১৮৩০ সালের মতো আবার আইন জারী করলেন যে চুক্তিবদ্ধ চাষীরা যদি নীলচাষ না করে তাহলে তাদের ফৌজদারী আদালতে শাস্তি দেওয়া হবে। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটরা গ্রামের পর গ্রাম থেকে লোকেদের ধরে ধরে জেলে পাঠাতে লাগল। দেখতে দেখতে জেলগুলি ভর্তি হয়ে গেল ও কৃষকদের উপর অনেক রকম অত্যাচার শুরু হয়ে গেল। এই সময় চাষীদের প্রতিনিধিরা কলকাতায় এসে হরিশচন্দ্রের নিকট পরামর্শ ও সাহায্য চাইত। হরিশচন্দ্রের দ্বার তাদের জন্য সব সময়ই খোলা থাকত। "নীল হাঙ্গামার সময় হরিশচন্দ্রের গৃহ অতিথি শালায় পরিণত হইয়াছিল। এই সময়ে পেট্রিয়ট-এর নিয়মিত খরচ চালাইয়া তাঁহার বেতনের যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিত তৎসমুদয়ই নীলচাষীদের সেবায় ব্যয়িত হইত।"

কৃষকদের সংগ্রামে হরিশচন্দ্রের সাহায্য যে কতখানি মূল্যবান ছিল তা তখনকার দেশের বাস্তব অবস্থায় দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ইংরেজ বণিক ও ম্যাজিস্ট্রেটদের দৌরাত্ম্যে মফস্বলে উকিল মোক্তাররা প্রজাদের পক্ষ সমর্থন করতে স্বভাবতই সাহস করতেন না। কাজেই নীলকরদের বিরুদ্ধে মামলায় রায়তদের

পক্ষ সমর্থন করবার জন্য বড় একটা কাউকে পাওয়া যেত না। হরিশচন্দ্র অনেক চেষ্টা করে দু একজন মোক্তারকে মফস্বলে রায়তদের মামলা তদ্বিরের জন্য পাঠাতে সমর্থ হয়েছিলেন। যে ভাবে মোক্তাররা সাহস করে রায়তদের পক্ষ সমর্থন করতেন তাতে তাঁদের অনেক সময় বিপদে পড়তে হত, এমন কি জেলেও যেতে হত। ১৮৬০ সালের ১৪ই এপ্রিল তারিখের 'ইংলিশম্যান' কাগজের এক সংবাদে জানা যায় যে, নীলকরদের বিরুদ্ধে নীল না বুনতে উত্তেজিত করবার জন্য কৃষ্ণনগরের একজন মোক্তারকে ছয়মাস কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সংবাদটি উদ্ধৃত করে 'হিন্দু পেট্রিয়টে' হরিশচন্দ্র মন্তব্য করেছেন যে, এমন কি নতুন আইনেও এইরকম কাজ বে-আইনী নয়।

হরিশচন্দ্র নীল কমিশনের নিকট সাক্ষ্যদান কালে বলেন যে, উক্ত আইনের দৌলতে সরকারী কর্মচারী, পুলিশ ও নীলকরদের অত্যাচার আবার বেড়ে গেল। ছোট স্যাঁতসেঁতে গুদামে রায়তদের আটক রাখা হত, বলপূর্বক সম্পত্তি লুণ্ঠন ও নীলকরদের প্ররোচনায় পুলিশ কর্তৃক রায়তদের স্ত্রীলোকদের উপর অনেক রকম অত্যাচার উৎপীড়ন হত। হরিশচন্দ্র নীল কমিশনকে বলেন যে, "আমি নীল-হাঙ্গামার বিষয় খুব যত্নের সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখেছি। তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, বর্তমানে নীলচাষ রায়তদের পক্ষে সর্ব প্রকারে ক্ষতিকর।"

নীল চাষীরা যখন প্রতিজ্ঞা করেছে যে তারা জেলে যাবে, সব রকমের অত্যাচার সহ্য করবে, প্রয়োজন হলে প্রাণও দেবে, তবু তারা কিছুতেই নীল বুনবে না—এই রকম যখন দেশের অবস্থা তখন সদাশয় বাংলা সরকার ঘোষণা করল যে নীলকরদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এই সম্বন্ধে হরিশচন্দ্র 'হিন্দু পেট্রিয়টের' ১৮৬০ সালের ১২ই মার্চ লিখেছিলেন: উৎপীড়নের জাল ভালো-ভাবেই বিস্তার করা হয়েছে। অসংখ্য রায়তদের জেলে পোরা হয়েছে। এই শাস্তি দেওয়া একেবারেই বিফল হয়েছে, কারণ তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রায়তদের দিয়ে নীল বপন। সরকার এখন কৌশল বদলে ফেলেছেন। মফস্বলে ম্যাজিস্ট্রেটরা এখন প্রতিবিঘা নীল জমির জন্য নীলকরদের ২০ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে শুরু করেছেন। মিঃ হার্সেল খাল বোয়ালিয়া কুঠির জন্য ১৯ টাকা করে দিচ্ছেন। এমনকি এই অসঙ্গত শর্ত অনুসারেও এই রকম ক্ষতি পূরণের হার বিঘা প্রতি ৮ টাকা অথবা ৯ টাকার বেশী হতে পারে না। গতবছর কাছিকাটা কুঠি ১৯০০০ বিঘা চাষে ১, ৪৫,০০০ টাকা লাভ করেছিল। এই বৎসর ঐ কুঠির ৬৫০০ বিঘায় নীল চাষ হয়নি, সুতরাং তারা এর জন্য ১,২০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবে। যদি ১৯০০০ বিঘার জন্য তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় তাহলে তারা পেতে পারে ৩,৮০,০০০ টাকা অর্থাৎ তারা নীলচাষ করে যা লাভ করে তার ৩ গুণ। এমনিতেই যখন নীলকররা দুই-তিন গুণ লাভ করবে, তখন তাদের কর্মচারীদের তারা হুকুম দিয়েছে যেন এ বৎসর কোন নীল না বোনা হয়।

এই ভাবে হরিশচন্দ্র দিনের পর 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর মারফৎ সরকার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন ও রায়তদের বিপদের দিনে

তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের যথাসম্ভব সাহায্য করছিলেন ও উৎসাহ দিচ্ছিলেন। এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই সময় বাংলা দেশে অথবা ভারতবর্ষে কোনো প্রকারের জাতীয় সংগঠনও ছিল না। কিংবা কোনো প্রকারের সংঘবদ্ধ আন্দোলনও ছিল না। তাছাড়া সিপাহী বিদ্রোহ দমন করার জন্য ভারত সরকার তখনও সন্ত্রাস-নীতি চালিয়ে যাচ্ছে, যার ফলে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করবার ভয়ে সরকার-বিরোধী কথাবার্তা বলতে কেউই বড় একটা সাহস করত না। এই অবস্থায় হরিশচন্দ্র, প্রায় একাকী বললেই চলে, যেরূপে নির্ভয়ে নীলচাষীদের হয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তার উদাহরণ খুব বেশী মেলে না।

এই জন্য নীলকরদের কাছ থেকে তিনি যথেষ্ট পুরস্কার ও পেয়েছিলেন। এমন কোনো ইতর ভাষা নেই যা তারা তাঁর প্রতি প্রয়োগ করে নি। নদীয়ার একজন নীলকর তাঁকে 'নিগার' বলে সম্বোধন করে গালিগালাজ দিয়ে যে চিঠি লিখেছিল তা তিনি নমুনা স্বরূপে 'হিন্দু পেট্রিয়টে' ছাপিয়ে দিয়েছিলেন। আরও তাৎপর্যপূর্ণ কথা হল, হরিশচন্দ্র চিঠিটা ছাপিয়েছিলেন 'Americanism in Nadia' নাম দিয়ে। বাস্তবিক পক্ষে আমেরিকার দাস প্রভুদের সঙ্গে নীলকরদের বিশেষ কোনো তফাৎ ছিল না এবং একই মনোভাব নিয়ে তারা ভারতবাসীদের দেখত।

অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে হরিশচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে ও ১৮৬১ সালের ১৪ই জুন তারিখে মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর এই অকালমৃত্যু বাংলাদেশের পক্ষে বজ্রাঘাতের মতো। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ কতখানি বিচলিত হয়ে পড়েছিল তা তখনকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত মন্তব্যগুলি থেকেই বোঝা যায়।

কালীপ্রসন্ন সিংহ বলেছিলেন: 'ভারতভূমি তাঁহার অকাল মৃত্যুতে যত অপার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, ত্রিংশত সালের ভয়ানক জল প্লাবনে, বিগত বিদ্রোহে ও বর্তমান দুর্ভিক্ষে তত ক্ষতি স্বীকার করে নাই। তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার যত উন্নতি সাধন করিয়াছেন, সতীদাহ নিবারণে রাজা রামমোহন রায়, বিধবা বিবাহ প্রচলনে বিদ্যাসাগরও তত উপকার সাধন করিতে পারেন নাই।"

'সোমপ্রকাশ' (১৭ই জুন, ১৮৬১) লিখল: "তিনি একাকী নীল প্রধান প্রদেশের প্রজাগণকে রাক্ষস সদৃশ নৃশংস নীলকরদিগের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন, একথা বলিলে অত্যুক্তি বোধহয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এতদ্বিষয়ে তাঁহার এত উদ্যোগ, এত চেষ্টা ও এত পরিশ্রম ছিল যে, আমরা সেই অত্যুক্তি দোষ স্বীকারেও অসম্মত নই। তিনি নীলকরদিগের গর্ব চূর্ণ করিবার আদি কারণ সন্দেহ নাই।"

হরিশচন্দ্রের এক কালের সহকর্মী এবং হিন্দু প্যাট্রিয়টে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'মুখার্জি'স ম্যাগাজিনে' (জুন ১৮৬১) লিখেছিলেন:

"A thunderbolt has fallen upon native society. Hushed is every voice and fixed is every eye. The friend of the poor and the mentor of the rich, the spokesman, the patriot, the brave heart that defied danger and battled foremost in the strife of politics has been swept away like a vision from our aching eyes……our loss is great. We were only just pulling forth the buds and blossoms of a healthy existence. From the darkness of ages we were only faintly emerging into light, groping our way through a choking mass of prejudices and struggling fully, earnestly, through obstruction and difficulty. We had only recently learnt the value of political liberty……Hurrish Chunder Mukherjee was the soul of this movement."[১]

হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর বাংলার চাষীরাও তাদের মনের কথা এইভাবে ব্যক্ত করেছে ঃ

> "নীল বাঁদরে সোনার বাঙ্গলা করল এবার ছারেখার
> অসময়ে হরিশ ম'ল, লঙের টইল কারাগার।"

হরিশচন্দ্রের কাহিনী তাঁর মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ হয়নি। নীলকররা তাঁর প্রতি যে ক্ষিপ্ত হয়েছিল তা পূর্বেই বলা হয়েছে। আমরা আরও দেখেছি যে আর্চিবল্ড হিলস্ কর্তৃক হরমণি-হরণের ব্যাপারটা হরিশচন্দ্র হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। এইজন্য হিলস্ হরিশচন্দ্রের বিরুদ্ধে ১০ হাজার টাকা খেসারত দাবি করে মানহানির মামলা এনেছিল। মামলা চলাকালে হরিশচন্দ্রের মৃত্যু হয়। এতেও বীরপুঙ্গব হিলসের ক্রোধ কমল না। সে তখন হরিশচন্দ্রের বিধবা স্ত্রীকে প্রতিবাদী করে আলিপুর কোর্টে ১০ হাজার টাকা দাবি করে মোকদ্দমা চালাতে লাগল। এই মোকদ্দমার জন্য নিঃসহায় হরিশচন্দ্রের বিধবাকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। এই মামলা তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল না। বাঙালীর হিতার্থে হরিশচন্দ্র নির্ভীকভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন বলেই বাঙালীর শত্রুরা একজন নিঃসহায় বিধবার উপর অতি নীচভাবে তার প্রতিশোধ নিচ্ছিল। সেই দুঃসময়ে বাঙালীরা হরিশচন্দ্রের বিধবার পাশে এসে দাঁড়ায় নি। এমনকি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, হরিশচন্দ্র যার একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন, তারাও নয়।

খুব দুঃখের সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী এ বিষয়ে লিখেছেন ঃ "হিলসের পশ্চাতে নীলকরগণ ছিলেন, হরিশের বিধবার পশ্চাতে কেহই ছিল না। এ দেশীয়দের মধ্যে সে একতা কোথায়? কাজেই বন্ধুদিগের পরামর্শে হরিশের বিধবাকে আপসে মিটাইতে হইল। কিন্তু তথাপি বাদীর খরচা হিসাবে এক হাজার টাকা দিবার জন্য অঙ্গীকার করিতে হইল। এই এক হাজার টাকা অনেক কষ্টে সংগৃহ

করিয়া বিধবার বসতবাটীখানি ক্রোক হইতে উদ্ধার করিতে হইয়াছিল।" তৎকালীন বাঙালী শিক্ষিত 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণীর সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রীর এই সত্য ভাষণ তাঁদের পক্ষে খুব গৌরবজনক নয়।[৪৮]

খ. সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন ঃ

বঙ্গদেশের মধ্যশ্রেণীর ভিতর হইতে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি বহু দিকপাল আবির্ভূত হইয়াছেন সত্য, নিঃসন্দেহে তাঁহারা সমাজ সংস্কারের বিভিন্ন দিকে নূতন নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়া অশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন এবং শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু ইহাও নিঃসন্দেহে সত্য যে, তাঁহাদের কেহই নিজ শ্রেণীর গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর জাতীয় ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের সকলেরই ক্রিয়া-কলাপ ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নিজস্ব শ্রেণীর, অর্থাৎ মধ্য শ্রেণীর ভিতর সীমাবদ্ধ। এই জন্যই তাঁহারা যেমন ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহে অংশগ্রহণ করিতে পারেন নাই, সেইরূপ বাংলার জাতীয় সংগ্রাম অর্থাৎ নীলবিদ্রোহ হইতেও দূরে অবস্থান করিয়াছিলেন।

কিন্তু সকল দিক হইতে বিচার করিলে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্থান এই সকল সমাজ-সংস্কারকদের সকলের ঊর্ধ্বে। তাঁহারা ছিলেন সমাজ-সংস্কারক মাত্র, আর হরিশচন্দ্র ছিলেন জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী। হরিশচন্দ্রের জাতীয়তাবোদ পরবর্তীকালের মধ্যশ্রেণীর সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ নহে, তাঁহার জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি ছিল জাতির শতকরা নব্বইভাগ যে কৃষক তাহারা। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে মধ্যশ্রেণীর ভিতর হরিশচন্দ্রই একমাত্র ব্যক্তি যিনি কেবল কথায় নহে, কার্যত মধ্যশ্রেণীর সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর জাতীয় ক্ষেত্রে সচেতন জাতীয় নায়করূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কেবল শিক্ষিত ও সুবিধাভোগী মধ্যশ্রেণীকে লইয়াই যে জাতি নহে, সমাজের শতকরা নব্বইজন কৃষকই যে জাতির প্রধানতম অংশ, এই কৃষক জনসাধারণের জীবনই যে প্রকৃত জাতীয় জীবন, তাহাদের সংগ্রামই যে প্রকৃত জাতীয় সংগ্রাম তাহা একমাত্র হরিশচন্দ্রই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। হরিশচন্দ্রের সহকর্মী এবং 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে লিখিয়াছিলেন ঃ 'আমরা সম্প্রতি রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল্যে অনুধাবন করিতে শিখিয়াছি।...আর, হরিশচন্দ্র মুখার্জী ছিলেন সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণস্বরূপ' (**Mukherjee's Magazine, June, 1861** 'নীল বিদ্রোহ' হইতে সংগৃহীত পৃঃ ১০২)।

হরিশচন্দ্র ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণস্বরূপ এবং উহার অক্লান্ত যোদ্ধা। তাঁহার সংগ্রামী চরিত্রই তাঁহাকে বঙ্গদেশব্যাপী নীল-বিদ্রোহরূপ জাতীয় সংগ্রামের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছিল। বঙ্গদেশ হইতে নীলচাষের বীভৎস শোষণ ব্যবস্থা ও 'জাতির শত্রু' নীলকর দস্যুদের উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশের কৃষকগণ সংগ্রাম করিয়াছিল ধর্মঘট ও অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা, আর হরিশচন্দ্র সেই সংগ্রামে

যোগদান করিয়াছিলেন অস্ত্রশস্ত্র অপেক্ষা শতগুণ শক্তিশালী লেখনী ও নানাবিধ সাহায্য লইয়া। যখন বঙ্গদেশের মধ্যশ্রেণী বঙ্গদেশের সুদীর্ঘ ইতিহাসের বৃহত্তম জাতীয় সংগ্রামে নীরব দর্শকরূপে অবস্থান করিতেছিল, তখন এই মহান যোদ্ধা সংকীর্ণ শ্রেণী-গণ্ডীর ঊর্ধ্বে উঠিয়া নীলকর দস্যুদের বিরুদ্ধে কৃষকের এই জাতীয় সংগ্রামে সর্বস্ব পণ করিয়া যোগদান করিয়াছিলেন।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নীলচাষীদের সংগ্রাম পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হইলে ইংরেজ সরকারের পুলিস সহস্র সহস্র চাষীকে গ্রেপ্তার করিয়া বঙ্গদেশের সকল জেলখানা ভরিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাদের কুটীরসমূহ ভস্মীভূত করা হইয়াছিল। এই সময় বিদ্রোহীদের সাহায্যার্থে হরিশচন্দ্র তাঁহার পূর্ণশক্তি লইয়া অগ্রসর হন। সকল জেলা হইতে বিদ্রোহীদের প্রতিনিধিগণ কলিকাতায় আসিয়া হরিশচন্দ্রের নিকট হইতে পরামর্শ ও অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিতেন। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল লিখিয়াছেন :

'নীল হাঙ্গামার (!) সময় হরিশচন্দ্রের গৃহ অতিথিশালায় পরিণত হইয়াছিল। এই সময় 'প্যাট্রিয়টের' নিয়মিত খরচ চালাইয়া তাঁহার বেতনের যাহাকিছু অবশিষ্ট থাকিত তৎসমুদয়ই নীলচাষীদের সেবায় ব্যয়িত হইত (শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল : ভারতের মুক্তিসন্ধানী, পৃঃ ৮১)।

হরিশচন্দ্র নীলচাষীদের এই সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য সর্বস্ব পণ করিয়াছিলেন এবং সত্যই তিনি এই উদ্দেশ্যে তাঁহার সর্বস্ব ব্যয় করিয়াছিলেন। যখন তিনি সর্বস্বান্ত হইতেছিলেন তখন মধ্যশ্রেণীর শহুরে অংশ তাঁহার সংস্রব ত্যাগ করিয়া নীরব দর্শকরূপে নিরাপদ দূরত্বে দণ্ডায়মান ছিল।

তৎকালের 'ভাস্কর', 'সংবাদ প্রভাকর', 'সোমপ্রকাশ', 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' প্রভৃতি সংবাদপত্র দূর হইতে নীলচাষীদের প্রতি সহানুভূতি জানাইয়া ক্ষান্ত ছিল। কিন্তু হরিশচন্দ্রের 'প্যাট্রিয়ট' স্থান গ্রহণ করিয়াছিল নীল-বিদ্রোহের পুরোভাগে। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় হরিশচন্দ্রের অগ্নিবর্ষী ও জ্বালাময়ী রচনায় নীলকরগণ ও সরকার অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল এবং হরিশচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের উপায় খুঁজিতেছিল। এই সময় নীলকর হিলস্ অবিলম্বে হরিশচন্দ্রের বিরুদ্ধে দশ হাজার টাকার খেসারত দাবি করিয়া মানহানির মোকদ্দমা আরম্ভ করিয়া দেয়। ইতিমধ্যে অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে হরিশচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। এই মোকদ্দমা সমাপ্ত হইবার পূর্বে, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে মাত্র সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। ইহার পর নীলকরগণ হরিশচন্দ্রের নিঃস্ব বিধবা পত্নীর বিরুদ্ধে খেসারত দাবি করিয়া মোকদ্দমা চালাইতে থাকে। পুলিস খেসারতের দায়ে বিধবার বাসগৃহখানি ক্রোক করিলে তিনি নিরুপায় হইয়া কোন প্রকারে এক হাজার টাকা ঋণ করিয়া তাহা দ্বারা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন। এমন কি নিঃস্ব বিধবার এই ভয়ংকর দুর্দিনেও কলিকাতাবাসী মধ্যশ্রেণী তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া নীলকর দস্যুর

উৎপীড়ন হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হয় নাই। তাই শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন :

'হিলস্-এর পশ্চাতে নীলকরগণ ছিলেন, হরিশের বিধবার পশ্চাতে কেহই ছিল না" (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজঃ শিবনাথ শাস্ত্রী পৃঃ ২২৩—২৪)

হরিশচন্দ্র একাকী বাংলার কৃষকের এই একক জাতীয় সংগ্রামে নিজেকে নিঃশেষে দান করিয়া যেন সমগ্র মধ্যশ্রেণীর ভিতর অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছেন। তাই তৎকালের মধ্যশ্রেণীর সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল ব্যক্তিগণের অন্যতম কালীপ্রসন্ন সিংহ হরিশচন্দ্রের অকাল ও শোচনীয় মৃত্যু উপলক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন :

'ভারতভূমি তাঁহার অকাল মৃত্যুতে যত অপার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, ত্রিংশৎ সালের ভয়ানক জলপ্লাবনে, বিগত বিদ্রোহে ও বর্তমান দুর্ভিক্ষে তত ক্ষতি স্বীকার করে নাই। তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার যত উন্নতি সাধন করিয়াছেন সতীদাহ নিবারণে রাজা রামমোহন রায়, বিধবা বিবাহ প্রচলনে বিদ্যাসাগরও তত উপকার সাধন করিতে পারেন নাই (শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল : পূর্বোক্ত গ্রন্থ ৮২ পৃঃ)।"[২৯]

গ. ব্লেয়ার বি ক্লিং লিখেছেন—

The Hindoo patriot, the most important Indian—published newspaper of its day, was owned and edited by Harish Chandra Mukherjee from 1856 to 1861 (Manmathanath Ghosh, Life of Grish Chunder Ghosh pp. 80-83). Although the Hindoo Patriot was from the first hostile toward indigo planters, it did not engage in a systematic campaign against indigo until 1853. Its correspondents roved the indigo districts publicizing the incompetence and partiality of the district officials, and frequently the Lieutenant Governor acted upon abuses first brought to light in the pages of the Hindoo Patriot. In its antiplanter campaign the Hindoo Patriot followed thel ead of the Indian Field, founded in March 1853. The Indian Field, owned by an American merchent, Seth A Apcar, had a number of liberal Britishers on its editorial staff. Its political editor was Kissory Chand Mittra, a disciple of Rammohan Roy and Dwarkanath Tagore, who was intellectually interested in improving the lot of the peasantry. Both Harish Chandra Mukherjee and Kissory Chand Mittra were members of the central committee of the British Indian Association. A Bengali weekly, Somprakash, also took an active role in campaigning

against the planters. Long after the other two newespapers had lost interest in the peasantry, Dwarakanath Vidyabhusan, the editor of Somprakash, continued to champion the peasantry and remained their ally during later disputes between ryots ann zamindars.

The Planters through their newspapers accused the "Anti-British Association," (Englishman, Aug. 2 and 9, 1860), as they called it, of instigating the ryots to combine against indigo cultivation, Undoubtedly, individual members of the British Indian Association did assist the ryots by supporting mukhtars in the mufassal courts and by sheltering those ryots who come to Calcutta to present petitions. But, as Harish chandra Mukherjee once wrote, the actual aid afforded fell far short of the clamor which was raised about it on all sides. "The balance of trade in public spirit and political agitation is in favour of, not against, Calcutta." (Hindoo Patriot, March 24, 1860), The District Magistrate of Nadia, william James Herschel, asserted that 'by common report' mukhtars pleading for the ryots were receiving salaries of 100 rupees per month from the British Indian Association. (R. I. C., A 2820-27. Herschel added that the new mukhtars 'have certainly not abused their position ; on the contrary, I think they have done good by controlling their clients ; and on the whole, I was glad to have them, as without them I Should have been in a very disagreeable position on the bench.' Ibid, A 2828.) But the Association was quick to deny any 'Connection whatever with any such mukhtars, agents or emissaries…and deep as is the interest which in common with others the Association feels in the question, it has felt it its duty to rigidly abstain from taking a part in the present movement. [Englishman, July 16 and Aug. 9, 1860 ; British Indian Association, Monthly General Meeting (Sep, 6, 1860)]. Other than presenting petitions to the Government opposing legislation designed for the exclusive benefit of the indigo planters, the Association did not officially aid the ryots on the other hand, members of

the Association acting independently furnished the peasants with considerable aid. Of these Harish Chandra Mukherjee was the most effective, and his editorials raised the indigo disturbances from the level of a labour dispute to that of a political contest. One of his eulogistic editorials reads : Bengal might well be proud of its peasantry······wanting power, wealth, political knowledge and even leadership, the peasantry of Bengal have brought about a revolution inferior in magnitude and importance to none that has happened in the social history of any other country, ··With the Government against them, the law against them, the tribunals against them, the press against them, they have achieved a success of which the benefits will reach all orders and the most distant generations of our countrymen. And all this they have done by sheer force of virtue, by patience, perseverance and fortitude, without committing a single crime-almost a single act of violence (Hindoo Patriot, May 19, 1860.)

The activities of Harish Chandra are a landmark in the history of Indian political development. In addition to publishing stirring editorials, Harish Chandra freely gave advice and encouragement to the scores of peasants who came to visit him at the Hindoo Patriot office in Calcutta. He helped to support mukhtars in the mufassal courts by paying them for their services as mewspaper correspondents. [R. I. C. A. 3871-86, (Harish chandra Mukherjee) ; Hindoo Patriot, April 21, 1860], Here, for the first time, as Indian of the urban middle class was acting as a spokesman for the peasansry. The indigo disturbances mark the beginning of a contest for the political leadership of rural Indian between the paternalist Brisish district officer and the middle-class urban Indian.[৫০]

ঘ. অচেনা মিত্র লিখেছেন—

বৃটিশ শাসনকে স্বীকার ক'রে নিয়ে, এমন কি তাকেই আমাদের দেশের প্রগতির পক্ষে অপরিহার্য মনে ক'রে নিয়ে হরিশ মুখোপাধ্যায় বৃটিশের সমালোচনা করতে রাজি ছিলেন। বৃটিশের আইন কানুন যে তাদের স্বার্থেই রচিত, কোন মহান আদর্শের তাড়নায় নয়, একথাটা তিনি কখনোই মানতে পারতেন না বরং সেই আদর্শের মাপকাঠিতেই বৃটিশকে বিচার করতেন।

এবং এই দৃষ্টিভংগি থেকেই তিনি নীলবিদ্রোহে নীলচাষীদের পক্ষ নিয়েছিলেন।

কথাটা শুনতে যতোটা অসম্ভব, আসলে তা নয়। নীলবিদ্রোহের চরিত্রের মধ্যেই আসল কথাটা লুকানো। 'এই আন্দোলনের ক্রমবিকাশে তিনটি সুস্পষ্ট স্তর লক্ষণীয় ঃ প্রথম পর্যায় গণদরখাস্ত, আবেদন নিবেদন ; দ্বিতীয় পর্যায় ঃ ধর্মঘট এই দুটিই অর্থনৈতিক স্তর ; তৃতীয় পর্যায় ঃ কৃষক বিদ্রোহ ও রাজনৈতিক স্তর।' (পৃঃ ১৩৭, প্রমোদ সেনগুপ্ত ঃ নীলবিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ)। একমাত্র ঐ তৃতীয় পর্যায়ে গিয়ে তবেই এ আন্দোলন সামগ্রিকভাবে বৃটিশ বিরোধী চরিত্র অর্জন করে। কিন্তু তা সত্বেও মহাবিদ্রোহের মতো এ বিদ্রোহ কখনোই বৃটিশ শাসন উৎখাতের সচেতন উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচালিত হয় নি। 'নীল আন্দোলন সুরু হয় নীলকরদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটা অর্থনৈতিক আন্দোলন হিসাবে, ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে নয়।' (পৃ ১৪৯, ঐ) মহাবিদ্রোহ আর নীলবিদ্রোহেব এই প্রকৃতিগত ফারাকটুকু মনে রাখলে হরিশ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়াকে সহজে বোঝা যায়।

আমরা দেখেছি মহাবিদ্রোহের ঠিক কোন্ জিনিষটা হরিশের কাছে আপত্তিকর মনে হয়েছিল। তিনি সে বিদ্রোহের বৃটিশবিধ্বংসী রাজনৈতিক চরিত্রটাকে বরদাস্ত করতে পারেন নি।

কিন্তু নীলবিদ্রোহ সম্পূর্ণ অন্য চেহারা নিয়ে ফুটে উঠেছিলো তাঁর কাছে। এ আন্দোলন বৃটিশ শাসন বিরোধী নয়, নীলকর বিরোধী, নীলকরদের তিনি বৃটিশ নামের অযোগ্য বিবেচনা করতেন। তাঁর কাছে তাই বৃটিশ ন্যায় পরায়ণতার ব্যত্যয়টাই প্রধান হয়ে দেখা দিল। কাজে কাজেই নীলচাষীরা যখন আবেদন-নিবেদন-দরখাস্ত জানাতে শুরু করে দেয়, হরিশ তখন সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতে দ্বিধাবোধ করেননি। তাঁর মনোভাবটা এই রকম যে বৃটিশ অতি মহৎ জাতি, কিন্তু শয়তান নীলকরগুলো সব প্রহ্লাদকুলে দৈত্য. বৃটিশের আইনকানুন কিছুই মানেনা তারা। এদের শায়েস্তা করতে হবে, এবং তার জন্য আইনই যথেষ্ট।

ইণ্ডিগো কমিশনের কাছে তিনি যে জবানবন্দী দিয়েছিলেন, তাতেও একথা খুব স্পষ্ট করেই বলেছিলেন যে, 'আমি তাহাদিগকে [নীলচাষীকে] সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম যে. তাহারা কখনো কোন হাঙ্গামা কিংবা আইন বিরুদ্ধ কাজে প্রবৃত্ত না হয়। আমি তাহাদিগকে আরও বুঝাইলাম যে উক্ত ১১ আইন অল্পকালের জন্য বহাল থাকিবে ; এবং ভবিষ্যতে ভাল আইন হইবার সম্ভাবনা আছে।' (পৃঃ ৩৮-৩৯ ; 'এক্ষণ', পৌষ মাঘ, ১৩৭৭)। অতএব বিদ্রোহের তৃতীয় অর্থাৎ রাজনৈতিক পর্যায়টিকে তিনি আদৌ সমর্থন করেন নি।

সাধারণভাবে বৃটিশ, আর বিশিষ্টভাবে নীলকরদের যে তিনি আলাদা করে দেখতেন সে প্রসঙ্গে তাঁর নিজের উক্তি এই—We have always regretted the circumstances which make the indigo planter the chief

representative of the independent British community in India in the eyes of the people.

...As a merchant the independent Englishman seems commissioned to diffuse wealth in our village and towns. As a zemindar he is generally more indulgent, more considerate than the native landholder. He is a sure and valuable friend of the artisan. But while an indigo planter he represents and he is an active agent of a system of organized fraud and oppression. [ভাবানুবাদ: যে সমস্ত পরিস্থিতির দরুণ নীলকররা ভারতের জনগণের চোখে স্বাধীন বৃটিশ সম্প্রদায়ের প্রধান প্রতিনিধি হিসেবে পরিগণিত হয়, আমরা বরাবরই সে সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করে আসছি।

...বণিক হিসেবে স্বাধীন ইংরেজরা আমাদের গ্রামে গঞ্জে দু হাতে সম্পদ ছড়ানোর জন্যই যেন নিযুক্ত। জমিদার হিসাবে তাঁরা নেটিব জমিদারদের তুলনায় সাধারণতঃ বেশি উদার ও বিবেচক। কারিগরদের মূল্যবান ও নির্ভেজাল বান্ধব তাঁরা। কিন্তু যখনই নীলকর হিসেবে আসেন, তখনই তাঁরা সংগঠিত জোচ্চুরি আর অত্যাচারের একটা ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করেন। বস্তুতঃ সেই ব্যবস্থারই সক্রিয় প্রতিভূ তাঁরা। (পৃঃ ১৯৩)]

বণিক হিসাবে স্বাধীন (অর্থাৎ কোম্পানীর বা সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের বাইরে যাঁরা ব্যবসা করতেন) ইংরেজরা শুধুই দুহাতে সম্পদ ছড়াতো না; তারা দেশী জমিদারদের থেকে বুদ্ধিমান হলেও মোটেই বিবেচক আর উদার ছিলো না; কারিগরদের অন্যতম শত্রু ছিলো তারাই; এগুলো ইতিহাসের সত্য। তেমনই এটাও ইতিহাসের সত্য যে হরিশের পক্ষে এ সত্যকে স্বীকার করা সম্ভব ছিল না তাঁর শ্রেণী চরিত্রের কারণে। এই উক্তি থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে কেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী না হওয়া সত্বেও হরিশ নীলকরদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে কসুর করেন নি।

কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে তিনি দেখেছিলেন যে বৃটিশ শাসক আর নীলকরদের মধ্যে বস্তুতঃ কোনি স্বার্থের গরমিল নাই। তিনি বৃটিশ সরকারের কাছে (ততদিনে কোম্পানীর হাত থেকে সরাসরি মহারাণীর হাতে চলে গেছে ভারতবর্ষ) জানতে চেয়েছেন কেন তাদের ম্যাজিস্ট্রেটরা 'নিরপেক্ষ' বিচারের সময় নীলকর সাহেবের পাশে বসে খোশ গপ্পো করে, কেন নীলকরের বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে বল্-নাচে সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের এতো আগ্রহ। বৃটিশ সরকার আর সাহেবদেব মধ্যকার হরিহরাত্মা সম্পর্ক নিয়ে অনেক বিদ্রূপ, অনেক টিপ্পনী তাঁর কাগজে বেরিয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও তিনি কখনোই প্রাণে ধরে বলতে পারলেন না যে বৃটিশ সরকারের ন্যায়পরায়ণতা ব্যাপারটা ধাপ্পা, বৃটিশ সরকারের আর নীলকরের স্বার্থ একই। ঘটনা হিসাবে যেটা দেখেছেন, তাকেও মেনে নিতে পারেন নি তিনি।

মানা সম্ভব ছিলো না তাঁর পক্ষে। কেননা ঐ না-মানাটার ওপরেই তো দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সকল চিন্তা-ভাবনা, সমস্ত প্রগতিশীলতা। যে বৃটিশ শাসন তাঁর শ্রেণীকে সভ্য বিধি ব্যবস্থার অমৃতফল খাইয়েছে, তার প্রগতিশীলতাকে তিনি কোন্ মুখে অস্বীকার করবেন?

অর্থাৎ এই মূল প্রশ্নে তাঁর সংগে রামমোহন কিংবা দ্বারকানাথের মতো ঝানু মুৎসুদ্দির কোন প্রভেদ ছিল না ঃ অসভ্য ভারতবাসীকে সুসভ্য করার উদ্দেশ্যেই ইংরেজের এদেশে আগমন। নীলকরদের বিরুদ্ধে নীলচাষীদের সমর্থন করার সময়েও এ ব্যাপারে তাঁর কোন দ্বিধা ছিলো না।

কিন্তু এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে, এই সীমিত গণ্ডিটুকুর মধ্যে থেকেও তিনি যে ভূমিকা পালন করতে পেরেছিলেন তা অবিস্মরণীয়। হিন্দু প্যাট্রিয়টে নীলকরদের অত্যাচারের, কৃষকদের বিদ্রোহের বিভিন্ন কাহিনীই শুধু তিনি দিনের পর দিন প্রকাশ ক'রে যান নি, সক্রিয়ভাবে তাদের সাহায্য করেছেন। ইংরেজের অত্যাচারের ভয়ে কোনো উকিল চট্ ক'রে নীলচাষীদের হয়ে মামলা লড়তে চাইতেন না। হরিশচন্দ্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, এমন কি অর্থব্যয় করে উকিল জোগাড় করে মামলা করতেন, স্বয়ং নীলচাষীদের আইনের বিভিন্ন ব্যাপারে সাহায্য করতেন, পরামর্শ দিতেন। আইনের সীমার মধ্যে থেকে যতোদূর যাওয়া যায়, তিনি যেতে তৈরী ছিলেন। এইজন্য আক্ষরিক অর্থে আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে সর্বস্ব পণ ক'রে কাজে নেমেছিলেন তিনি। শিবনাথ শাস্ত্রী এ প্রসঙ্গে লিখেছেন সে সময় তাঁর বাড়িতে…'দিবারাত্রি নীলকর প্রপীড়িত প্রজাবৃন্দের সমাগম। তাঁহার ভবন সর্বদা লোকারণ্য থাকিত। কাহারও দরখাস্ত লিখিয়া দিতে হইতেছে, কাহাকেও উকিলের নিকট সুপারিশ চিঠি দিতে হইতেছে, কাহারও মোকদ্দমার হাল শুনিতে হইতেছে; বিশ্রাম নাই। অনেক দিন অফিস হইতে ফিরিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত আর অফিসের পোষাক বদলাইবার সময় পাইতেন না।…তাঁহার জননী এই গুরুতর শ্রমের প্রতিবাদ করিয়া টিকটিক করিতেন। তদুত্তরে তিনি বলিতেন—'মা, তোমার সব কথা শুনবো কিন্তু এই গরীব প্রজাদের জন্য যা করছি তা বাধা দিও না, ওরা ধনে প্রাণে সারা হলো, একাজ না করে আমি ঘুমাতে পারবো না।' (পৃঃ ২২৩, পূর্বোক্ত গ্রন্থ) এমনকি তাঁর অকাল মৃত্যুর একটা অন্যতম কারণ এই অমানুষিক পরিশ্রম।

ধর্মঘট সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নীলচাষীদের যে অনমনীয় সংঘশক্তির ও নৈতিক দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিলো তাকে হরিশের মতো ক'রে আর কেউ কি সেদিন উপলব্ধি ও গৌরবান্বিত করতে পেরেছিলেন? ভোলার নয় সেই দীপ্ত গভীর অনুভবের বাণীটি,—বাংলাদেশ তার কৃষকদের সম্পর্কে নিশ্চয়ই গর্বিত হতে পারে। নীল আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের রায়তরা যে নৈতিক শক্তির এত সুস্পষ্টভাবে পরিচয় দিয়েছে তা আর কোন দেশের কৃষকের মধ্যে দেখা যায় না। দরিদ্র, রাজনৈতিক জ্ঞান ও ক্ষমতাবিহীন, নেতৃত্বশূন্য হয়েও এইসব কৃষকেরা এমন একটা বিপ্লব ঘটাতে সমর্থ হয়েছে যা গুরুত্বে এবং

মহত্ত্বে কোন দেশের সামাজিক ইতিহাসের বিপ্লবের তুলনায় নিকৃষ্ট নয়। তাদের এমন শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে যাদের হাতে ছিল দুর্ধর্ষ ক্ষমতার সবরকম উপকরণ। সরকার ছিল তাদের বিরুদ্ধে, সংবাদপত্রগুলি তাদের বিরুদ্ধে, আইন আদালত তাদের বিরুদ্ধে—এতগুলি শক্তির বিরুদ্ধে তারা যে সফলতা অর্জন করতে পেরেছিল তারই সুফল সমাজের সকল শ্রেণী ও দেশের ভবিষ্যৎ বংশধররা উপভোগ করতে পারবে।…ইতিমধ্যেই রায়তদের অত্যাচারীরা বুঝতে পেরেছে যে তাদের স্বেচ্ছাচারী রাজত্বের অবসান হতে চলেছে।…এই বিপ্লবের জন্য তাদের অসংখ্য দুর্ভোগ ভোগ করতে হচ্ছে। তবু রায়তরা মাথা নামায় নি।…যদি তারা আর কিছুদিন এইভাবে নির্যাতন সহ্য করতে পারে, তাদের সামাজিক অবস্থার একটা বিপ্লব এসে যাবে যার প্রতিক্রিয়া দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। (প্রমোদ সেনগুপ্ত কর্তৃক নীল বিদ্রোহ গ্রন্থে উদ্ধৃত। তারই অনুবাদ। পৃঃ ৯৬—৯৭)।

যদিও রায়তরা যে কেবল নির্যাতন 'সহ্য' করেনি, তারা যে ফিরে মারও দিয়েছিল, সে বিষয়ে হরিশ নীরব তবু একথা অনস্বীকার্য যে নীল বিদ্রোহের সংগঠিত ঐক্যবদ্ধ রূপটি সম্পর্কে এমন কথা সে সময়ে একমাত্র হরিশই বলতে পারতেন। আর তা পারতেন বলেই বাংলার সংগ্রামী কৃষক তাঁর মৃত্যুতে হাহাকার করে উঠেছিল, তাঁকে আপনজনের দুর্লভ স্বীকৃতি দিয়েছিল। হরিশচন্দ্র সম্পর্কে এইটাই সবচেয়ে বড়ো কথা। যাকে তিনি অন্যায় মনে করেছিলেন, তার বিরুদ্ধে লড়াইএ তাঁর কোন রকম দ্বিধা ছিল না। তার জন্য জনগণের সঙ্গে হাত মিলাতে তাঁর দ্বিধা ছিল না।

আর এইখানে এসে রামমোহন—দ্বারকানাথ এমনকি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর প্রভেদটা স্পষ্ট হয়ে যায়। বৃটিশের প্রগতিশীলতায় তিনি এদের চেয়ে কিছু কম মুগ্ধ ছিলেন না। কিন্তু বৃটিশ ন্যায়পরায়ণতায় যেখানেই ঘাটতি দেখেছেন, সেখানেই জনগণের স্বার্থে গর্জে উঠতে পেরেছিলেন হরিশ, পূর্বোক্তরা যা পারেন নি। নীল বিদ্রোহের সময় বিদ্যাসাগর জীবিত। তাঁর কোনরকম প্রতিক্রিয়ার কথা জানা যায় কি? কি করে তিনি নীরব থাকেন এতবড় একটা ঘটনায়! রামমোহন, দ্বারকানাথ প্রমুখের ভূমিকা তো সুবিদিত। যে নীলচাষকে হরিশ 'সংগঠিত জোচ্চুরি আর অত্যাচারের এক ব্যবস্থা' বলে বর্ণনা করেছিলেন, এঁরা তাকেই ভারতের 'উন্নতি'র সহায়ক বলে বর্ণনা করতে পেছপা হননি অনেক আগেই। এখানেই হরিশের অনন্যতা।

ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালিদের মেরুদণ্ডহীনতা যে কোন্ ভয়ংকর পর্যায়ে উঠেছিল, হরিশের মৃত্যু ও তৎপরবর্তী ঘটনাবলী তার উদাহরণ। আর্চিবল্ড্ হিলস্ নামক নীলকর কোনো এক গাঁয়ের বধূর সম্মান হানি করে। হরিশচন্দ্র এ ঘটনাটি তাঁর কাগজে প্রকাশ ক'রে দেন। (নীলদর্পণ নাটকের ক্ষেত্রমণি ধর্ষণের দৃশ্যটির উৎস এই ঘটনা) এই 'অপরাধে' উক্ত সাহেব হরিশের বিরুদ্ধে মানহানি(?)র মামলা আনে সেই বৃটিশ আদালতে, যার ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে হরিশ

মাত্রাতিরিক্ত রকমে মুগ্ধ ছিলেন। মামলা শেষ হবার আগেই হরিশের মৃত্যু হয়। শয়তান হিলস্ হরিশের নিঃসম্বল বিধবাকে পর্যন্ত টেনে আনে মামলার মধ্যে। ভদ্রমহিলার একমাত্র অবলম্বন বসত বাড়িটি ক্রোক হওয়ার উপক্রম হয়। এই গোটা ব্যাপারটায় আমাদের কৃতবিদ্য, প্রগতিশীল, সমাজ সংস্কারকরা কিংবা 'হিন্দু কলেজী' উগ্রপন্থীরা, অথবা জমিদার মুৎসুদ্দিদের প্রতিষ্ঠান বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন (হরিশ স্বয়ং যার সভ্য ছিলেন) কেউই একটি কথাও বলেন নি।[৫১]

ঙ. চিত্তব্রত পালিত লিখেছেন—

"The role of Harish Mukherjee, the editor of the Hindu Patriot, in the movement appears to be very interesting from the evidence. He had sent lawyers for the aid of the ryots to the indigo districts, The ryots had gathered in his calcutta residance for advice from distance, and he had written out their petitions to the Government and penned the most scorching editorials against the planters to rouse public opinion. This activity has been simply explained by his concern for the revolt. But in his personal letter to Forlong, a leading planter of Nadia, produced before the Indigo commission by the latter, he declared himself as the party spokesman of the British Indian Association. The letter is worth quoting.

...No English gentlemen in Bengal stands higher in the estimation of his native fellow subjects than yourself. In private society when the system of indigo planting in lower Bengal forms the topic of conversation and the conduct of planters is, as is generally the case, condemned, Mr. James Forlong is almost always accepted by name and so even in public discussions in which our countrymen take any part... you cannot blame us if we measure your conduct and criticise it by a higher standard than we think of testing the conduct of our own countrymen. It is this principally which combined with (I confess) party purposes that will account for the severity of the articles in the Hindoo Patriot on Indigo planting.

I have mentioned party purpose. You will yourself, I am sure, recognise a sign of future improvement in the capacity manifested of late by some of our countrymen though very

few of them and their disposition to mix in politics. One cannot interfere, however, in political matters without being more or less a partisan and I feel sure you will agree with me that it is for better to be a partisan than to be the cold apathetic being Bengalies so often are.

Source : Badoo Harish chandra Mukherjee to J. Forlong, 12 March 1859 in papers relating to Indigo cultivation in Bengal. P. 163.

Men like Harish Mukherjee and Kristodas pal illustrated the theory of circulation of elities. The Zamindars needed. men of calibre to write for them. Both died in Zamindary harness."[৫২]

নীলবিদ্রোহে হরিশচন্দ্রের ভূমিকা সত্যই গৌরবজনক। সিপাহী বিদ্রোহ বা সাঁওতাল বিদ্রোহে তাঁর যে ভূমিকা তার সাথে নীলবিদ্রোহে তাঁর ভূমিকার অনেকখানি অসঙ্গতি আছে। কিন্তু এই অসঙ্গতির উৎস কি? শুধু হরিশচন্দ্র নন, আমরা দেখেছি যে বাংলার বহু শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী নীলবিদ্রোহে নীলকরদের বিপক্ষে এবং দেশীয় রায়তদের পক্ষে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। হরিশচন্দ্রসহ এই বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাকে আমরা কি সত্যই বৈপ্লবিক ভূমিকা বলতে পারি? নীল আন্দোলন কি সত্যই বৃটিশ বিরোধী সংগ্রাম?

নীলবিদ্রোহের চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে সম্প্রতিকালের একজন গবেষক প্রমাণ করেছেন যে নীলবিদ্রোহ প্রকৃত প্রস্তাবে বৃটিশ বিরোধী সংগ্রাম নয়।[৫৩] ইংল্যাণ্ডে তখন শিল্প-পুঁজি ও বাণিজ্য-পুঁজির চরম দ্বন্দ্ব চলছিল। শিল্প-পুঁজির প্রতিনিধিরা ভারতবর্ষে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া কারবার ভেঙে দিয়ে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দাবি করতে শুরু করেছিল। তারা বৃটিশ পার্লামেণ্টে একটাব পর একটা অভিযোগ আনছিল ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে। বাণিজ্য-পুঁজির প্রতিনিধিরা ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছিল। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্ষমতা হ্রাসের জন্য বৃটিশ পার্লামেণ্টে একটার পর একটা আইন চালু হচ্ছিল। ভারতের ক্ষেত্রে বাণিজ্য পুঁজির ন্যায়-নীতি বিগর্হিত অবাধ লুণ্ঠন বন্ধ করে শিল্পপুঁজির প্রতিনিধিরা অধিকতর উন্নত প্রণালীর বৈজ্ঞানিক শোষণ প্রক্রিয়া চালু করতে চেয়েছিল।[৫৪]

এই বৈজ্ঞানিক শোষণ প্রক্রিয়ার স্বার্থেই বাঙলাদেশে নীল চাষ বন্ধ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। কারণ—

"নীলকরেরা গ্রাম বাঙলায় মধ্যযুগীয় বর্বর প্রথায় অবাধ লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ, রায়ত হত্যা ইত্যাদি কাজ প্রকাশ্যে চালিয়ে যাচ্ছিল। রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলার পক্ষে তারা হয়ে উঠেছিল বিপজ্জনক। প্রসাশনের সঙ্গে যোগসাজসে তারা গ্রামের

বুকে সমান্তরালভাবে যেন একটা 'দ্বিতীয় সরকার' চালিয়ে যাচ্ছিল। রায়তকে বিচার করা ও শাস্তি দেবার আইন তারা নিজের হাতেই তুলে নিয়েছিল। বলা-বাহুল্য এ রকম অরাজক বিশৃঙ্খল অবস্থা পুঁজিবাদী সরকার তার নিজের শ্রেণী-স্বার্থেই সহ্য করতে রাজী থাকে না। শোষণের স্বার্থেই তারা একটা আপাত নিরপেক্ষ 'আইনের শাসন' প্রতিষ্ঠা করতে চায়, অবাধ লুণ্ঠনের উলঙ্গমূর্তিকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করার চেষ্টা করে। সিপাহী বিদ্রোহোত্তর ভারতের নতুন প্রশাসন সেই চেষ্টাই শুরু করেছিল। নীলকরদের আচরণের দ্বারা এবং নীলকরদের সঙ্গে প্রশাসনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দ্বারা প্রশাসনের 'ভাবমূর্তি' যে গভীর কলঙ্ক-কালিমায় লিপ্ত হয়েছিল—জে পি গ্রাণ্টের প্রশাসন তা থেকে বাংলা সরকার তথা পুঁজিবাদী বৃটিশ বণিকদের মর্যাদাকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। ইণ্ডিগো কমিশনের রিপোর্টের উপর 'মিনিট' লিখতে গিয়ে তিনি নিজেই মন্তব্য করেছেন—'নীলকরেরা' প্রায়ই রায়তদের ধরে নিয়ে গিয়ে 'অদৃশ্য' করে দেয়—তার কোন প্রতিকার হয় না। তাছাড়া অন্যান্য অপরাধ তো আছেই।[৫৫]

সিপাহী বিদ্রোহের পরে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্ষমতাচ্যুতি এবং মহারানী ভিক্টোরিয়া তথা বৃটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক ভারতের শাসনভার গ্রহণের ফলে শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনও ঘটেছিল। সিপাহী বিদ্রোহের সংকেতকে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গেই স্মরণে রেখেছিল বৃটিশ পার্লামেণ্টের কর্তাব্যক্তিরা। নীল বিদ্রোহের সময় তাই আমরা দেখতে পাই গ্রাণ্ট, সীটন্‌কার, ইডেন, হার্সেল প্রমুখ রাজপুরুষেরা নীলকরদের বিপক্ষেই থেকেছেন। ১৮৫৮ সালে বাঙলার লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর পদে নিযুক্ত হয়ে জন পিটার গ্রাণ্ট রায়তদের প্রতি প্রকাশ্য সহানুভূতি প্রদর্শন করেছিলেন। ইডেন এবং হার্সেল প্রমুখ জেলাশাসকেরা "নীলচাষ কৃষকের ইচ্ছাধীন" এই মর্মে সরকারী ঘোষণা জারী করেছিলেন। অধ্যাপক তপোবিজয় ঘোষ নানা তথ্য প্রমাণের দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে জে পি. গ্রাণ্টের অনুমোদনক্রমেই বাঙলা সরকারের সেক্রেটারী সিটনকার নীলদর্পণ অনুবাদ করিয়েছিলেন এবং অনুদিত নীলদর্পণ সরকারী খামে সরকারী শীলমোহর যুক্ত হয়ে সরকারী ব্যবস্থাপনায় নানা স্থানে প্রেরিত হয়েছিল।[৫৬]

নীলকরেরা প্রকাশ্যে জেমস লঙের বিরুদ্ধে মামলা করলেও তাদের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য ছিল জে. পি. গ্রাণ্ট এবং সীটন্‌কারকে জব্দ করা। নীলকররা জে. পি. গ্রাণ্টের নামে নানা অপবাদ ছড়াতে থাকে। বলতে থাকে যে গ্রাণ্ট হলেন চেঙ্গিস খাঁ, নাদিরশা এবং তৈমুরলঙের মিশ্রণে গঠিত এক সাংঘাতিক জীব। 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকায় জে. পি গ্রাণ্টের নামে একটি তীব্র আক্রমণাত্মক ছড়া প্রকাশিত হয়ঃ

Governor Grant is a terrible man
As he reigns in Alipore Hall
A compound of Chengis and Kublai Khan
.Tamerlane, Nadir and all
Says J. P
Grant Sez he
Drive me the Planters into the sea.

নীল কমিশনের সদস্যদের নামের তালিকা আলোচনা করলে বোঝা যাবে যে এদের মধ্যে নীলকরদের বহু প্রতিনিধি ছিল না। এই কমিশনের সভাপতি হলেন ডব্লু. এস. সীটনকার—যাঁর মনোভাব ছিল নীলচাষের বিরুদ্ধে, ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় ইনি নীলচাষ ও নীলকরদের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করেন। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় সীটনকার সম্পর্কে লেখেন:

"He indeed once contributed to the Calcutta Review a paper condemnatory of the planting system and from that circumstance as well as from other incidents of his official career in the indigo districts it has been inferred that he bears a prejudice against the planters."[৫৭] স্যার রিচার্ড টেম্পলের সহানুভূতি ছিল রায়তদের প্রতি। সেই একই কথা প্রযোজ্য রেভারেণ্ড জে. সেল সম্বন্ধে। অন্য এক প্রতিনিধি চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি। কমিশনে নীলকরদের একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন ফারগুসন। এই রকম অবস্থায় স্বভাবতই নীলকরেরা নীল কমিশন সম্পর্কে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

উপরের তথ্যগুলি প্রমাণ করে যে নীলকর বনাম সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করেছিল। এই দ্বন্দ্বে হরিশচন্দ্র সহ বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা সরকারী প্রশাসন যন্ত্রেরই পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। ফলে নীলকর বিরোধিতা ব্রিটিশ বিরোধিতা বলে গণ্য হয় নি। শুধু বাঙালী বুদ্ধিজীবী নয়, বাঙালী জমিদাররাও নীলকরদের বিরুদ্ধতা করেছিলেন। সে ক্ষেত্রেও ঐ একই কারণ। তপোবিজয় ঘোষ লিখেছেন:

"বস্তুত—উনিশ শতকের নীল বিদ্রোহ 'রাজদ্রোহী' বা 'জমিদার দ্রোহী' হয়ে উঠেনি বলেই বাঙলার জমিদার শ্রেণী, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় (ঈশ্বর গুপ্ত থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত), খ্রীষ্টিয় মিশনারীগণ (জেমস্ লঙ্ যার উদাহরণ), বাঙালী পরিচালিত সমস্ত পত্র পত্রিকা (রামমোহন দ্বারকানাথ প্রসন্নকুমার ঠাকুর পরিচালিত সম্বাদ কৌমুদী, বঙ্গদূত, রিফর্মার ইত্যাদি বাদে), ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ও মহামেডান এসোসিয়েশন, ওয়াহাবী আন্দোলনের মুসলমান কৃষকগণ—সকলেই এই আন্দোলনের সামিল হয়েছিল। আর ঐ একই কারণে সাঁওতাল বিদ্রোহ বা বিদ্রোহের বিরুদ্ধতা করলেও বাঙালী বুদ্ধিজীবী সমাজ নীল বিদ্রোহের সহযোগী শক্তিরূপে দেখা দিয়েছিলেন। বাংলাদেশে নীল বিদ্রোহই ব্রিটিশ আমলের একমাত্র কৃষক বিদ্রোহ—যা পরিণামে জয়যুক্ত হয়েছিল। নীলকৃষকের দাবী মেনে নিয়ে বাংলা সরকার ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিল—নীলচাষ করা বা না করা চাষীর ইচ্ছাধীন, তাকে দিয়ে বলপূর্বক নীলচাষ করানো যাবে না। এরপরে (১৮৬১ সালের পরে) নীলচাষ ও নীলকরের অত্যাচার বেশ কিছুকাল অব্যাহত থাকলেও তার ধার বসে গিয়েছিল। বহু নীলকুঠি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নীল উৎপাদনে দ্রুত গতিতে হ্রাস পেয়েছিল।"[৫৮]

সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নীল বিদ্রোহে হরিশচন্দ্র যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তার কিছু স্বাতন্ত্র্য নিশ্চয়ই স্বীকার্য।

ক] হরিশচন্দ্রের কোনো ভূমিস্বার্থ ছিল না।

খ] নীল রায়তদের প্রতি তাঁর সহানুভূতিও ছিল অকৃত্রিম।

গ] নীলকর বনাম প্রশাসন যন্ত্রের দ্বন্দ্বে তিনি যে প্রশাসন যন্ত্রের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন তার পিছনে ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ সিদ্ধির ব্যাপার ছিল না।

টীকা

১. স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা। নরহরি কবিরাজ। পৃ ১৩২
২. বাংলাদেশের ইতিহাস (আধুনিক)। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। পৃ. ৭৫
৩. ঐ। পৃ. ৭৬-৭৭
৪. ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া। প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। পৃঃ ২৮-২৯
৫. Tensions in Bengal Rural Society. Chittabrata palit. P-197
৬. ঐ, পৃ P-119.
৭. বাংলা দেশের ইতিহাস (আধুনিক)। পৃঃ ৭৬
৮. Tensions in Bengal Rural Society. P-150-1
৯. R. I. C. Appendix, 17
১০. এক্ষণ, পৌষ মাঘ, ১৩৭৭, পৃঃ ৩৭
১১. Hindoo Patriot, 19. 5. 1860
১২. এক্ষণ ঐ. পৃঃ ৩৩
১৩. স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা। পৃঃ ১৩২-৩
১৪. History of Indigo Disturbance in Bengal with a full Report of the Neel Darpan case. Lalit Chandra Mitra, P-23
১৫. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম (১ম খণ্ড)। সুপ্রকাশ রায়। পৃঃ ৩৮৭
১৬. যশোহর খুলনার ইতিহাস (২য় খণ্ড)। সতীশচন্দ্র মিত্র। পৃঃ ৭৭৯
১৭. Freedom Movement in Bengal (1818-1904)। edited by Nirmal Sinha. P-438-448
১৮. A general Biography of Bengal Celebrities. Edited by Swapan Majumdar. P-91
১৯. যশোহর খুলনার ইতিহাস (২য় খণ্ড)। সতীশচন্দ্র মিত্র। শিবশঙ্কর মিত্র সম্পাদিত। পৃঃ ৭৯০
২০. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। শিবনাথ শাস্ত্রী। পৃঃ ৬৭৪
২১. Report of the Indigo commission. P-45-47.
২২. ঐ
২৩. হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং উনিশ শতকের নীল আন্দোলন। তপোবিজয় ঘোষ। অনীক। এপ্রিল, ১৯৮২। পৃঃ ১৬
২৪. Report of the Indigo Commission. P-45-47
২৫. তপোবিজয় ঘোষের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ১৬

২৬. ১৮৬৩ সালের ২৯শে জুলাই 'বেঙ্গলি' পত্রিকায় গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রবন্ধ—'How Patriots are served.'

২৭. Selections From the writings of Hurrish Chunder Mookerji. P-186-203.

২৮. ঐ, P-190

২৯. ঐ, P-191

৩০. ঐ, P-191-1

৩১. ঐ, P-193

৩২. ঐ, P-198

৩৩. ঐ, P-199

৩৪. ঐ, ঐ

৩৫. সাক্ষরতা প্রকাশনের দীনবন্ধু রচনা সংগ্রহ। পৃঃ ৩৩-৩৯

৩৬. Selections······P-200-1

৩৭. ঐ, P-194-5

৩৮. Hindoo Patriot, 19. 5. 1860

৩৯. Report of the Indigo Commission

৪০ Hindoo Patriot, 25. 2. 1860

৪১. জাতিবৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ, পৃঃ ১২৩

৪২. নীলদর্পণ, ৩য় অঙ্কের ৩য় গর্ভাঙ্ক।

৪৩. জাতিবৈর······পৃঃ ১২৩

৪৪। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ৩৭৫

৪৫। Friend of India, 13. 2. 1862

৪৬। A general biography of Bengal celebrities by Ramgopal Sanyal, P-82

৪৭। Bengal under the Lieutenant Governors (Vol. 2) by C. E. Buckland.

৪৮। নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ। প্রমোদ সেনগুপ্ত। পৃঃ ৯৮-১০৩

৪৯। ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম। সুপ্রকাশ রায়। পৃঃ ৪০৫-৭

৫০। The Blue Mutiny by Bair B. Kling, P-118-21

৫১। প্রস্তুতিপর্ব, ১৯৭৪, অচেনা মিত্রের প্রবন্ধ

৫২। Tension in Bengal Rural Society by Chittabrata Palit. P-144-5

৫৩। তপোবিজয় ঘোষের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

৫৪। রজনীপাম দত্তের India Today. P-116

৫৫। অনুষ্টুপ পত্রিকায় প্রকাশিত পূর্বোক্ত প্রবন্ধ।

৫৬। চতুষ্কোণ, মে ১৯৭৩, পৃঃ ১৩৮-৯

৫৭। Hindoo Patriot, 12. 5. 60

৫৮। অনীক প্রত্রিকায় প্রকাশিত পূর্বোক্ত প্রবন্ধ

দ্বাদশ অধ্যায়

কৃষি ও কৃষক ভাবনার ঐতিহ্য এবং হরিশচন্দ্র

মোগল আমলে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় কোন মধ্যস্বত্বভোগীর স্থান ছিল না। স্বভাবতই মোগল ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা কোন বংশানুক্রমিক জমিদারী স্বত্বের জন্ম দেয় নি। এবং জমির উপর দখলীস্বত্বের ভিত্তিতে কোন অভিজাতশ্রেণী গড়ে ওঠারও ব্যবস্থা ছিল না।[১] ইংরেজ আমলে কিন্তু এই ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। ১৭৬৫ সালে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মোগল সম্রাটের কাছ থেকে দেওয়ানী লাভ করে এবং বাংলা দেশে রাজস্ব আদায়ের ভার গ্রহণ করে। রাজস্ব আদায়ের ভার গ্রহণ করার পর ১৭৬৯ সালে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীদের প্রতি এক নির্দেশনামা জারী করে জানায় যে কর বৃদ্ধি করা কোম্পানীর উদ্দেশ্য নয়, নির্যাতিত কৃষকদের রক্ষা করাই তাদের আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির পর থেকেই কৃষকদের উপর নির্যাতনের মাত্রা শতগুণে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১১৭৬ সালে মন্বন্তর এরই জ্বলন্ত প্রমাণ। একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক এই দুর্ভিক্ষের জন্য স্পষ্টতই ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকে দায়ী করেন। তিনি জানিয়েছেন যে এদেশে দুর্ভিক্ষ অজ্ঞাতপূর্ব ঘটনা নয়, কিন্তু দেশীয় জনশত্রুদের সহযোগিতায় একচেটিয়া শোষণের বর্বরসুলভ মনোবৃত্তির অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ যে অভূতপূর্ব বিভীষিকার দৃশ্য দেখা দিল তা ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নি।[২] ইংরেজ বণিকদেব ভূমি-রাজস্ব নীতি কোন উদ্দেশ্যের দ্বারা কতখানি নির্মমভাবে নির্ধারিত হয়েছিল তাব প্রমাণ পাওয়া যাবে দুর্ভিক্ষের পরে বর্ধিত রাজস্ব আদায়ের চিত্র থেকে।

তবে বর্ধিত হারে রাজস্ব আদায় কিংবা নির্যাতন ইত্যাদির ফলে তখনও পর্যন্ত রাজস্ব ব্যবস্থা একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করানো যায় নি। এক-শালা বন্দোবস্ত ব্যর্থ হয়েছে, পাঁচশালা বন্দোবস্ত ব্যর্থ হয়েছে, ১৭৯০ সালের দশশালা বন্দোবস্ত ব্যর্থ হোল। ফলে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তা ব্যক্তিরা নতুন করে চিন্তা ভাবনা শুরু করলেন। গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশ ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কে এক নতুন প্রস্তাব ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে পেশ করেন এবং ১৭৯৩ সালে প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়। এই নতুন প্রস্তাবের নামই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল ব্যাপারটি এই রকম: জমিদাররা তাদের ভূসম্পত্তি ভোগ করবে চিরস্থায়ী শর্তে, খাজনা আদায় করবে রায়তদের কাছ থেকে, সরকারকে স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দেবে, নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির সূর্যাস্তের মধ্যে রাজস্ব জমা দিতে না পারলে তাদের ভূসম্পত্তি নিলাম হয়ে যাবে।[৩]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী স্থিরীকৃত হয় যে জমিদারেরা আদায়কৃত রাজস্বের নয়ের দশ ভাগ কোম্পানীর কাছে হস্তান্তরিত করবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূমি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটা আমূল পরিবর্তন
সূচিত হয়। ইতিপূর্বে জমির মালিক ছিল কৃষিকার্যরত কৃষক, এবার নতুন ব্যবস্থায় মালিক হলো সরকারের রাজস্ব আদায়কারী এজেন্ট বা জমিদার। নতুন ব্যবস্থায় জমিদারেরা স্বেচ্ছানুসারে জমি ক্রয়-বিক্রয়, বিলি ব্যবস্থা সব কিছু করারই অধিকার লাভ করে।[৪] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল উদ্দেশ্যগুলি এই রকম[৫]:

১] সরকারী রাজস্বের নিরাপত্তা বিধান করা।

২] যাঁদের হাতে প্রচুর টাকা আসে, শহরের সেই নতুন গজিয়ে ওঠা ধনিক শ্রেণীকে জমিদারী ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বের অধিকার ক্রয় করতে এই অর্থ নিয়োগে উৎসাহিত করা।

৩] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে এমন এক শ্রেণীর জমির মালিক সৃষ্টি করা যাঁরা নিজেদের স্বার্থেই বৃটিশ শাসনের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন এবং যাঁরা কখনোই ইংরেজ শাসনের পরিবর্তন কামনা করবেন না।

সঠিকভাবেই ইংরেজ শাসকরা উপলব্ধি করেছিলেন যে এদেশে ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য অনুগত নতুন শ্রেণীর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। লর্ড কর্ণওয়ালিশ নিজেই সে কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছিলেন, : "আমাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই এদেশের ভূস্বামীবর্গকে আমাদের সহযোগী করে নিতে হবে। যে সমস্ত ভূস্বামী লাভজনক ভূসম্পত্তি নিশ্চিন্ত মনে এবং সুখে শান্তিতে ভোগ করতে পারে তাদের মনে এর কোনরকম পরিবর্তনের ইচ্ছা জাগতেই পারে না।[৬]

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিংকও এই নতুন শ্রেণীর ভূমিকা স্বীকার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: "আমি এ কথা বলতে বাধ্য যে ব্যাপক গণবিক্ষোভ অথবা গণবিপ্লব থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হিসাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে। অন্যান্য অনেক দিক দিয়ে, এমন কি সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়ের ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যর্থ হলেও এর ফলে এমন এক ধনী ভূস্বামী সম্প্রদায় জন্ম লাভ করেছে যারা বৃটিশ শাসনের অস্তিত্বকে বজায় রাখতে বিশেষভাবে আগ্রহশীল।"[৭]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী জমিদারদের হাতে জমির অধিকার চিরকালের মত ছেড়ে দিলেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট অংকের একটা মুনাফা তাদের নিশ্চিত হয়। এর ফলে বাঙলা দেশে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাপ্য ভূমি রাজস্ব নির্ধারিত হয় ৩৪ লক্ষ পাউণ্ড বা ২ কোটী ৬৮ লক্ষ টাকা।[৮]

১৭৯৩ সালের রেগুলেশন অনুসারে কর্ণওয়ালিশ যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষণা করে নতুন ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা সৃষ্টি করেন এবং নতুন জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি করেন তা বাঙলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে একটা মারাত্মক অভিশাপ হয়ে থেকেছে।[৯] জনসাধারণের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে গ্রাম্য অর্থ-

নীতির রূপান্তর ঘটায় সুদখোর মহাজনী প্রথা। এতে অংশগ্রহণ করে জমিদার ব্যবসায়ী ও ধনী সম্প্রদায়। জমিদার ও মহাজনী স্বার্থের এই সংযোগ দেশের ভূমি ব্যবস্থাকে আরো জটিল করে তোলে। এই জটিল ভূমি ব্যবস্থার মধ্য থেকেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব।[১০]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে মাত্রাহীন হয়ে ওঠে জমিদারের শোষণ ও নির্যাতন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের ২য় পরিচ্ছেদে পরাণ মণ্ডলের রূপকে জমিদারী শোষণের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম অনুচ্ছেদে তিনি লিখেছেন ঃ "জীবের শত্রু জীব ; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য ; বাঙালী কৃষকের শত্রু বাঙালী ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু, ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুগণকে ভক্ষণ করে ; রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য, সফরীদিগকে ভক্ষণ করে ; জমিদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে। জমীদার প্রকৃতপক্ষে কৃষকদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করেন না বটে, কিন্তু যাহা করেন, তাহা অপেক্ষা হৃদয় শোণিত পান করা দয়ার কাজ। কৃষকদিগের অন্যান্য বিষয়ে যেমন দুর্দ্দশা হউক না কেন, এই সর্ব্বরত্নপ্রসবিনী বসুমতী কর্ষণ করিয়া তাহাদিগের জীবনোপায় যে না হইতে পারিত, এমত নহে। কিন্তু তাহা হয় না ; কৃষকে পেটে খাইলে জমীদার টাকার রাশির উপর টাকার রাশি ঢালিতে পারেন না। সুতরাং তিনি কৃষককে পেটে খাইতে দেন না।"[১১]

প্রবীণ কৃষক নেতা আবদুল্লাহ রসুল সাহেব জমিদার শ্রেণীর স্বেচ্ছাচার সম্পর্কে লিখেছেন, ঃ

"১৭৯৩ থেকে ১৮৫৯ পর্যন্ত যুগটা ছিল জমিদারদের স্বেচ্ছাচারের যুগ। তারা পুলিশকে ঘুষ খাইয়ে নিজেদের তাঁবে রাখত, রায়তদের সন্ত্রস্ত রাখবার জন্য গুণ্ডা ও ডাকাত পুষত, হফ্‌তম্‌ ও পন্‌জম আইনের অপব্যবহার করত, তাদের অন্যায়ভাবে কাছারিতে ডাকিয়ে মারপিট করত ও আটক রাখত, অসম্পূর্ণ পাট্টা ও খাজনার ভুল রসিদ দিয়ে জব্দ করত। অনেক ক্ষেত্রে এ সমস্ত কাজ সরাসরিভাবে করতো কর্মচারীরা এবং মধ্য ব্যক্তিরা, জমিদাররা নিজেরা নয় কিন্তু এই উপায়ে রায়তদের একেবারে জমিদারদের হাতের মুঠোয় রাখার ব্যবস্থাই হোত এবং সেই ব্যবস্থা অবশ্য জমিদাররা নিজেরাই চাইত।

"জমিদারি প্রথায় রায়তদের শোষণের জন্য জমিদার ও সরকারই ছিল না, জমিদাররা তাদের মত আরো অনেক পরগাছা সৃষ্টি করে তাদের শোষকশ্রেণীকে পুষ্ট করেছিল। গবরনমেণ্ট যেমন জমিদারশ্রেণীকে পয়দা করেছিল নিশ্চিন্তে বসে নির্ধারিত সময়ে তার তোশাখানায় রাজস্ব পেঁৗছে দেবে বলে, তেমনি জমিদাররাও তালুকদার, পত্তনিদার, ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরের অধীন জমিদার বা মধ্যস্বত্বভোগী পয়দা করে নিজেদের বাঁধা আয় নিশ্চিন্তে বসে ভোগ করবার ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। *

"জমিদারি প্রথায় রায়ত ও কৃষকদের শোষণ এখানেই শেষ হয় নি। খাজনা ছাড়া ছিল সালামী। খাজনা বাকী পড়লেই অর্থাৎ কিস্তি খেলাপী হলেই

টাকায় চার আনা সুদ। জমিদারদের কর্মচারী হিসাবে গোমস্তা খাজনার হিসাব করবে, সেজন্য প্রজাকে দিতে হবে গোমস্তার তহুরি বা হিসাব আনা। পাল পার্বণে দিতে হবে পার্বনী, তার হকদার নায়েব, গোমস্তা, তহশীলদার, মুহুরী, পাইক, পেয়দা, নগদি সকলেই।"[১২]

জমিদাররা স্থান বিশেষে এবং সময় বিশেষে কত রকম অর্থ যে প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করতেন তার একটি কল্পিত তালিকা বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে ঃ

নায়েবের পুণ্যাহের নজর	—	৬.০০
জমীদারদিগের পাঁচ শরিকের নজর	—	৫.০০
গোমস্তাদিগের নজর	—	২.০০
পুণাহ্যের পিয়াদার তলবান	—	১.০০
গোপালনগরে বাঁশ ঢোলাইয়ের খরচ	—	১.০০
আষাঢ় কিস্তির পিয়াদার তলবানা	—	.৮১
ভাদ্রের কিস্তির পিয়াদার তলবানা	—	১.৩১
নৌকা ভাড়া	—	১.৫০
সদর আমলার পুজার পার্বনী	—	৬.৫০
কাছাড়ির জমাদার	—	১.০০
ঐ হালশাহানা	—	১.০০
পাঁচ শরীকের পার্বনী	—	৫.০০
শ্রীরাম সেন, হেড মুহুরি	—	১.০০
জমীদারের পুরোহিতের ভিক্ষা	—	২.০০
গোমস্তাদের ভিক্ষা	—	১২.০০
মুহুরিদের ভিক্ষা	—	৩.০০
বরকন্দাজদিগের দোলের পার্বনী	—	১.০০
ডাকটেক্স	—	৩.০০
		৫৪.১২

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ভূমি সংক্রান্ত যে সকল আইন প্রবর্তন করা হয়েছে তার ফলে পদে পদে প্রজার অনিষ্ট হয়েছে। প্রজার শক্তি প্রতিবারে দুর্বল হয়েছে এবং আইনকারক বলবান জমিদারেরা বলবৃদ্ধি করেছেন। এই সমস্ত আইন কিভাবে প্রজার বল হরণ করেছে তার বিশ্লেষণ করে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন ঃ

"১৮৫২ সালের ৫ আইনের দ্বারা প্রজার যে কিছু স্বত্ব ছিল, তাহা লোপ করিলেন। এই বিধি হইল যে, জমীদার প্রজাকে যে কোন হারে পাট্টা দিতে পারিবেন। ইহার অর্থ এই হইল যে, জমীদার যে কোন প্রজার নিকট, যে কোন হারে খাজনা আদায় করিতে পারিবেন। ডিরেক্টরেরা* স্বয়ং এই অর্থ করিলেন. সুতরাং কৃষককে ভূমিতে রাখা না রাখা জমীদারের ইচ্ছাধীন হইল। ভূমির সঙ্গে কৃষকের কোন সম্বন্ধ রহিল না। কৃষক মজুর হইল। এই তৃতীয় কুগ্রহ।

"এই ১৮১২ সালের ৫ আইন পূর্ব্বকালের বিখ্যাত "পঞ্চম"। যদি কেহ প্রজার সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইতে চাহিত, সে "পঞ্চম" করিত। এখনও আইন তাই আছে, কেবল সে নামটি নাই। "কোরোক" কি চমৎকার ব্যাপার, তাহা আমরা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লিখিয়াছি। সন ১৮১২ সালের ৫ আইন ও কোরোকের প্রথম আইন নহে। যে বৎসর জমীদার প্রথম ভূস্বামী হইলেন, সেই বৎসর কোরোকের আইনও প্রথম বিধিবদ্ধ হইল। জমীদার চিরকালই প্রজার ফসল কাড়িয়া লইতেন, কিন্তু ইংরাজেরা প্রথমে সে দস্যুবৃত্তিকে আইনসঙ্গত করিলেন। অদ্যাপি এই দস্যুবৃত্তি আইনসঙ্গত। প্রজাদিগের এই চতুর্থ কপালের দোষ।

"পরে ১৮১২ সালের ১৮ আইন। ৫ আইন তদ্দারা আরও স্পটীকৃত হইল। ডিরেক্‌টরেরা লিখিলেন যে, এই আইন অনুসারে জমীদারেরা কদিমী প্রজাদিগকে ও নিরিকের .বিবাদচ্ছলে তাহাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারেন।

"তাহার পর সন ১৮৫৯ সাল পর্য্যন্ত আর কোন দিকে কিছু হইল না। ১৮৫৯ সালে বিখ্যাত দশ আইনের সৃষ্টি হইল। ইংরাজ কর্তৃক প্রজার উপকারার্থ এই প্রথম নিয়ম সংস্থাপন হইল। ১৭৯৩ সালে কর্ণওয়ালিশ যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, প্রায় ৭০ বৎসর পরে প্রাতঃস্মরণীয় লর্ড কানিঙ্ হইতে প্রথম তাহার কিঞ্চিৎমাত্র পূরণ হইল। সেই পূরণ প্রথম, সেই পূরণই শেষ। তাহার পর আর কিছু হয় নাই। সন ১৮৬৯ সালের ৮ আইন দশ আইনের অনুলিপি-মাত্র।

"১৮৫৯ সালের দশ আইনও যে প্রজাদিগের বিশেষ মঙ্গলকর, এমত আমরা বলি না। প্রজাদিগের যাহা ছিল, তাহা তাহারা আর পাইল না। তাহাদিগের উপর যে সকল অত্যাচার হইয়া থাকে তাহা নিবারণের বিশেষ কোন উপায়, এই আইন বা অন্য কোন আইনের দ্বারা হয় নাই। কোরোক-লুটের বিধি সেই প্রকারই আছে। বেশীর ভাগ, প্রজার খাজনা বাড়াইবার বিশেষ সুপথ হইয়াছে। এই আইনেরই সাহায্যে যাহার হার বেশী করা যাইতে পারে না, বঙ্গদেশে এমত কৃষক অতি অল্পই আছে।"[১৩]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, নতুন নতুন ভূমি আইন ইত্যাদির ফলে ভারতের কৃষক সমাজ নিষ্ঠুর নির্য্যাতনের শিকার হয়। কৃষক সমাজ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ আন্দোলনে সামিল হতে থাকে। শ্রীসুপ্রকাশ রায় তাঁর বিখ্যাত "ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম" গ্রন্থটিতে তার .বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক পর্যন্ত সময় সীমার মধ্যে যে সব কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হোল ঃ

১] সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩—১৮০০)

বিদ্রোহের ঘটনাস্থল বিহার ও বঙ্গদেশ—গভর্ণর জেনারেল হেষ্টিংসই এই কৃষক বিদ্রোহকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নামে অভিহিত করেন। এই বিদ্রোহে তৎকালীন

সমাজের ত্রিবিধ শক্তি সম্মিলিত হয়েছিল, বিহারের কারিগর ও কৃষক—ধ্বংসপ্রাপ্ত মোগল সাম্রাজ্যের সৈন্যবাহিনীর ছত্রভঙ্গ অংশ—সন্ন্যাসী ও ফকিরের সেই অংশ যারা বিহার ও বাংলা দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করে কৃষকে পরিণত হয়েছিল। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত ছিলেন মজনু শাহ, মুশা শাহ, চেরাগ আলি, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানী।

২] মেদিনীপুরের বিদ্রোহ (১৭৬৬—১৭৮৩)—

মেদিনীপুর অঞ্চলের বাগদী, ঘোড়ুই, খয়রা, মাঝি, চোয়ার প্রমুখ আদিবাসী কৃষকেরা নানা স্থানিক বিদ্রোহের মাধ্যমে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব করে তুলেছিল।

৩] ত্রিপুরার শমসের গাজীর বিদ্রোহ (১৭৬৭)—

দরিদ্র, সাহসী শমসের গাজীর নেতৃত্বে বৃটিশ শোষণের বিরুদ্ধে ত্রিপুরার রোশনাবাদের কৃষকরা সংগঠিত হয় এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহীরা প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর অধিকার করে ও সেখানে স্বাধীন রাজ্য ঘোষণা করে।

৪] সন্দীপের বিদ্রোহ (১৭৬৯)—

সন্দীপের জমিদার গোকুল ঘোষাল ও তাঁর পৃষ্ঠপোষক বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করে অত্যাচারিত কৃষকরা। বিদ্রোহ দমনে বৃটিশ সৈন্য-বাহিনীর নির্মম অত্যাচারেও কৃষকরা স্তব্ধ হয় নি।

৫] তন্তুবায়দের সংগ্রাম (১৭৭০—১৮৮০)—

বৃটিশ শোষণনীতি ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের চূড়ান্ত বিপর্যয় সৃষ্টি করে। পীড়িত, লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত তন্তুবায়রা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব তন্তুবায় নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে বৃন্টমু দাস, বলাই, ফকির চাঁদ, লোচন দালাল, কৃষ্ণচন্দ্র বড়াল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

৬] চাকমা বিদ্রোহ (১৭৭৬—১৭৮৭)—

পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা প্রভৃতি আদিবাসীরা বৃটিশ শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। ১৭৭৬ সালে রাজা সের দোলত এবং তাঁর সেনাপতি রামু খাঁর নেতৃত্বে চাকমারা প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সের দৌলত খাঁর পুত্র জানবক্স খাঁর নেতৃত্বে ১৭৮২ সালে দ্বিতীয় বার বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পরবর্তী কালে আরো দু'বার চাকমারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

৭] লবণ শিল্পীদের সংগ্রাম (১৭৮০—১৮০৪)—

বৃটিশ শাসনে লবণ শিল্প বিপর্যস্ত হয়। বৃটিশ কর্মচারীরা বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলে বিনা শুল্কে এবং অবাধে লবণ ব্যবসার অধিকার করায়ত্ত করে। ফলে লবণের মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাজস্বের বৃদ্ধিই লবণের মূল্য বৃদ্ধির প্রধানতম কারণ। ফলে লবণ কারিগররা অত্যন্ত দুর্দশার মধ্যে পতিত হয়। তখন তারা সংঘবদ্ধ হয়ে আন্দোলন শুরু করে।

৮] রেশম চাষীর সংগ্রাম (১৭৮০—১৮০০)—

রেশম চাষী এবং রেশম শ্রমিকরা ইংরাজ আমলে নানাভাবে শোষিত হচ্ছিল।

বহু চাষার ও নাগাউর কোম্পানীর কাজ পরিত্যাগ করে গ্রাম থেকে পলায়ন করে। কোম্পানীর অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য নাগাউররা তাদের বৃদ্ধাঙ্গুলটা কেটে ফেলত, রেশম চাষীদের একাংশ সন্ন্যাসী বিদ্রোহেও যোগদান করেছিল।

৯] আফিং চাষীদের প্রতিরোধ সংগ্রাম (১৭৮০—৯৩)—

আফিং-এর ব্যবসা লাভজনক হওয়ায় ইংরেজরা এই ব্যবসার একচেটিয়া লাভের জন্য অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছিল। ইংরেজ ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া দালালরা বাংলার আফিং চাষীদের কাছ থেকে বলপূর্বক অত্যন্ত সস্তা মূল্যে আফিং কিনত এবং ইংরেজ ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করত। এরকম শোষণ ও উৎপীড়ন থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য আফিং চাষীরা প্রতিরোধ সংগ্রামে সামিল হয়।

১০] রংপুরের বিদ্রোহ (১৭৮৩)—

দিনাজপুরের কুখ্যাত ইজারাদার দেবী সিংহের অবর্ণনীয় শোষণ ও উৎপীড়নের ফলে দীর্ঘকাল ধরে কৃষকদের মনে ক্রোধ ও ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল। ১৭৮৩ সালে সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে কৃষকেরা দেবী সিংহের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দেবী সিংহকে আশ্রয় দিতে এগিযে আসেন ইংরেজ শাসকেরা। বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর সম্মুখেও বিদ্রোহী কৃষকেরা মাথা নত করে নি।

১১] বীরভূমের গণবিদ্রোহ (১৭৮৫—৮৬)—

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের আঘাত বীরভূম জেলার কৃষকদের উপরেও গভীরভাবে পড়েছিল। কৃষকদের আবেদনে কর্ণপাত না করে বৃটিশ শাসকেরা রাজস্ব সংগ্রহে তৎপর হয়ে ওঠে। ফলে বীরভূমে গণবিদ্রোহের সূত্রপাত হয়, কোনকোন স্থানে সশস্ত্রভাবে তাঁরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল।

১২] বীরভূম বাঁকুড়াব বিদ্রোহ (১৭৮৯—৯১)—

বৃটিশ শাসন এবং আঞ্চলিক জমিদার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বীরভূম ও বাঁকুড়ার কৃষকেরা সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। প্রায় তিন বৎসরকাল কৃষকেরা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বৃটিশ শাসন ব্যবস্থাকে নিশ্চল করে দিয়েছিল।

১৩] বাখরগঞ্জের সুবয়নদিয়া বিদ্রোহ (১৭৯২)—

ইংরেজদের শোষণ ও শাসনে সহচর জমিদার গোষ্ঠীর লুণ্ঠন ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বাখরগঞ্জের কৃষকেরা বোলাকি শাহের নেতৃত্বে ব্যাপক বিদ্রোহে সামিল হয়েছিল।

১৪] মেদিনীপুরের নায়েক বিদ্রোহ (১৮০৬—১৮১৬)—

নায়েক সম্প্রদায় চোয়াড়দের সমগোত্রীয়। এরা চাষবাস করে জীবিকা নির্বাহ করত এবং প্রয়োজন হলে রাজার অধীনে পাইক-বরকন্দাজের কাজ করত। ইংরেজরা নায়েকদের জায়গীর জমি বাজেয়াপ্ত করে। সংকটগ্রস্ত নায়েকরা অচল সিংহের নেতৃত্বে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

১৫] ময়মনসিংহের কৃষক বিদ্রোহ (১৮১২)—

জমিদার গোষ্ঠীর সঙ্গে লর্ড কর্নওয়ালিসের দশশালা বন্দোবস্তের ফলে ময়মনসিংহের কৃষকদের জীবনে ভয়ংকর বিপর্যয় নেমে আসে। ময়মনসিংহ পরগণার কাপাকি স্থানকে কেন্দ্র করে সমগ্র পরগণায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে।

১৬] ময়মনসিংহের পাগলপন্থীদের বিদ্রোহ (১৮২৫—২৭)—

পাগলপন্থী ধর্ম বাউল ধর্মের নামান্তর। জমিদারগোষ্ঠীর অত্যাচারের ফলেই গাড়োরা স্বধর্ম পরিত্যাগ করে এই ধর্ম গ্রহণ করে। ছাপাতির গাড়ো রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা নিষ্ফল হবার পর বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর সহায়তায় জমিদারেরা চূড়ান্ত অত্যাচার শুরু করে। তখন সমগ্র গাড়ো জাতি এই উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং সেরপুর শহরকে কেন্দ্র করে এক নতুন গাড়ো রাজ্য স্থাপন করে।

১৭] ওয়াহাবী বিদ্রোহ (১৮৩১)—

নীলকর ও জমিদারগোষ্ঠীর অত্যাচার এই বিদ্রোহের মূল কারণ। এই বিদ্রোহের নায়ক তিতুমীর। ওয়াহাবী বিদ্রোহের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য থাকলেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অত্যাচারী জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের বাসস্থান আক্রমণ ও অধিকার করার পর তিতুমীর সরাসরি বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইংরেজ ও জমিদারদের মিলিত বাহিনী তিতুমীরের হাতে পরাজিত হয়। গভর্ণর জেনারেল তখন তিতুমীরের শক্তিকে পর্যুদস্থ করার জন্য এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করে।

১৮] ফরাজী বিদ্রোহ (১৮৩৮-৪৭)—

ফরিদপুরের ফরাজীরা মূলত একটি ধর্ম সম্প্রদায়। শরিয়তুল্লা এবং তাঁর পুত্র মহম্মদ মহসীন ফরাজী ধর্মমতের প্রবক্তা ছিলেন। শরিয়তুল্লার নেতৃত্বে কৃষকেরা জমিদারী শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে। ভীত সন্ত্রস্ত জমিদারেরা এর বিরুদ্ধে প্রতিকারের চেষ্টা করে। শরিয়তুল্লার মৃত্যুর পর তার পুত্র মহম্মদ মহসীন জমিদারী শোষণ বিদেশী ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ করে স্বাধীন রাজ্য পরিকল্পনা করেন। স্বাভাবিকভাবে ইংরেজরা জমিদারদের পক্ষ গ্রহণ করে। বৃটিশবাহিনী বিদ্রোহী কৃষকদের উপর অত্যাচার চালায় এবং মহম্মদ মহসীনকে গ্রেপ্তার করে।

১৯] ত্রিপুরার কৃষক বিদ্রোহ (১৮৪৪-৯০) ত্রিপুরার তিপ্রা, জমাদিয়া, কুকি, রিয়াং, হালাম প্রভৃতি আদিবাসী কৃষকেরা সামন্ততান্ত্রিক ও বৈদেশিক শোষণের বিরুদ্ধে নানা সময় বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল।

২০] সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৭ —জমিদারী শোষণ ও উৎপীড়নে অতিষ্ট হয়ে সাঁওতালরা অবশেষে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সাঁওতাল উপজাতির এই ব্যাপক বিদ্রোহ বাংলাদেশের বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং বিহারের ভাগলপুর ও ছোটনাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলের কৃষকদের সক্রিয় সমর্থন লাভ করেছিল। ১৮৫৪ সালে এই বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটে এবং পরবর্তী বৎসর ব্যাপকভাবে এই বিদ্রোহ

বিস্তারিত হয় সিদ্ধু ও কানুর নেতৃত্বে। সাঁওতাল বিদ্রোহের আঘাতে বিহারের একটি অংশ এবং বাংলাদেশের বীরভূম, বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার বৃহৎ অঞ্চলের ইংরেজ শাসন অচল হয়ে পড়ে। সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনের জন্য ১৮৫৫ সালের নভেম্বর মাসে বৃটিশ শাসক সামরিক আইন ঘোষণা করে।

২১] সিপাহী বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহ—স্বতন্ত্র দু'টি অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি।[১৪]

দুই

এবার আমরা বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের রায়ত চেতনা এবং কৃষক বিদ্রোহে তাঁদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করব।

সাম্প্রতিককালের একদল গবেষক বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের চূড়ান্ত সুবিধাবাদী, আত্মসুখানুসন্ধানী এবং একান্তভাবে জন বিরোধী বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। তাঁদের মতে উনিশ শতকের নবজাগরণ আসলে তথাকথিত ভদ্রলোকেদেরই ব্যাপার। ভদ্রলোকেদের সংজ্ঞা তাঁরা এইভাবে দিয়েছেন ঃ

"অর্থনৈতিকভাবে শোষক এবং রাজনৈতিকভাবে আক্রমণাত্মক দল।"

একজন বিদেশী গবেষক দৃঢ়ভাবে বলতে চেয়েছেন যে, এইসব ভদ্রলোকেরা সদাসর্বদাই রজেনৈতিক সুবিধালাভের জন্য চেষ্টিত ছিলেন এবং কৃষকদের আরো তীব্রভাবে শোষণ করার স্বাধীনতা প্রত্যাশা করতেন। এদের চেয়ে বরং বৃটিশ শাসকেরা অনেক বেশী কৃষক দরদী ছিলেন।[১৫]

বৃটিশ শাসকদের কৃষক দরদের স্বরূপ আমরা পূর্বেই দেখেছি। বাংলা দেশের কৃষক বিদ্রোহগুলি স্পষ্টভাবেই প্রামাণ করে দেয় যে, দেশীয় কৃষিশিল্পের ধ্বংসের মূল কারণ বৃটিশ অপশাসন। এই অপশাসনের ফলেই বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে বারংবার দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ঘটে। সখারাম গণেশ দেউসকর বৃটিশ আমলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব দুর্ভিক্ষ ঘটে তার মর্মন্তুদ বর্ণনা দিয়েছেন।[১৬] দুর্ভিক্ষের কালানুক্রমিক তালিকাটা এইরকম ঃ

কাল	স্থান ও বর্ণনা	কারণ ও মৃত্যুসংখ্যা
১৭৬৯-৭০	'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' বিহার ও বঙ্গদেশ	ইংরেজ বণিকদের খাদ্য শস্যের ব্যবসা, অনাবৃষ্টি, বঙ্গদেশে এক কোটি ও বিহারে ত্রিশ লক্ষাধিক নর-নারীর মৃত্যু।
১৭৮৩	মাদ্রাজ ও বোম্বাই	মৃত্যুসংখ্যা অজ্ঞাত
১৭৮৪	উত্তর ভারত	ঐ
১৭৯২	মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, বোম্বাই, দাক্ষিণাত্য গুজরাট ও মারবাড়	ঐ

কাল	স্থান ও বর্ণনা	কারণ ও মৃত্যুসংখ্যা
১৮০২	বোম্বাই	মৃত্যুসংখ্যা অগণিত
১৮০৩-৪	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও রাজপুতানা	অজ্ঞাত
১৮০৫-৭	মাদ্রাজ	মৃত্যুসংখ্যা বিপুল
১৮১১-১৪	ঐ	সামান্য
১৮২২-১৩	রাজপুতানা ও পাঞ্জাব	বিশ লক্ষাধিক
১৮২৩	মাদ্রাজ	বিপুল সংখ্যা
১৮২৪-২৫	বোম্বাই, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	অজ্ঞাত
১৮৩৩-৩৫	মাদ্রাজের উত্তরাঞ্চল ও বোম্বাই	অগণিত
১৮৩৭-৩৮	উত্তর ভারত	দশ লক্ষাধিক
১৮৫৪	মাদ্রাজ	অজ্ঞাত
১৮৬০-৬১	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাব	পাঁচ লক্ষ
১৮৬৫-৬৬	উড়িষ্যার ছয়টি জেলা, বিহার, উত্তরবঙ্গ ও মাদ্রাজ	যথাক্রমে ১ লক্ষ ৩০ হাজার, ১ লক্ষ ৩৫ হাজার, ৪ লক্ষ ৫০ হাজার

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৃটিশ শাসকেরা কিছু কিছু ভূমি সংস্কার করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এর পেছনে বাস্তবিকপক্ষে কৃষকদের প্রতি সত্যকার কোন দরদ ছিল না। ভূমি সংস্কারের উৎসে ছিল সাম্রাজ্যগত স্বার্থ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে সরকারী মহলেই ভিন্ন মত শোনা যাচ্ছিল এ কথা সত্য। অর্থনীতিগতভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বৃটিশ শাসকদের পক্ষে আর ততটা সুবিধাজনক ছিল না—

"The Government did not like that the Zemindars should go away with the increased profits from the land. But as they were not prepared to do away with the Zemindari system, they could do little but to curb the power of the Zemindar in a round about way. The Road Cess Act was conceived in that spirit. It was an attempt to curb the power of the Zemindar at the cost af the ryot. The Road Cess which was formally an impost upon the Zemindar was actually an additional burden upon the peasants."[১৭]

উপর্যুপরি ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে বৃটিশ শাসকেরা দেশের সাধারণ মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করেছিল। আপাতদৃষ্টিতে যে সব বৃটিশ অফিসার জমিদার বিরোধী ছিলেন তাঁরাও কিন্তু ক্রমাগত ট্যাক্সের বোঝা চাপানোর ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। জর্জ ক্যাম্পবেলের আত্মস্মৃতি থেকে তার চমৎকার নজির

পাওয়া যাবে। তাছাড়া শাসনতান্ত্রিক দিক থেকে জমিদারী ব্যবস্থা পূর্বের মত লাভজনক ছিল না। আগে জমিদারদের কাছ থেকে বৃটিশ সরকার যে সামাজিক সমর্থন লাভ করতেন বর্তমানে তাও পর্যাপ্ত বলে মনে হ'ল না। সেজন্য বৃটিশ শাসক অন্য অন্য গ্রাম্য শোষকদের দলে টানতে চাইলেন। জর্জ ক্যাম্পবেল তাঁর আত্মস্মৃতিতে লিখেছেন—

"The permanent settlemant certainly involves a large loss of revenue to the state but under cover of it there has arisen, by means of a system of sub-division and sub-infeudation, a great proprietary middle class and a very large class of de facto peasant proprietors."[১৮]

সুতরাং বৃটিশ শাসকের কৃষকদরদের ব্যাপারটি এক অদ্ভুত কল্পনামাত্র। ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রায়ত ভাবনা এবং রায়তদের আন্দোলনে নতুনমাত্রা যোগ করতে পেরেছিলেন। পোষাকে-আশাকে, শিক্ষায় ও আচরণে কৃষকদের সঙ্গে তাঁদের সুদুস্তর পার্থক্য ছিল। তবে এঁদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে গ্রামের কৃষকদের যোগাযোগ ছিল জমি-জমার মাধ্যমে। এঁরা অনুভব করেছিলেন সামাজিক পুনজাগরণের ক্ষেত্রে কৃষক সমাজ একটা গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। নরহরি কবিরাজের মতে এই সমস্ত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরাই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষক ও কৃষি সমস্যার প্রশ্ন উত্থাপন করেন। রিকার্ডো, শিশমণ্ডি, ম্যালথাস্ এবং মিল প্রমুখের খাজনাতত্ত্ব এঁদের উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফ্রান্স, প্রাশিয়া, সুইজারল্যাণ্ড এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলির কৃষি সংস্কারের দ্বারাও এঁরা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁরা আমাদের দেশের কৃষকদের বিক্ষোভকে বিচার করে দেখার চেষ্টা করেছিলেন।[১৯]

ইংরেজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের দ্বিধা দোদুল্যমানতা অবশ্যই স্বীকার্য। সঠিক শ্রেণীচেতনায় এঁরা উদ্বুদ্ধ ছিলেন না। যে নীতি এঁরা প্রচার করতেন তার সঙ্গে বাস্তব প্রয়োগের বিরাট ব্যবধান ছিল। নরহরি কবিরাজ লিখেছেন—

"Linked with the colonial (as government servants) and feudal (as petty rent receivers) set-up by a thousand threads, these people were not bold enough to propose a radical solution of the peasant question. What they demanded was reform ; reform within the frame work of the permanent settlement."[২০]

মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের রায়ত ভাবনার অবমূল্যায়ন না করেও বলা যায় যে, এই ভাবনা কোন মৌলিক কৃষি সংস্কারের ব্যাপারে উৎসাহী ছিল না।

সেন্সার অফিসার শ্রীঅশোক মিত্র মন্তব্য করেছেন—

"ভারতের বুদ্ধিজীবীরা যে নবযুগের অভ্যুদয়কে 'রিনাসান্স' বলিয়া

অভিনন্দন জানাইলেন গ্রামের উপর তাহার পরিণাম হইল দুঃখজনক। গ্রামে নূতন মধ্যশ্রেণী গজাইয়া উঠিয়াছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে জমির উপর কায়েমী স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া, গ্রাম্য মহাজনবৃত্তি হইতে উচ্চহারে খাজনা এবং ক্রমবর্ধমানভাবে ভাগচাষী ও কৃষি-শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া, কৃষির উন্নতি হইতে নহে, কৃষিকার্যের বিস্তার অথবা কৃষির সুষ্ঠু তদারক কার্য দ্বারাও নহে। অত্যধিক খাজনা, আবোয়ার এবং ঘাতক-মহাজন সম্বন্ধ প্রভৃতির ভিতর দিয়া ভূমিস্বত্বের অধিকারী ব্যক্তি এবং প্রকৃত চাষী এই দুইয়ের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে ব্যবধান ও বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার ফলে মাঠে নামিয়া রৌদ্র-বৃষ্টিতে চাষের জন্য পরিশ্রম করা মধ্য শ্রেণীর নিকট ঘৃণ্য কার্য হইয়া উঠিল। প্রকৃত চাষী এবং ভূমি স্বত্বাধিকারীর মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়া গেল, তাহাদের মধ্যে সৃষ্টি হইল শোষক ও শোষিতের সম্বন্ধ, চুক্তি ও সহযোগিতার সম্বন্ধ নয়। ভূম্যধিকারীরা চাষীর মনোবাঞ্ছা পূরণের পথে বাধ্য হইয়া দাঁড়াইল। চাষীকে দাবাইয়া রাখাই হইল ভূম্যধিকারীগণের স্বার্থ রক্ষার পথ। এইভাবে ভাগচাষী আর কৃষি শ্রমিকের আত্মরক্ষার সংগ্রাম শোষিত গ্রামকে দাঁড় করাইল শোষক শহরের বিরুদ্ধে, গ্রামের মধ্যশ্রেণী সেই সংগ্রামরত গ্রামকে বরণ করিল শত্রুভাবে।"[২১]

শ্রীমিত্র আরো বলেছেন—

"লক্ষ লক্ষ কৃষকের লুণ্ঠিত সম্পদে ধনবান এই ভূস্বামি শ্রেণীই শহরে লইয়া আসিল সাংস্কৃতিক নবজাগরণ। তাহাদের মুখপাত্র ছিলেন 'রাজা' রামমোহন রায়। এই নবজাগরণকে অনেক সময় ভ্রমবশত 'রিনাসান্স' বলা হইয়া থাকে। যে শ্রেণীর লোক ইহা হইতে লাভবান হইয়াছিল তাহারাই আদর করিয়া ইহার নাম দিয়াছিল 'রিনাসান্স'। যে শ্রেণীর মধ্যে এই জাগরণ দেখা দিয়াছিল, তাহারই অনপনেয় ছাপ ছিল এই তথাকথিত 'রিনাসান্স'। এই জাগরণ আসিয়াছিল প্রধানত শহরে এবং বেণ্টিঙ্ক যাহাদের পরজীবী (Parasite) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, সেই ভূস্বামী শ্রেণীর মধ্যেই ইহা ছিল সীমাবদ্ধ। এই মুৎসুদ্দি জমিদার গোষ্ঠীর অন্তরের কামনা ছিল গ্রাম হইতে দূরবর্তী শহরে বসিয়া শাসক গোষ্ঠীর গৌণ অংশীদার হওয়া। ইহা ছিল 'রিনাসান্সে'র, একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যটি পরিণতি লাভ করিয়াছিল শাসক-গোষ্ঠীর সহিত উক্ত পরজীবী জমিদার শ্রেণী ও ইংরেজ বণিকগণের মুৎসুদ্দির মৈত্রীর ভিতর দিয়া। এই 'রিনাসান্স' আন্দোলন দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিকে আদৌ স্পর্শ বা প্রভাবান্বিত করিতে পারে নাই। প্রকৃতপক্ষে কতিপয় শহর ব্যতীত বিশাল বঙ্গদেশের কোন অস্তিত্বই ছিল না এই 'রিনাসান্সের' নিকট কেবল ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরে, কৃষক বিদ্রোহের এক বিরাট যুগের অবসানে, ১৮৫৯ খ্রীষ্ধাব্দের বঙ্গীয় ভূমি সংক্রান্ত আইন, ১৮৮০-৮১ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ তদন্ত-কমিটি'র রিপোর্টে এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের 'বঙ্গীয়-প্রজাস্বত্ব-আইন' আবির্ভূত হইবার পরেই কতিপয় গ্রাম শহরের 'রিনাসান্সে'র দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।"[২২]

বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের রায়ত ভাবনার মূলসূত্রগুলি ঃ

[১] রামমোহন রায়—

রামমোহন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তাকে সমর্থন করেছিলেন। সিলেক্ট কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল লক্ষ্য হ'ল—

(ক) ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা সুগম করা,

(খ) জমিদার মালিকদের জমির উন্নতি-সাধনের নিমিত্ত উৎসাহ দান,

(গ) ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণের অনিশ্চয়তা থেকে ভূস্বামীবর্গকে রক্ষা করা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থক হলেও রামমোহন কিন্তু রায়তদের দুঃখদুর্দশার কথা ভেবেছিলেন।

বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য জমিদাররা যেভাবে রায়তদের উৎপীড়ন করে তা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। চিরস্থায়ী জমি-খাজনার সুবিধাটুকু রায়তদের ভোগ করতে দেওয়ায় ঔচিত্য সম্পর্কেও তিনি বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর মতে জমিতে তিন পক্ষের নির্দিষ্ট অধিকার আছে—

(ক) জমি চাষকারী রায়তদের অধিকার,

(খ) সর্বরক্ষাকারী অভিভাবকদের অধিকার,

(গ) স্থানীয় অভিভাবক জমিদারদের অধিকার।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থক হলেও রামমোহন কিন্তু তার একেবারে অন্ধ সমর্থক ছিলেন না। সিলেকট কমিটির প্রশ্নাবলীর উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, যদিও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সময় প্রত্যাশা করা হয়েছিল ঃ ভূস্বামীবর্গ ভূমি রাজস্বের $\frac{1}{11}$ ভাগমাত্র আপন অংশরূপে রাখবে—তথাপি বাস্তবক্ষেত্রে তারা সরকার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রায়তকে উৎপীড়ন করে খাজনার বৃদ্ধি ঘটিয়ে বর্ধিত অর্থ আত্মসাৎ করে। রামমোহন বলেছিলেন যে, সমস্ত রকমের রায়তদের সমস্ত অধিকার পদদলিত করে ভূস্বামী বর্গ খাজনা বৃদ্ধি করেছে, অন্যদিকে জমি ও কৃষির বিন্দুমাত্র উন্নতি সাধন করে নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বলে 'খুদখাস্ত' প্রজাদের বিশেষ সংরক্ষণকে অগ্রাহ্য করেছিল জমিদারেরা। রামমোহন বলেছিলেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী ভূস্বামী বর্গ প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা যথেচ্ছ বাড়িয়ে নিতে পারে, তারা কিন্তু সরকারকে নির্দিষ্ট ভূমি-রাজস্ব দিয়েই রেহাই পায়। ভূস্বামী পতিত জমিকে কৃষিযোগ্য করে প্রজা বসিয়ে তার আয় বাড়াতে পারে—সেক্ষেত্রে কিন্তু সরকার বা প্রজা কারোই কোন লাভ নেই।[২৩]

[২] রামলোচন ঘোষ—

১৮৩৬ সালে বৃটিশ সরকার খাজনামুক্ত জমি পুনর্গ্রহণের কথা ঘোষণা করে। সরকারের এই ঘোষণায় ভূস্বামীবর্গ প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। রামলোচন কিন্তু এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান—

"His main contention was that the rich Zamindars, dependent to a large extent on the returns forms their rent-

free lands, spent most of their time on the gratification of their desires. He felt that the Government's resumption of these lands would force the Zamindars to cast about for new means to earn their livelihood as well as to acquire wealth."[২৪]

রামলোচন জমিদারদের আলস্যেরও তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, জমিদারদের আরামপ্রিয়তা ও আলস্যের ফলেই এদেশে বৃটিশ শোষণপ্রক্রিয়া এত তীব্র হতে পেরেছে।

[৩] রসিককৃষ্ণ মল্লিক—

রায়তদের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে রসিককৃষ্ণ মল্লিক তীব্র সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে আইনগত এমন অনেক ফাঁক ছিল যার ফলে রায়তদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হ'ত। রসিককৃষ্ণ মল্লিক এ সম্পর্কে লিখেছেন—

"The permanent settlement in Bengal, though perhaps concocted and set to work with the best motive imaginable, has, in consequence of glaring defects in the judicial system, betrayed an utter neglect of the rights of the humbler classes."[২৫]

রসিককৃষ্ণ রায়তদের দুর্গতির চিত্রও তুলে ধরেছেন—

"The Government limiting its own demand to a certain fixed ratio, the Zamindars are rendered secure against any further encroachment upon their profits, while the poor labourer is still left in a precarious position with regard to his rights, which are wholly dependent upon the arbitrary will of his superior."[২৬]

[৪] ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায় ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—

ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায়ের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' পত্রিকায় কৃষি সমস্যার প্রশ্নগুলি গুরুত্বের সঙ্গে উত্থাপন করা হয়। এই পত্রিকায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তীব্র সমালোচনা করা হয়। বলা হয় যে, বাংলাদেশের কৃষকেরা দুই ধরণের শোষণের শিকার, প্রথমতঃ জমিদারেরা তাদের শোষণ করে, দ্বিতীয়তঃ বৃটিশ আইনের ফলেও তারা শোষিত হয়। এঁদের এক মুখপাত্র দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এক সাপ্তাহিক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, বৃটিশ আমলেই কৃষক ভূমির অধিকার হারায়। অন্য একটি সভায় দক্ষিণারঞ্জন মন্তব্য করেন যে, মধ্য স্বত্বভোগীরা কৃষকদের স্বার্থের প্রতিকূল।

'বেঙ্গল স্পেকটেটর' পত্রিকায় কৃষকদের অবর্ণনীয় দুর্দশার চিত্রও তুলে ধরা হয়। দেনার দায়ে মালপত্র ক্রোক্ করার যে আইন বৃটিশ সরকার প্রবর্তন করে তারও তীব্র সমালোচনা পত্রিকাটিতে করা হয়। কৃষকদের সংঘবদ্ধ হয়ে অত্যাচারের

বিরুদ্ধে 'ধর্মঘট' করার অনুপ্রেরণাও এই পত্রিকায় দেওয়া হয়। কৃষক জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার্থে আন্দোলন পরিচালনার কথাও ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায় চিন্তা করে। বালখানার এক সাপ্তাহিক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত করা হয়—

"That a committee be formed for the serious consideration of the existing disconnection between the Zemindar and the ryot, and to seek evidence on the state of both parties with a view to the restoration of that patriarchal system which so long and so happily existed."[২৭]

[৫] প্যারীচাঁদ মিত্র—

প্যারীচাঁদ তীব্রভাবে রায়তদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের অনুমান, বেঙ্গল স্পেকটেটর পত্রিকার যেসব প্রবন্ধে কৃষকদের দুঃখ দারিদ্র্য ও সমস্যার আলোচনা করা হয়েছে সেগুলি অধিকাংশই প্যারীচাঁদের রচনা।[২৮] এই প্রসঙ্গে তাঁর 'The Zeminder and the Ryot' প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য।[২৯]

প্যারীচাঁদ দেশের কৃষকদের সমস্ত দুর্গতির কারণ হিসাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকেই দায়ী করেন—

"The radically wrong basis of the Permanent Settlement, the grinding consequences of the sub-letting system, and uncertainty of the tenure arising from the unadjustment of the nerik-the pernicious effcet of the Mahajani system, the imposition of the Zamindari, and Naibi abwabs, the oppression of the Zamindar or his agent, the too general inefficiency and apathy of the administrative authorities, the veniality of the ministerial officers, the defectiveness of the adjective law, the bad influence of taxes upon legal proceedings, the abuses of the Huftam and Panjam Regulations, and the tyranny of many Indigo planters."[৩০]

এইসব অত্যাচারের হাত থেকে কৃষককে রক্ষা করার উপরে তিনি জোর দেন। কৃষককে রক্ষার দুটি উপায়ের কথা তিনি উল্লেখ করেন। প্রথমতঃ বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে দলিল পত্রাদি লিখনের কাগজের উপর আরোপিত কর উচ্ছেদ করতে হবে; দ্বিতীয়তঃ গ্রাম পঞ্চায়েতের পুনঃ প্রবর্তন করতে হবে। কৃষকদের শিক্ষার উপরেও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। এজন্যই তিনি সরকারের কাছে আবেদন জানান যে, সমস্ত স্কুল এবং কলেজে মাতৃভাষা শিক্ষা এবং কৃষি শিক্ষা বিস্তৃত করা হোক।

সমকালীন পত্রপত্রিকাতেও কৃষকদের দুর্দশা, কৃষি সমস্যা ইত্যাদি সম্পর্কে নানা বিবরণ থাকত। বাংলা সংবাদপত্র জমিদারদের অত্যাচারের কথা নিঃসংকোচে বিবৃত করত। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি—

[১] "গবর্ণমেন্টের নিয়মিত রাজস্ব প্রদান করিয়া কেবল জমীদারেরাই ভূমির উৎপন্নের লাভাংশ ভোগ করিয়া থাকেন এমত নহে, জমীদারদিগের অধীনে যে সমস্ত তালুকদার ও পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, ইজারাদার প্রভৃতি আছেন, তাঁহারা কৃষকের শ্রমোৎপাদিত দ্রব্যাদির প্রতি আপনাপন সুখসেবা ও সংসারযাত্রা নির্বাহ করণের সম্যক নির্ভর করিয়া থাকেন অর্থাৎ কৃষকদিগকে আপনাপন শ্রমার্জিত ধন দিয়া এই সকল লোকেরও পুষ্টিবর্ধন করিতে হয়।"[৩১]

[২] "কোন বৎসর শস্য হউক বা না হউক তাঁহারা নিয়মিত রাজস্বের একটি পয়সাও পরিত্যাগ করেন না। (ইহাতে) কৃষকের অবস্থা অতিশয় ক্লেশদায়ক হইয়াছে।"[৩২]

[৩] "মফঃস্বলে অর্থাৎ পল্লীগ্রাম মাত্রে কৃষক লোকেরা প্রায় সকলেই নির্ধন অন্নাচ্ছাদনের সামর্থ্য রহিত, সুতরাং তাহাদিগের অন্য উপায় কি আছে কাযেই ধান্যের বাড়ীদাতা মহাজনগণের নিকট যাইতে হয়। ঐ ধান্যের মহাজন সকলের মধ্যে অধিকাংশ তালুকদার, অপর লোক অত্যল্প, কৃষকেরা কর্ষণের সময়ে অর্থাৎ আষাঢ় শ্রাবণ মাসে যত পরিমাণে ধান্য লইয়া যত লিখিয়া দেয়, পৌষ ও মাঘ মাসে তাহার দেড়া দিতে হয়, এরূপ নিয়মবন্ধ আছে, অনন্তর যদি দৈব বশতঃ ফসল না জন্মে তবেই সর্বনাশ ঘটিয়া উঠে, খতের লিখিত ধান্য উক্ত নিয়মে পরিশোধ করিতে না পারিলে ঐ দেড়া ধান্যের খত লেখাইয়া লয়। তাহাতে দেড় বৎসরের ভিতর চারি শলি ধান্য লইলে গুণশালি ঋণদাতাকে নয় শলি প্রদান করিতে হয়; দেখুন প্রথম ৪ শলিতে ৬ শলি, পরে ৬ শলিতে ৯ শলি, যাহারা একবার এ প্রকার ঋণগ্রস্ত হয় তাহাদিগের মৃত্যু ব্যতীত ঐ ঋণ হইতে উদ্ধার হওনের অপর উপায় কিছুই দেখি না।"[৩৩]

[৪] "১৮১৯ সালের ৮ আইনের বিধান মতে পত্তনি দিবার যেরূপ বন্দোবস্ত আছে, তাহা প্রজাগণের অধিকতর অনিষ্টের কারণ। সুচতুর জমিদারগণ স্বীয় অধিকারস্থ জমিদারী জরীপ ও নিরিখ ধার্য্য করিয়া পত্তনি দিবার ঘোষণা করিয়া দেন, নীলামের ডাকের ন্যায় উহার ডাক বাড়িতে থাকে, যে ব্যক্তি অধিক পণ জমা দিতে সম্মত হয়, তাহার সহিত পত্তনির বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। পত্তনিদার মহলে উপস্থিত হইয়া খাজনা আদায় করিবার পূর্বে এই কথা প্রচার করিয়া দেয় যে যে প্রজা টাকায় সিকি বৃদ্ধি স্বীকার না করিবে তাহার সহিত বন্দোবস্ত হইবে না। এই নিমিত্তই প্রজারা ভূমিতে জমিদারের জরীপের রজ্জুপাতকে হৃদয়শল্য জ্ঞান করে···ভূমি মাপিবার রসি স্থির না থাকাতে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় পত্তনিদারের লোকেরা ১৮ কাঠায় বিঘা হয়, এমত রসি লইয়া মাপ আরম্ভ করে, এবং ১০ বিঘার বন্দকে জরীপ মুখে ১২ বিঘা করিয়া তুলে, যখন প্রজারা মাঞ্চেষ্টারের মজুরদিগের ন্যায় নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পত্তনিদারের দুরাকাঙ্খা পূর্ণ করিতে বাধ্য হয়। এই প্রকার দর-পত্তনিদার, ছে-পত্তনিদার, ইজারাদার, ছে ইজারাদারের হস্তে নিত্য নূতন যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, ইহাতে কি প্রজাদিগের সুখ-সৌভাগ্যের প্রত্যাশা আছে।"[৩৪]

[৫] জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ করেছেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন' শিরোনামে এক প্রবন্ধে জমিদারদের সম্পর্কে পত্রিকা লেখেন ঃ

"যে রক্ষক সেই ভক্ষক এই প্রবাদ বুঝি বাঙ্গালার ভূস্বামিদিগের ব্যবহার দৃষ্টেই সূচিত হইয়া থাকিবেক। ভূস্বামী স্বাধিকারে অধিষ্ঠান করিলে প্রজারা একদিনের নিমিত্ত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না? কি জানি কখন উৎপাত্ত ঘটে ইহা ভাবিয়া তাহারা সর্বদাই শঙ্কিত। তিনি কি কেবল নির্দিষ্ট রাজার সংগ্রহ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন? তিনি ছলে বলে কৌশলে তাহারদিগের যথাসর্বস্ব হরণে একাগ্রচিত্তে প্রতিজ্ঞারূঢ় থাকেন।"[৩৫]

১২৬৯ সালের ২০ শ্রাবণ সোমপ্রকাশ সম্পাদকীয় প্রবন্ধের শিরোনাম দেন 'অত্যাচার বিষয়ে এদেশীয় জমিদারেরাও বড় কম নয়।' ঐ প্রবন্ধে লেখা হয় ঃ "সম্প্রতি এদেশে ইউরোপীয়দিগের অত্যাচার অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, ইহার প্রতিকার চেষ্টাতেই সকলে ব্যস্ত সমস্ত আছেন। সুতরাং আমাদিগের দেশের জমিদারদিগের পাপক্রিয়া ও অত্যাচারের প্রতি কেহ বড় দৃষ্টিপাত করিতেছেন না। উহা এক্ষণে এক প্রকারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। মহাপ্রদীপ প্রজ্বলিত হইলে ক্ষুদ্র প্রদীপ তাহার নিকটে দীপ্তি পায় না। অসৎ ইয়োরোপীয়দিগের অত্যাচার ক্রমে ক্রমে আর সকল অত্যাচারকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু পাঠকগণ এইরূপ অনুমান করিবেন না যে, এদেশের পুরাতন জমিদারেরা সকলেই সাধুশীল হইয়াছেন।"[৩৬]

[৭] "চাষিরা দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়া যে সকল ফল শস্য প্রস্তুত করে তাহা লইয়া বড় মানুষ ভদ্রলোকে কত সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু কি দুঃখের বিষয় যাহারা এত খেটে মরে তাহাদের দুঃখ ঘোচে না। তাহাদেরই হাতের জিনিস লইয়া অন্য লোকে সুখী হয়, কিন্তু তাহাদের নিজেদের পরিবার পুত্র কন্যাগণ খাইতে পরিতে পাবে না। কৃষিকর্মে যাহা কিছু জন্মে তাহা জমিদার এবং মফঃস্বলের কর্মচারিগণ নানা প্রকার দাবী দাওয়া করিয়া হাত করিয়া লয়েন। নিরোগী পল্লী গ্রামবাসী চাষা কিছুই জানে না কেবল ভূতের মত সারাদিন পরিশ্রম করিয়াই মরে। জলে ঝড়ে শীতে রৌদ্রে কত কষ্ট করিয়া যাহা কিছু উপার্জন করিতেছে তাহা পাঁচ জনে লুটিয়া খাইতেছে। বড় লোকদিগের দৌরাত্ম্য ও অত্যাচারের ভয়ে সর্বদা কম্পমান। পুলিশ, থানার আমলারাও অনিষ্ট করিতে পারিলে ছাড়েন না। দরিদ্রদের প্রতি গবর্ণমেন্টের তত অনুরাগ নাই। প্রজারা না খেতে পেয়ে মরে গেলেও কেহ চেয়ে দেখে না। কিন্তু তাহাদের গায়ের রক্ত লইয়া সকলে বড় মানুষী করেন।[৩৭]

[৮] 'পল্লীগ্রামের পুলিশ এত অকর্মন্য কেন?' এই শিরোনামে আর এক পত্রিকায় লেখা হয়—

"আমরা জানি অনেক স্থলেই পুলিশ কার্যকালে উপস্থিত হয় না, পরে কার্য শেষে কার্যক্ষেত্রে আসিয়া এরূপ ধুমধাম ও অত্যাচার করিতে থাকে যে তাহাতে

নির্দ্দোষী লোকদিগের প্রাণ বাঁচানো ভার হইয়া ওঠে। এবং অনেক পল্লীগ্রামের পুলিশ কর্ম্মচারীগণ তত্রস্থস্থানের জমিদারদিগের একান্ত আজ্ঞাধীন হইয়া থাকে। পুলিশ কর্ম্মচারীগণ শীতকালে ভেকের নিদ্রার ন্যায় ভঙ্গ হয় না। ইহারা কুম্ভকর্ণের বড় দাদা সন্দেহ নাই। অধিক কি বলিব ইহারা গবর্ণমেণ্টের লোক কি জমিদারের লোক তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না।"[৩৮]

তিন

Uncle Tom's Cabin উপন্যাসটি সেকালের বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। হরিশচন্দ্রের 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র নিম্ন সংবাদটি লক্ষ্যণীয়ঃ

"Several persons in India who have felt deeply interested in the state of society depicted in Uncle Tom's Cabin, are strongly impressed with the conviction that the peasantry of Bangal are sunk in a state of degradation, moral, social and intellectual, equal in various points to that of the slaves of North America, as described in that admirable book."[৩৯]

ঐ একই প্রবন্ধে বাংলা দেশের রায়তদের প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ আহবান করা হয় এবং শ্রেষ্ঠ লেখককে ৫০০ টাকা পুরস্কার দেবার কথা ঘোষণা করা হয়। এই প্রতিযোগিতার বিচারকমণ্ডলী ছিলেনঃ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিশোরীচাঁদ মিত্র, জেমস লঙ। ঘোষণাটি এইরকমঃ

"In order to draw attention to the subject and to rouse people to the inportance of taking measures to ameliorate the social condition of the Bengal peasantry, a few friends agreed to propose a prize of 500 rupees to be given to the best paper on the following subject—The Social Condition of the Ryots of Bengal."[৪০]

এই ঘোষণা উদ্ধৃত করে পেট্রিয়ট মন্তব্য করে যে সাফল্যের সঙ্গে কেউ যদি বাংলার রায়তদের প্রকৃত অবস্থা চিত্রিত করতে পারে তাহলে বহু অনুদঘাটিত সত্য জনসমক্ষে প্রকাশিত হবেঃ

"If the projected novel be written with ability, there is no doubt that it will present many graphic pictures of the miseries with which ryot's life abounds·· ···The incident of a huptam or punjum are precisely those which even in the hands of a workman less perfect than Dickens would harrow up an honest soul and make it disgusted with many things besides the Zemindary order."[৪১]

উল্লেখযোগ্য যে, বাংলার কৃষকদের ধর্মঘটের সঙ্গে ইউরোপীয়দের সট্রাইকের সাদৃশ্য পেট্রিয়ট দেখতে পেয়েছিলেন—

"The Dharmaghats among the agricultural poloulation of Bengal are similar in many respects to the strikes of the English operatives."[৪২]

হরিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে সমর্থন করেছেন। বেশ জোর গলায় তিনি বলেছেন যে ভারতবর্ষের পক্ষে এই ব্যবস্থাই একমাত্র উপযুক্ত ও কার্যকরী ব্যবস্থা। হরিশের মতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভারত ও বৃটেনকে ঐক্যবদ্ধ করবে—

"Whatever the faults of the Permanent Settlement, it is the only system of landed tenure, it is clear, which is suited to India. Under it the people will progress and prosper, their civilization will take a visible shape, their sympathies for 'the powers that be' will be strengthened and their aspirations after a nationality will be nursed and effectuated. It has proved to be the best source of strength to Government and the most powerful bond which will unite Hindustan to Britain."[৪৩]

সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজ রাজনীতিবিদ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে সমর্থন করেছেন। এই সমর্থন হরিশকে আশ্বস্ত করেছে। তিনি লিখছেন—

"Statesmen and politicians of the highest order acknowledge it. Sir John Malcolm has justly said that the happy effects of Lord Cornwallis' most statesmanlike measure, in order to be belived in ought to be seen. 'This system' observes that far-famed soldier-statesman, 'is not less calculated to improve the state of the country and the condition of the inhabitants than to fix upon the firmest basis of the British Government in India by securing the attachment of their subjects, and to give, from the obvious principles of justice and moderation on which it is founded, the most favourable impression of the English Government to all the nations of India. If there even existed any doubts as to the truth of this remark, although it bears the authority of a name which Englishmen are proud to honour, the insurrection, we repeat has incontestably dissipated them "[৪৪]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতি বেসরকারী রাজনীতিবিদদের সমর্থনও উদ্বুদ্ধ করেছে হরিশকে—

"But not only is official testimony, though reluctantly, made to declare for the continuance and extension of the

Permanent Settlement. Non-official politicians of great weight recognise its merits. Two of our best journals—best as they seldom put their pens on paper without thinking—we mean the 'Friend of India' and the 'Dacca News', both allow their suffrage in its favour."[৪৫]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচকদের সমালোচনা করেছেন হরিশ। আসলে তিনি এই বন্দোবস্তের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেন নি। অন্যান্য বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মত তিনিও ভেবেছিলেন যে এর ফলে রায়তদের উপকার হবে। যারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচক তারা প্রকৃত কৃষকদরদী নয় বলেই তাঁর ধারণা—

"There are many in England, who in a false sentiment of sympathy for the poor and labouring, inveigh against the establishment of Indian feudalism.' They will cry against his Lordship for any attempt to adopt it; and perhaps, the religious class—but not the thinking portion, vide the 'Friend of India'—will join, in the cry. But the true statesman, the Man of God, should move with the finger of providence. Absurd clamour should not silence his zeal. If the cultivation, growth, prosperity and happiness of a population, and the safety of an empire are his principal responsibilities he should not neglect this opportunity. This is the fittest time for land reform. The old system has crumbled into pieces, but another of greater antiquity has been tested to be stronger and sounder far, and why not then at once adopt it and carry it out though the length and the breadth of the land."[৪৬]

১৮৫৭ সালে খাজনা বিল উত্থাপিত হয়। রায়তদের নিরাপত্তা ও অবস্থার উন্নতি ছিল এই বিলের প্রধান উদ্দেশ্য। ১৮৫৯ সালে এটি আইনে পরিণত হয়—Bengal Rent Act বা বঙ্গীয় খাজনা আইন। ১৮৫৯ সালের খাজনা আইনের ফলে রায়তদের কিছু কিছু সুবিধা হয়। এই আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট খাজনার অতিরিক্ত দাবি ও বাকি খাজনার জন্য জমিদার কর্তৃক রায়ত প্রজার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করার অধিকার অনেকাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। সাধারণ দেওয়ানী আদালত থেকে জমিদার ও প্রজার মামলা কালেক্টর ও তাঁর সহযোগীদের দ্বারা পরিচালিত রাজস্ব আদালতে স্থানান্তরিত করা হয়। বলপূর্বক প্রজাদের জমিদারী কাছারীতে হাজিরা দেবার প্রথা বন্ধ হয়।

১৮৫৭ সালে খাজনা বিল উত্থাপিত হলে হ্যালিডে সাহেব তাঁর 'মিনিটে' লিখলেন—

"Mr. Raikes, Judge of the Suddar Court, observes that, by numerous precedents since the enactment of Section XXVI Act I of 1845, it has been determined that an auction purchaser may eject or enhance at discretion the rents of all tenants, except those of the description specially protected by the section in question; whereas Sections III and IV of the present Bill extend that protection to other classes, and thus run counter to former legislation, and to rullings of the Courts founded thereon. I apprehend, however, that the object of that part of the Bill was no other than that of Act I of 1845, namely to declare and uphold the rights of Khoodkasht and Kudeeme Ryots, which Ryots I take to be the class intended by the expressions 'Hereditary Ryots holding lands at fixed rates' and 'Resident Ryots and cultivators'. Perhaps the opportunity should be taken to define what has always needed definition, namely, the term 'Khoodkasht and Kudeeme Ryots'."[৪৭]

হরিশ হ্যালিডের সমালোচনা করে লিখলেন—

"It is not a definition that the Khoodkasht Kudeeme ryot of Bengal wants. He is pretty well known for all that law gibberish has enshrouded him in. The difficulty of his position lies in the difficulty of proving his character as a Khudkasht ryot while an absurd rule of evidence encumbers the code. By the law as at present administered, whenever a Zemindar institutes a suit for the enhancement of rent, it is the ryot who is called upon to prove that the tenure he has inherited or purchased was a khoodkasht tenure held on fair rent at the time of the Decennical Settlement. So the inevitable result is that the older the tenure grows the less secure it becomes, thus reversing all the purposes for which the law of prescription, the first law of property was instituted in human codes."[৪৮]

এই বিল সম্পর্কে মতামতের জন্য বিভিন্ন সদর ও জেলার জজ সাহেবের কাছে পাঠানো হয়। তাঁদের মধ্যে মাত্র একজনই বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। যিনি গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন সেই মিঃ সোন্সের বক্তব্য বিবেচনা করে হরিশ লিখলেন—

"This suggestion is applicable only to a case of ordinary suitors for enhancement of rent. To apply it to a case of the auction purchaser would be to deal a blow to the permanent settlement that may prove eventually fatal. It is essential to the stability of that settlement that when an estate is encumbered so as to reduce its income below the jumma it is assessed at to the public, its sale for the recovery of arrears should place it at once in the condition it was in at the date of settlement. To allow any class of ryots immunity from increase of rent on the ground solely of twelve years' occupancy without challenge would infringe this fundamental principle of our landed system and offer inducement to improvidence on the one hand and fraud on the other to revel at the cost of the nation's weal.

"That part of Mr. Currie's Bill in which he endeavours to provide a remedy against the khoodkasht ryot being converted into a tenant at will, a condition he is fast drifting towards—is obnoxious to precisely the same objection and some others too. To make residence the whole essential of khoodkhast tenancy is to injure irretrievably the grand bulwark of the permanent settlement The attempt was ever before made to convert all chupper bund ryots into khoodkasht ryots, but the good sense of the legislature of the time baffled the project."[৪৯]

খাজনা আইনেও অবশ্য রায়তদের মৌলিক কোন উপকার সাধিত হয় নি। কারণ—

ক] জমিতে দখলী স্বত্ব প্রমাণ করার জন্য রায়তদের দলিল বা পাট্টা ছিল না,

খ] আইনের ব্যবস্থাগুলির স্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারিত হয় নি,

গ] জমিদাররা ইচ্ছামত খাজনা বৃদ্ধির অধিকার লাভ করল।

১৮৫৯ সালে বিক্রয় আইন অনুমোদিত হয়। তার পূর্বে মিঃ গ্রাণ্ট এই বিল উত্থাপন করেন এবং বিভিন্ন সদর ও জেলার জজ সাহেবদের কাছে মতামতের জন্য বিলটি পাঠানো হয়। হরিশ ছিলেন এই বিলের বিপক্ষে। বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের জনৈক জমিদার সদস্য এই বিলের বিপক্ষে যে সব যুক্তি উত্থাপন করেন সেগুলি হল ঃ

ক] অ-সাংবিধানিক এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এর দ্বারা আহত হবে,

খ] জমির স্বত্বের উপর আঘাত হানবে,

গ] জমিদারী ব্যবস্থার মাধ্যমে যে উন্নতি সম্ভব হত তা ব্যাহত হবে,

ঘ] এর দ্বারা ভূমিগত নানাবিধ জালজুয়াচুরির ক্ষেত্র প্রশস্ত হবে,

ঙ] জমিদারীর বর্তমান বাজার দর হ্রাসপ্রাপ্ত হবে।

হরিশ যুক্তিগুলি সমর্থন করেছিলেন। প্রথম যুক্তির সমর্থন করে তিনি বললেন :

"1st. That it is unconstitutional and involves a breach of the Permanent Settlement. It is unconstitutional because the present attempt seeks by an ex-post facto law to interfere with the existing arrangements between Zemindars and their under-tenure-holders made under the sanction of laws solemnly passed by former legislators and thereby to temporarily enhance the value of the latter at the expense of the former. If existing arrangements, legally made by parties, with a full knowledge of advantages and disadvantages, regarding estates contnining millions and millions of acres of land (being in fact the most valuable property in the country) in the course of the 60 or 70 years, be made a game for legislative interference, and mutual arrangements set at nought, very little confidence henceforth will be placed in the immutability of contracts and in the sacredness of property, which calamity alone no other advantages can compensate. The Permanent Settlement ratified by the British Government with the people of this country admitted in clear terms the right of Zemindars to make such arrangements of their lands as they may deem conducive to their benefit. The present Bill in as clear terms interferes with that right by enacting that undertenures, created by Zemindars with certain immenities ond rights, shall have greater privileges given them at the expense of the Zemindars. The plea of "The G. G. in Council will, whenever he may deem it proper, enact regulations as he may think necessary for the protection and welfare of the dependent Talukdars, Ryots and other cultivators of the soil", as stated in Article 7 of the Permanent Settlement proclamation, will not avail, as the dependent Talukdars and others, for whom so much sympathy and

affection are now assumed, voluntarily entered into those legal engagements with a full knowledge of all the circumstances in each case. This argument, it will be said, may hold good only as regards the past and not for the future. But why not the future ? If Zemindars be not allowed to dispose of their lands to the best advantage, it is a curtailment of the right guaranteed to them."[৫০]

হরিশের মতে বিলটির পরোক্ষ ফলাফল আরো মারাত্মক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এর দ্বারা আহত হবে। বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হতে হবে ইংরেজকে ঃ

"The indirect consequence of the measure will be still more disastrous. It will lead to the breaking up of the Permanent Settlement. But the Lieutenant-Governor and some of the high officers of Government maintain that, if the permanently settled estates come into the hands of Government without a breach of faith, it is rather to be wished for than avoided ; but will it be acting in good faith to enact a law knowing and foreseeing the precise effect of that law to be the wished for desideratum ? Will it not, on the contrary, be characterized by duplicity added to bad faith ?

"The author, we observe, has omitted one argument on thss head often advanced in these columns. Perhaps from the superior knowledge of the class he addresses, our official legislators, he thinks the argument would rather puzzle than enlighten them. Or, more probably he thinks it is wise policy not to involve his reasonings, by quoting history and acts of Parliament, in the contempt with which Indian official politicians hold those authorities. Nothing however can be plainer than that Pitt's India Act, in obedience to which the Permanent Settlement was framed, precludes for ever the Indian legislature from tampering with any of its essential provisions."[৫১]

দ্বিতীয় যুক্তির সমর্থনে হরিশ বললেন যে এই বিল সুযোগসন্ধানী, অপদার্থ জমিদারদের আরো সুযোগ করে দেবে—

"There are imprudent, indolent, stupid and needy individuals among our own Zemindars, as there are in every other class ; their proporation will increase when additional facili-

ties for indulging in extravagance are placed before them. The misfortunes and minority of proprietors and the dishonesty of servants will also go a great way to swell the ranks of this class. These people will, one way or other, be always tempted to create fictitious under-tenures and sell them in another name. A few gentlemen, and among them Captain Crauford, have thought proper to connect the improvement of the country with the proposed innovation in the sale law, affecting as it does the entire landed system in Bengal. I give every credit to those gentlemen for sincerity, but I doubt very much if they have deeply considered the question in all its bearings. All their zeal and perseverance is directed to only one point, the stability of the under tenures, a very plausible object no doubt, but if they will take the trouble of weighing all the circumstances, they, if not all, most of them, I am sure, will be convinced that the proposed measure is eminently calculated to involve ultimately alike Zemindars and Putneedars in ruin and destruction. As I have stated above, private competition in the sales will cease after a few ineffectual struggles to catch the shadow of estates sold. Government will become the only purchaser. It will find the estates so much shorn of their real assets by fraud and the neglect or incompetence of its Mofussil officers that it will soon be compelled in self-defence to break through all etiquette either by the means of the proposed bill or by enacting other laws and completely smash the Talookdary tenures.

"Whatever be the purposes of the author of the Bill or the hallucinations under which Captain Crauford and the class he represents labour, the ultimate effect of the law will be, what the author of the pamphlet describes, a complete smash of Talookdary with Zemindary tenures. The gentlemen who have been so eager to support the projects had better ponder on the preceding observation, coming as they do from one eminently entitled to deference on such a topic, and supported as they are by the testimony of Mr. Halliday him-

self The latter gentleman finds fault with Mr. Grant's Bill because it is not one calculated to bring on the crash soon enough. He is impatient for the catastrophe that shall leave him master of the situation, i. e., Lieutenant-Governor of Bengal cleared of every class of its population but officials and peasant farmers."[৫২]

তৃতীয় যুক্তির সমর্থনে হরিশ বললেন—

"Under the third head of objections is pointed out the progress that the country has made under the Zemindary system. The history is well told, and we are sorry we cannot reproduce it in extenso. The cry of security for under-tenures has been raised principally by the European Planters. The following is a capital hit at these gentlemen :

'The exportation of lac-dye, hemp, and a variety of other articles has greatly increased but very little is due to European agriculturists for their production. The whole or nearly the whole is produced by natives. Talk of improving the country by letting a few thousand bighas of lands for Khajoor plantations to an European ? You may just as well talk of improving the country by a few thousand bighas of rice cultivation. Why, millions of bighas are now filled with khajoor trees by the ryots, and the cultivation will go on increasing as long as its produce remains remunerative. Let beet root or any other sugar get a preponderance in Europe and the cultivation of that article will be diminished in this country. There is very little indigo made by Europeans in Hooghly, Burdwan, Midnapore, Cuttack, Patna, Rajsahie and some other districts. Are those districts less cultivated and the ryots less happy than in Jessore, Kishnagore, Pabna etc., the great indigo districts ? On the contrary, it is well-known that on the whole the state of cultivation is higher and less waste land is to be found in the one, than in the other I have entered into these particulars to show that for want of permanency in some classes of the under-tenures the improvement of the country, as far as cultivation and increase of population are concerned, has not been at a

stand, and that the improvements introduced by other classes including even the Government itself, will not bear comparison with those of the Zemindars. The question then hinges upon the point, whether by destroying a wealthy body of Zemindars, able and willing to improve the country for their own sake and with large and compact tracts of land at their disposal and substituting in their place a body of petty land-holders, with a tendency to split their estates still more minutely, generally without capital, influence or other means necessary to carry out improvements on a large seale, you will retard or accelerate the improvements of the country. For the question is strictly confined to this narrow compass. It is not between European and Native Capitalists, for now both alike are permitted to purchase Zemindaries, Mocurrories, rent free lands & c."[৫৩]

জমিদাররা বিক্রয় আইনের বিরুদ্ধতা করেছিল। এর ফলে তাদের সম্পদের মূল্য হ্রাসের আশংকা করেছিল তারা। জমিদারদের অভিযোগ ছিল—

ক] এটি অপ্রয়োজনীয়,

খ] এটি বিশ্বাসহন্তার পরিচায়ক।

হরিশ জমিদারদের বক্তব্যকেই সমর্থন করেছেন। ১৮৫৭ সালের ১২ই মার্চ তিনি 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় লিখলেন—

"The Zemindars and their critic in 'Friend of India' are at issue on almost all the propositions which form the bases of the petition of the former—propositions which are at once characterized by the latter as 'of the most astounding audacity'. The Zemindars hold that Mr. Grant's law will diminish the value of their estates, and that to diminish that value by evpost facto legislation is an act of confiscation. The Friend of India denies that Mr. Grant's law will 'diminish the sale price of an estate'. Here is issue joined on a distinct matter of fact which the public, unskilled in the intricacies of the law of real property in Bengal, is fully competent to try. We contend that the Zemindars are in the right. The Friend of India forgets that Mr. Grant's Bill offers 'increased security' to under-tenures already existing as well as those hereafter to be created. Now the author of

the Bill himself estimates the extent of middlemen's tenures already existing at three-fourths the entire surface of the province. Whatever in the shape of salamee or premium the Zemindars have received for the creation of these tenures, for the alienation of a portion of their own estates in their Zemindaries—must have been considerably less than the value of the fee simple into which the contingent interests of middle-men are proposed to be converted. Their estates, hitherto charged with annuities terminable at will, are to be further encumbered by those annuities being declared to be perpetual ! And it is denied that Mr. Grant's Bill proposes confiscation. But this is not the only mode of confiscation which the Bill proposes. There would be at least some consolation in the fact that what the Zemindars lose the middlemen gain. A simple transfer of value from one class of estates to another by dint of violent legislation does not per se diminish the national wealth. But all transfer of property effected against the principles of right and justice—whether it be by the picking of a pocket or the passing of a revolutionry law—are calculated to diminish the sum total of the national wealth. If under-tenures are allowed to survive the capital tenure, such would be the inevitable consequence. If half a dozen under-tenures are created upon the new condition, every estate in Bengal will feel the effect of the measures. No purchaser of a Zemindari estate, however unencumbered it may be, will feel certain that he is not purchasing a loss. The most efficient system of registration will not obviate this consequence. The history of the operation of the Irish Encumbered Estates Act, a law which has done more to raise the value of landed property in Ireland than anything else in the history of the island, affords in this respect experience which our legislators cannot explain away."[৫৪]

বিক্রয় বিল উত্থাপিত হলে ২৪ পরগণা জেলার জমিদাররা এর বিরুদ্ধে সরকারের কাছে এক যুক্ত আবেদন পেশ করে। ১৮৫৭ সালের ৫ই মার্চ 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় জমিদারদের বক্তব্যের সমালোচনা করা হয়। জমিদারদের

পক্ষ নিয়ে হরিশ 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার বক্তব্যের সমালোচনা করে লিখলেন—

"The Friend of India has 'not patience to reply' to the argument of the petitioners 'that the measure will be useless' for, if true, why do not Zemindars attack the measure at all ? Our centemporary forgets that a measure may be very useless as regards its ostensible purpose, at the same time that it may do a large measure of mischief by serving less avowed purposes. The petitioners show that under-tenures do not practically stand in need of further protection, that the proposed law will not benefit large classes of under-tenures, that it will give birth for a time to a large number of ephemeral tenures whose permanence will not be secured by it, and that the existence of the class of under-tenures which is to derive the benefit of the law is an unmitigated evil, while the injury which the law is certain to cause to the community is the ultimate destruction of the Permanent Settlement We are unable to detect in this reasoning the failure of logic which our contemporary discovers. The Zemindars have nowhere affirmed that the present law is absolutely good because it allows of middlemen. They maintain that it is one of the evils and in the present temper of their legislators it is hopeless asking for a correction of the evil.

"Lastly, the scheme of protection for the interests of under-tenures suggested by the Zemindars is derided by our contemporary as utterly futile. The Zemindars propose that under-tenants suffering loss by the default of their Zemindar be declared to have a right of compensation from the latter. This means according to the 'Friend of India' that 'the planter whose works have been destroyed by a change in the ownership of the estate, is to sue a revenue defaulter whose pauperism is proved by his default, for compensation'. The 'Dacca News' took the same objection to the proposal. The whole question connected with the Sale law is one of such difficulty and is affected by so many considerations that we

are not surprised to find unfamiliarity with its chief bearings even in quarters the best informed. We have ceased to feel surprise at any degree of hallucination that may be displayed in the comprehension of the question since we learnt that the author of the Bills himself and the Clerk Assistant of the Legislative Council, the first real property lawyer in the country, really believe that the Bill does not affect Permanent Settlement. As to the argument under notice, we have only to point out to the 'Friend of India' that a Zamindar is never so rich as when his estates have been sold for default in payment of revenue; that it is this circumstance which constitutes the grievance the Bill is intended to remedy; that the principle of compensation is not a new one to the law of under-tenures as a reference to Regulation VIII of 1819 will prove; and finally, that if the legislature declare the prior right of under-tenants to satisfaction out of the sale proceeds of estates sold for default, no remedy is so effectual or so certain for the enforcement of the right that the one afforded by Regulation. II of 1806 of the Bengal Code."[৫৫]

বিক্রয় আইন সম্পর্কিত বিলের ব্যাপারে হরিশের বক্তব্য সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তিগ্রাহ্য। প্রকারান্তরে এই বিল ভারতবর্ষে নীলকরদের অবস্থান-ভূমিকে দৃঢ় করে তুলতেই সাহায্য করবে। হরিশের আপত্তি এখানেই।

"In this act Hurrish Chunder discerned not an anxiety to protect the interests of the common ryot but a desire to strengthen the footing of the European Planter in India. The oppression of the ryot in this case became assured in any case—he had to choose between the Planter and the Zeminder as the tyrant. And knowing what he did of the Planters of those days, Hurrish chunder was certainly quite justified in entering a strong protest aganist the Bill, from pure consideration of the country's good and not at the bidding of his employers the British Indian Association."[৫৬]

জমিদারদের শোষণলিপ্সু চরিত্ররহস্য সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন না হরিশচন্দ্র। তথাপি বহু ক্ষেত্রে তিনি জমিদারদের পক্ষ সমর্থন করেছেন। অথচ রায়তরাও অনেকক্ষেত্রে তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি ও সাহায্য লাভ করেছিল। সুস্পষ্ট

শ্রেণীচেতনার অসদ্ভাবের ফলে হরিশ জমিদার এবং রায়ত এই দুই শ্রেণীর মধ্যে দোলাচল করেছেন। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখেছেন,

"To a man who studies the controversy at this day Hurrish chunder Mookerji may appear to be defending an unrighteous cause in supporting the Zemindars against the ryot, knowing full well how prone the Zemindars of those days were to oppress their tenants. But Hurrish chunder was no less a friend of the ryot than that of the Zemindar."[৫৭]

রায়তদের স্বার্থরক্ষার জন্য তাঁর উদ্যমের অভিজ্ঞান ছড়িয়ে রয়েছে হিন্দু পেট্রিয়টের বহু প্রবন্ধে ঃ

"His anxious solicitude to protect the interests of Khud-khast and Kudimee ryots whose title was most insecure in those days, finds expression in many of his articles."[৫৮]

কৃষকের প্রতি তাঁর আন্তরিক দরদ ও সহানুভূতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় নীলবিদ্রোহের সময়। রিক্ত বিত্ত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত রায়তদের তিনি আশ্রয় দিয়েছেন, আহার দিয়েছেন, ভরসা দিয়েছেন, দরখাস্ত লিখেছেন, নীলকরদেব বিরুদ্ধে মামলায় সাহায্য করেছেন। সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে বঞ্চিত কৃষকদের জমি হারানোর ক্ষোভকে তিনি প্রতিফলিত হতে দেখেছেন, কৃষকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার মত তাদের শিক্ষার দাবিতেও সোচ্চার হয়েছেন।

টীকা

১. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলা দেশের কৃষক। বদরুদ্দীন উমর। পৃঃ ১
২. Transactions in India. Younghusband. P. 123
৩. কৃষক সভার ইতিহাস। আবদুল্লাহ রসুল। পৃ ১২
৪. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলা··· পৃঃ ৬
৫. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী। অমলেন্দু দে। পৃঃ ১
৬. Land Problems in India. Radhakamal Mookherjee. P, 35
৭. India Today. R. P. Dutta. P. 192
৮. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলা... পৃঃ ৬
৯. কৃষকসভার ইতিহাস—পৃঃ ১২
১০. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত—পৃঃ ৪
১১. বঙ্কিম রচনাবলী।
১২. কৃষক সভার ইতিহাস। পৃঃ ১৭-১৮
১৩. বঙ্কিম রচনাবলী।
১৪. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম (১ম)। সুপ্রকাশ রায়
১৫. J. H. Broomfield
১৬. দেশের কথা। সখারাম গণেশ দেউস্কর। ডঃ মহাদেবপ্রসাদ সাহা সম্পাদিত

১৭. রমেশচন্দ্র দত্তের The Peasantry of Bengal গ্রন্থের ভূমিকায় ঐতিহাসিক নরহরি কবিরাজের মন্তব্য।

১৮. Memoirs of my Indian Career, vol. II, P. 287-8

১৯. রমেশচন্দ্র দত্তের The Peasantry of Bengal গ্রন্থের ভূমিকা।

'Studies in Bengal Renaissance' গ্রন্থের 'Peasant Questions' প্রবন্ধে শ্রীকবিরাজ লিখেছেন—

"The uninterrupted flow of peasant risings as mentioned above testify to the fact that the problems of the peasantry constitued one of the major questions of the day. It became clear to all that the backwardness of the peasantry retarded the growth of production and was at the root of a crisis which was eating into the vitals of the entire nation. Under such circumstances it was not possible for the Bengali intelligentsia to ignore the peasant question altogether." (P. 523)

২১. Census Report, 1951. vol. VI Part 1A, P. 435. সুপ্রকাশ রায়ের পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত।

২২. ঐ, ঐ

২৩. বাঙালী লেখকের রায়ত চিন্তা। ড. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ৬-১৪

২৪. Freedom Movement in Bengal. P. 33

২৫, বঙ্কিমচন্দ্রের 'The Peasants of Bengal' প্রবন্ধে উদ্ধৃত।

২৬. The Jnananveshan পত্রিকায় প্রকাশিত—১৮৩৩ সালের ১০ই মের India Gazette এ উদ্ধৃত।

২৭. Bengal Spectator. April 17, 1843.

২৮. History of Indian Social and Political Ideas. P. 88

২৯. Calcutta Review, No. XII, vol. VI. 1846

৩০. History of Indian...P. 83

৩১. সংবাদ প্রভাকর, ১২৯৯

৩২. ঐ, ১২৫৮

৩৩. ঐ, সম্পাদকীয়, ১২৫৮

৩৪. সোমপ্রকাশ, ১২৭০

৩৫. তত্ত্ববোধিনী, বৈশাখ, ১৭৭২ শক

৩৬. সোমপ্রকাশ, ২০শে শ্রাবণ, ১২৬৯

৩৭. সুলভ সমাচার, ৮ই অগ্রহায়ণ, ১২৭৭

৩৮. সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ৭ই মে, ১৮৭২

৩৯. H. P. 12.4.1855

৪০. ঐ

৪১. H. P. 10.5.1855

৪২. H. P. 13.7.1854

৪৩ Selections from the writings of Hurrish Chunder Mookerji. Edited by Nares Chandra Sengupta. P. 183

৪৪. ঐ, ঐ

৪৫. ঐ, P. 184

৪৬. ঐ, P. 185

৪৭. ঐ, P. 175

৪৮. ঐ, P. 176
৪৯. ঐ, P. 177-8
৫০. ঐ, P. 162-3
৫১. ঐ, P.163
৫২. ঐ, P. 163-4
৫৩. ঐ, P, 164-5
৫৪. ঐ P. 167-8
৫৫. ঐ, P 169-70
৫৬. ঐ, Introduction, P [illegible]
৫৭. ঐ ঐ, P. [illegible]
৫৮. ঐ ঐ, ঐ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রাজনৈতিক ভাবনার ঐতিহ্য ও হরিশচন্দ্র

এক

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলাদেশে একটি নতুন যুগের সূত্রপাত হ'ল।[১] ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজ্যাধিকার একদিকে যেমন প্রবল ধ্বংসাত্মক মূর্তি নিয়ে দেখা দিল, অন্যদিকে তেমনি সেই ধ্বংসের মধ্যেই নূতন ঊষার অভ্যুদয়ের সূচনাও দেখা দিল। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের ভূমিকা সম্পর্কে জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কসের বক্তব্য প্রসঙ্গত স্মরণে আসে। ১৮৫৩ সালের ১০ই জুন কার্ল মার্কস 'ভারতে ব্রিটিশ শাসন' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন, ঐ একই সালের ২৪শে জুন রচনা করেন 'ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী—তার ইতিহাস ও ফলাফল' ২২শে জুলাই তিনি রচনা করেন 'ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল' নামে আর দুটি প্রবন্ধ। এই সমস্ত প্রবন্ধে মার্কস বিশ্লেষণ করে দেখান যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের দুটি দিক আছে—

(ক) ধ্বংসাত্মক দিক।

(খ) পুনর্জীবন সঞ্চারিত করার দিক।

ভারতবর্ষের গ্রামকেন্দ্রিক সামন্ত সমাজ ইংরেজরা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। ভারতবর্ষে তার আগে যে সব বিদেশীরা রাজত্ব করেছিল তারা এরকম সর্বাত্মক ধ্বংসের ঋত্বিক হতে পারেনি। 'ভারতে ব্রিটিশ শাসন' প্রবন্ধে মার্কস বলেছেন—

"ব্রিটিশরা হিন্দুস্তানের উপর সে দুর্দশা চাপিয়েছে তা হিন্দুস্থানের আগের সমস্ত দুর্দশার চাইতে মূলগত ভাবে পৃথক এবং অনেক বেশী তীব্র। হিন্দুস্তানের সমস্ত ঘটনা পরম্পরা যতই বিচিত্র রকমের জটিল, দ্রুত বিধ্বংসকারী বলে মনে হোক না কেন, এই সব গৃহযুদ্ধ, অভিযান, উপপ্লব, দিগ্বিজয় ও দুর্ভিক্ষ তার উপরিভাগের নীচে নামেনি। ইংলণ্ড ভারতীয় সমাজের সমগ্র কাঠামোটাই ভেঙে দিয়েছে, তার পুনর্গঠনের কোন লক্ষণ এখনও দেখা যাচ্ছে না। পুরোনো জগতের অপমৃতি অথচ নূতন কোন জগতের এই অপ্রাপ্তির ফলে হিন্দুদের বর্তমান দুর্দশার উপর একটা বিশেষ রকমের বিষাদের আবির্ভাব ঘটেছে এবং বৃটেন শাসিত হিন্দুস্থান তার সমস্ত অতীত ঐতিহ্য, তার সমগ্র অতীত ইতিহাস থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে।"[২]

মার্কসের মতে ভারতবর্ষে বৃটিশের ধ্বংসাত্মক ভূমিকাটি দু'ভাগে বিভক্ত—

(ক) ব্রিটিশ বণিক পুঁজির শোষণ।

(খ) ব্রিটিশ শিল্পপুঁজির শোষণ।

বণিকপুঁজির ভারত শোষণের নানাবিধ দিকগুলি হ'ল—

(ক) প্রত্যক্ষ লুণ্ঠন,

(খ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদারী প্রথার প্রবর্তন,

(গ) ভারতের পণ্য ইংলণ্ডে যাতে রপ্তানি না হয় তার জন্য শুল্ক প্রবর্তন।

ভারতবর্ষে বণিকপুঁজির শোষণ অবশ্য শেষপর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল না। শিল্পপুঁজি বণিকপুঁজির উপর জয়লাভ করে। ১৮৫৭ সালে সিপাহীবিদ্রোহের পর ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটার মূল কারণও সেটাই। শিল্পপুঁজির ভারতশোষণ আরও সুনিপুণ, আরও সুচতুর, আরও নির্মম এবং আরও অনেক বেশী অমানবিক। মার্কসের মতে শিল্পপুঁজির শোষণের দিকগুলি হ'ল—

(ক) ভারতের শিল্পপ্রধান শহরগুলির ধ্বংসসাধন,

(খ) কৃষির উপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টি করা এবং কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহের কড়াকড়ি।

'ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল' প্রবন্ধে কার্লমার্কস বলেছিলেন—

"ভারতবর্ষে এক দ্বিবিধ কর্তব্য পালন করতে হবে ইংলণ্ডকে; একটি ধ্বংসমূলক এবং অন্যটি উজ্জীবন মূলক—পুরাতন এশীয় সমাজের ধ্বংস এবং এশিয়ায় পাশ্চাত্য সমাজের বৈষয়িক ভিত্তির প্রচেষ্টা।"[৩]

অন্যত্র, 'ভারতে ব্রিটিশ শাসন' প্রবন্ধে তিনি বললেন—

"একথা সত্য যে ইংলণ্ড হিন্দুস্তানে সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে গিয়ে প্ররোচিত হয়েছিল শুধু হীনতম স্বার্থবুদ্ধি থেকে। এবং সে স্বার্থসাধনে তার আচরণ ছিল নির্বোধের মত। কিন্তু সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হ'ল ঃ এশিয়ার সামাজিক অবস্থায় মৌলিক একটা বিপ্লব ছাড়া মনুষ্য জাতি কি তার ভবিতব্য সাধন করতে পারে? যদি না পারে, তাহলে ইংলণ্ডের মত অপরাধই থাক, সে বিপ্লব সংঘটনে ইংলণ্ড ছিল ইতিহাসের অচেতন অস্ত্র। তাহলে, আমাদের ব্যক্তিগত অনুভূতির কাছে প্রাচীন এক জগতের ভেঙ্গে পড়ার দৃশ্য যত কটু লাগুক, ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমাদের অধিকার রয়েছে গ্যেটের সঙ্গে ঘোষণা করার, 'এ পীড়ন যদি দেয় বৃহত্তর সুখ আমাদের কেন এ যাতনা? হয়নি কি আত্মার অশেষ নির্বাণ তৈমুরের সে-দুঃশাসনে?'[৪]

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনে ভারতবর্ষে নূতন সমাজ গঠনের যে সব বস্তুগত উপাদান সঞ্চারিত হতে শুরু করেছিল মার্কস তার বিবরণ দিয়েছেন।[৫] এই উপাদান গুলি হ'ল—

(ক) মোগলদের আমলের চেয়ে দৃঢ় সংবদ্ধ এবং বিস্তৃত রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন। ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের সাহায্যে এই ঐক্য দৃঢ়তর ও চিরস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা।

(খ) দেশীয় সৈন্যবাহিনী গঠন—১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পরে অবশ্য এই বাহিনী ভেঙ্গে ফেলা হয়।

(গ) স্বাধীন সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা।

(ঘ) উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠা— এশিয়ার সমাজ বিকাশের পক্ষে যার প্রয়োজনীয়তা ছিল অপরিহার্য।

(ঙ) বাষ্পযানের সাহায্যে ইউরোপের সঙ্গে নিয়মিত এবং দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন।

(চ) রেলপথ প্রবর্তন—রেলপথই ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্পের অগ্রদূত।

(ছ) শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবং যতদূর সম্ভব স্বল্পপরিমাণে হলেও শাসন চালাবার গুণাবলীসম্পন্ন এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানের দ্বারা অনুপ্রাণিত এক শিক্ষিত ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হ'ল, দেশের নবজাগরণে সেই মধ্যবিত্ত সমাজই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেন। সীমাবদ্ধতা তাঁদের ছিল, তথাপি—

"এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একথা অবশ্য স্বীকার্য যে এই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যে ভারতের উন্নততর সমাজ বিকাশের সম্ভাবনা পুরানো সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার ভিতরে পুনরুজ্জীবিত হবার নয়। এর জন্য প্রয়োজন নতুন উৎপাদন যন্ত্রপাতির সঙ্গে পরিচয় ও পাশ্চাত্যের ভাবধারায় দীক্ষা। ভারতে স্বাধীন পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশের অপরিহার্য উপকরণ হিসাবে এই বুদ্ধিজীবীরা পাশ্চাত্য ভাবধারা, সমাজবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রচার দাবী করেন। পুস্তক ও সংবাদপত্র মারফৎ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁরা ব্রিটিশ রাজের কাছে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দাবী করেন।"[৬]

ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে বাঙালী একদিকে যেমন পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হ'ল, তেমনি পরিচিত হ'ল পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, দর্শন এবং রাজনৈতিক চিন্তার সঙ্গেও। এর ফলে শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ ঘটল। অন্ধবিশ্বাসের পরিবর্তে, আপ্তবাক্যের পরিবর্তে তাঁরা যুক্তিবিজ্ঞানের সাহায্যে সবকিছুর যাচাই করে নেবার প্রেরণা লাভ করলেন। ব্যাপক ইংরেজী শিক্ষার ফল হিসাবে উৎসারিত হ'ল—

(ক) স্বাধীনতা প্রীতি,

(খ) দেশপ্রেম,

(গ) সামাজিক সংস্কার আন্দোলন,

(ঘ) ধর্মের ক্ষেত্রে সংস্কারের চেষ্টা,

(ঙ) নারীর বন্ধন মুক্তি,

(চ) স্বাধিকার বোধ,

(ছ) শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্যের মধ্য থেকেই ধীরবিলম্বিত লয়ে স্বাধীনতা প্রীতির জন্ম হচ্ছিল। ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উভয়বিধ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সভাসমিতি এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে ব্যক্তির স্বাধীন মতামত প্রতিষ্ঠার প্রেরণা তাঁরা যেমন লাভ করেছিলেন তেমান অন্ধসংস্কার এবং প্রথার নিগড়ে বন্দী সমাজকে

পরিবর্তনের প্রেরণাও অনুভব করেছিলেন। সামাজিক বা ধর্মীয় সংস্কারের মূলে ছিল দেশের প্রতি প্রচ্ছন্ন মমত্ববোধ। শতাব্দীর প্রথমার্ধেই ইয়ং-বেঙ্গলভুক্ত কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষের কণ্ঠে দেশবন্দনার বাণী উচ্চারিত হয়েছিল। কিছুটা সংকীর্ণতাদুষ্ট দেশবন্দনার সুর গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্রের মুখেও শোনা গিয়েছিল—

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসী গণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ঠেলিয়া।।"

দেশের প্রতি এই ভালবাসার বোধ থেকেই মাতৃভাষা চর্চার উৎসাহ এবং 'জাতীয় শিক্ষা'র উদ্যোগ পর্বের সূত্রপাত। আবার এই দেশপ্রেমের চেতনা অন্যভাবে জীবিকার ক্ষেত্রে দাবি করেছিল শেতাঙ্গদের সঙ্গে সমানাধিকার। স্বাধিকার বোধ এবং দেশপ্রেমের চেতনা নানাবিধ প্রতিবাদে মুখর করে তোলে শিক্ষিত বাঙালীকে। নবজাগরণের প্রথম দূত রামমোহনের প্রতিবাদীকণ্ঠেই প্রথম শোনা যায় খাজনাবৃদ্ধির বিরুদ্ধে তিনি প্রস্তাব করলেন স্বল্প বেতনে ভারতীয় কালেকটর নিয়োগ করে শ্বেতাঙ্গ শাসক খাজনার হার হ্রাস করতে পারেন এবং এই হ্রাস প্রভাবিত করবে না সরকারী অর্থনীতিকে। শ্বেতাঙ্গ হয়েও জর্জ টমসন বললেন, রাজস্বই হল ভারতীয় শাসকদের—'The Alpha and omega' লাখেরাজ জমি সম্পর্কে বৃটিশ সরকারী নীতির প্রতিবাদ ধ্বনিত হল ভূম্যধিকারী সভার মঞ্চ থেকে। বিভিন্ন বৈষম্য ও অব্যবস্থার বিরুদ্ধে 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভার' প্রবক্তাদের কণ্ঠে ও প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। প্রতিবাদ ভাষা পেয়েছিল বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকদের স্থানিক বিদ্রোহগুলির মাধ্যমে। এ ছাড়াও নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, দেশীয় শিল্পের (বিশেষতঃ বস্ত্রশিল্প) ধ্বংসের বিরুদ্ধে শোনা গিয়েছিল প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। প্রতিবাদ ক্রমশঃ পরিণত হয়েছিল আন্দোলনে, যে আন্দোলন ছিল রাজনৈতিক চেতনার ধাত্রী। এই আন্দোলনগুলি মূলতঃ—

(ক) মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা আন্দোলন,
(খ) খাজনা মুক্ত জমির আন্দোলন.
(গ) জুরি প্রথা প্রবর্তনের আন্দোলন,
(ঘ) আইনের চোখে শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয়দের বৈষম্য দূরীকরণের আন্দোলন,
(ঙ) নির্বাচনের জন্য আন্দোলন,
(চ) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক সরকারের জন্য আন্দোলন,
(ছ) প্রতিনিধিত্বমূলক কাউন্সিল ও দায়িত্বশীল সরকারের জন্য আন্দোলন।

শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই সব আন্দোলনের রূপ ছিল পার্লামেণ্টে দরখাস্তাদি পেশ, সংবাদপত্রে রিপোর্ট ও প্রবন্ধ রচনা, সভা সমিতি সংগঠন ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের কৈশোরের ব্যঙ্গরসাসিক্ত কবিতাবলম্বনে এই আন্দোলনের চরিত্র লক্ষণ সম্বন্ধে বলা যায়ঃ 'আবেদন নিবেদনের থালা বহে বহে নতশির।'

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে বাঙালীর মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। জনৈক আলোচক এই পর্বের রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিদের তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছেন —

ক) রক্ষণশীল বিভিন্ন জমিদার, ধনী ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠী,

খ) মধ্যপন্থী রামমোহন রায় এবং তাঁর অনুগামীরা,

গ) ইংরেজী শিক্ষিত নব্য তরুণদল।

সেই আলোচক লক্ষ্য করেছেন বিবিধ বিষয়ে এই তিন গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য ছিল সুপ্রচুর। ধর্মীয় বা সামাজিক বিষয়ে এঁদের পারস্পরিক মতপার্থক্যটাই বেশী প্রকট। তবে রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে একটি বিষয়ে এঁদের মধ্যে ঐক্য দেখা যায়। জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে এঁরা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন না, জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খা কিংবা ব্যথা-বেদনার সঙ্গে বুদ্ধিগতভাবে পরিচিত হলেও তার সঠিক সমাধানের দিকে এঁরা অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারেন নি। রামমোহন রায় এবং তার অনুগামীরা ছিলেন মূলতঃ ধনিক সম্প্রদায়ভুক্ত। বলাবাহুল্য প্রকারান্তরে এই সম্প্রদায়ের মাধ্যমে ব্রিটিশ রাজশক্তি শোষণ কার্য চালাত। হিন্দু কলেজের নব্য তরুণদল অর্থকৌলীন্যে পূর্ববর্তীদের সমপর্যায়ে ছিলেন না বটে কিন্তু তাঁরা মূলতঃ ছিলেন নগরকেন্দ্রিক। কৃষাণের মজুরের শরিক হবার বাসনা তাঁদের ছিল না।[৭]

দুই

বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ হলেন রামমোহন রায়। রামমোহনের মধ্যে ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার সমন্বয় ঘটেছিল। সর্বাংশে তিনি অতীতকে যেমন পরিহার করেন নি বা বিস্মৃত হন নি, তেমনি বর্তমানকে একমাত্র সম্পদ বলে বরণ করে নেন নি। তাঁর কৈশোর ও তারুণ্যের শিক্ষাদীক্ষার উপর আলোকপাত করলেই বোঝা যাবে সমন্বয়ধর্মী মানসিকতা কোন উৎস থেকে জন্ম নিয়েছিল রামমোহনের মধ্যে। সংস্কৃত ভাষাতে তাঁর যথেষ্ট অধিকার ছিল। আরবী ও ফারসী ভাষা তিনি উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছিলেন। তারপর হিন্দু-মুসলিম মিশ্র প্রভাবের উপর এসে পড়ল ইংরেজ-বাহিত ইউরোপীয় শিক্ষা সংস্কৃতির প্রভাব। হিন্দু-ইসলাম ও খৃস্টান এই ত্রিবিধ ধর্মসম্প্রদায়ের কাছে রামমোহনের পাঠ গ্রহণই প্রমাণ করে যে তিনি উদার ও গোঁড়ামীমুক্ত পুরুষ ছিলেন। বৈষয়িক পুরুষ রামমোহনের সর্ববিধ কর্মপ্রয়াসের মূলে ছিল যুক্তিবাদী এবং মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। রামমোহনের কর্মপ্রয়াস কেবলমাত্র ধর্মসংস্কার এবং সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ব্যাপক রাজনৈতিক চিন্তা চেতনাতেও তিনি আমাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

পাশ্চাত্ত্য জগতের রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের রচনার সঙ্গে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। রুশো, টমাস পেন, বেকন প্রভৃতির রচনার সঙ্গে তার পরিচিতি যেমন ছিল তেমনি বেন্থাম, হিউম, রিকার্ডো, জেমস্ মিল প্রভৃতি ইংরেজ চিন্তাবিদদের

বক্তব্যের সঙ্গে সাযুজ্য খুঁজে পেতেন তিনি। ব্রিটিশ সংবিধানও তিনি তন্ন তন্ন করে পড়েছিলেন, পার্লামেন্টে বার্ক, ফক্স্ প্রভৃতির উদারনীতিবাদী দর্শন তাঁকে আকৃষ্ট করত। মন্টেস্কুর প্রভাবে (১৭৪৮ সালে মন্টেস্কুর Spirit of the Law বইটি প্রকাশিত হয়) শাসন ক্ষমতার পৃথকীকরণ এবং আইনের শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। বেন্থামের প্রভাবে (১৭৭৬ সালে বেন্থামের Fragment on Government এবং ১৭৮৯ সালে Introduction to Morals and Legislation প্রকাশিত হয়) তিনি আইন এবং নৈতিকতার পার্থক্য স্বীকার করতেন। ইউরোপীয় চিন্তাবিদদের প্রভাব সত্ত্বেও বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রশ্নে রামমোহন যে মৌলিকতা দেখাতে পেরেছিলেন, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের আলোচনায় তা প্রমাণিত হয়েছে। ড. সুধীন্দ্রনাথ ভৌমিকও বলেছেন যে আন্তরিকভাবে প্রচার আন্দোলনের সূচনা করে রামমোহন পরবর্তীকালে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোধারূপে। গুরুত্বপূর্ণ কোন ধর্মীয়, সামাজিক, প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ে দেশীয় অগ্রণী শ্রেণীর প্রতিনিধিবর্গের যে একটি দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা প্রয়োজন তার সূত্রপাত করেন রামমোহনই।

রামমোহন স্বাধীনতার উপাসক ছিলেন। মানুষের যে মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন এ ব্যাপারে তিনি উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা আন্দোলনে রামমোহনের ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ১৮২৩ সালে প্রেস রেগুলেশনের বিরুদ্ধে তিনি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির কাছে আবেদন করেছিলেন। এই আবেদনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে একটা অধিকার রূপেই তিনি দেখেছিলেন। প্রেস রেগুলেশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে রামমোহন তাঁর 'মীরাৎ— উল—আখবার' পত্রিকাটি বন্ধ করে দেন।

রামমোহনের স্বাধীনতাপ্রিয়তা কেবল স্বদেশীয় ব্যাপারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনা থেকে জানা যায় যে ফরাসী বিপ্লবের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য পর্যাপ্ত অসুবিধা সত্ত্বেও রামমোহন একটি ত্রিবর্ণ পতাকা রঞ্জিত ফরাসী জাহাজে ইংলণ্ড যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের রচনা থেকে জানা যায় যে নেপলসের জনগণের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পরাজয়ের সংবাদ তাঁকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছিল। "এই যন্ত্রণা সত্ত্বেও তিনি ঘোষণা করেছিলেন—

"স্বাধীনতার যারা শত্রু, স্বেচ্ছাতন্ত্রের যারা মিত্র, তারা কখনও জয়ী হয়নি, কখনও শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারে না।"

অমল হোমের লেখা থেকে জানা যায় যে ইংলণ্ডের সংস্কার বিল আন্দোলন তাঁর সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করেছিল।

রামমোহন রাওতওয়ারী প্রথা অপেক্ষা জমিদারী প্রথাকেই বেশী সমর্থন করেছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তও তাঁর সমর্থন পেয়েছিল। কিন্তু তাই বলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা জমিদারী ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি যে সম্পূর্ণভাবে তাঁর দৃষ্টিপথ বহির্ভূত ছিল তা নয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারদের একতরফা

সুবিধা এবং কৃষকদের দুর্দশা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন না। জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধির জন্য ব্রিটিশ সরকার যে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন রামমোহন তারও কুফল দেখতে পেয়েছিলেন

১৮২৭ সালে জুরী আইন বলবৎ হবার সময় রামমোহনের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিন্দু ও মুসলমান জুরী কর্তৃক খৃস্টান অপরাধীকে বিচার করতে না পারার নীতি এবং গ্র্যান্ড জুরীতে হিন্দু ও মুসলমানের কোন আসন না থাকার বিরুদ্ধে তিনি পার্লামেণ্টে প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করেন। মূলতঃ রামমোহনের চেষ্টাতেই ১৮৩২ সালের ১৬ই অগস্ট জুরীদের উপর ধর্মীয় বাধা অপসারিত হয় এবং তাঁরা 'জাস্টিস অব পীস্' ও গ্র্যাণ্ড জুরী হবার অধিকার লাভ করেন।

১৮২৮ সালে 'রেগুলেশন ৩' নামে যে আইন পাশ হয় সেই আইন অনুযায়ী রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের নিষ্কর জমির মালিকদের মালিকানা স্বত্ব আত্মসাৎ করার অধিকার দেওয়া হয়। রামমোহন তখন রিক্ত বিত্ত ভূস্বামীদের পক্ষাবলম্বন করে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের কাছে একটি আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। এই আবেদন পত্রে তিনি পূর্বোক্ত রেগুলেশন প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান। ১৮৩১ সালে ইংলণ্ডে থাকার সময় হাউস অব্ কমন্সের কমিটির সামনে রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে সাক্ষ্য দেবার জন্য রামমোহনকে আহ্বান করা হয়। রামমোহন ভারতবর্ষের রাজস্ব ব্যবস্থার ভ্রমপ্রমাদের দিকগুলি সেখানে স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেছিলেন।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করার জন্যই রামমোহন রায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তিনি যেমন শাসন ও বিচার বিভাগের পার্থক্য চেয়েছিলেন, তেমনি চেয়েছিলেন সদব দেওয়ানি আদালতের হাতে বিশেষ ক্ষমতা। পঞ্চায়েত জুরী ব্যবস্থার প্রচলন ও কামনা করেছিলেন রামমোহন।

রামমোহনের মূল আদর্শ ছিল ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে থেকে সামাজিক অগ্রগতি লাভ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, কোন কোন ক্ষেত্রে স্বাধিকার অর্জন। সৌরীন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় রামমোহনকে ভারতের প্রথম রাজনৈতিক মডারেট বলে উল্লেখ করেছেন। ইংরেজ উদারনীতিবাদের অনুসরণে আমাদের দেশে যে উদারনীতিবাদী রাজনীতি চিন্তার অভ্যুদয় ঘটে রামমোহন তারই ভোরের পাখি। এই উদারনীতি ভারতীয় রাজনীতির জগতে একদিকে যেমন গোষ্ঠীবদ্ধ প্রচার আন্দোলনের মাধ্যমে সর্বভারতীয় কর্মপদ্ধতির সূচনা করে অন্যদিকে তেমনি বিশ্বরাজনীতির মূল স্রোতের সঙ্গে স্বদেশের সংযুক্তি সাধন করায়।[৮]

তিন

রামমোহনের পরে রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের অবদান স্মরণীয়। এঁদেরই ইয়ং-বেঙ্গল নামে অভিহিত করা হয়। হিন্দু-কলেজের শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর গভীর প্রভাব পড়েছিল.

এঁদের মানস গঠনের উপরে। কিন্তু শুধু ডিরোজিওর প্রভাব নয়, রামমোহনের যুক্তিবাদী উদারনৈতিক চিন্তাধারাও এঁদের মনকে প্রভাবিত করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বেকন, হিউম, টম পেন প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের চিন্তাচেতনাকেও এঁরা অঙ্গীকার করেছিলেন।

ইউরেশিয়ান ডিরোজিওর জন্ম কলকাতায়। ডেভিড ড্রুমণ্ডের ধর্মতলা একাডেমীতে শিক্ষালাভ করেন তিনি। ডিরোজিওর মানস গঠনের উপর ড্রুমণ্ডের মত কবি ও স্বাধীন চিন্তাবিদের প্রভাব অনস্বীকার্য। তরুণ ডিরোজিও ধর্মতলা একাডেমী থেকে দর্শন ও সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত হবার প্রেরণা লাভ করেছিলেন, অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ইংরেজ উদারনীতিবাদ এবং ফরাসী বিপ্লবের দ্বারা।[৯] বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করার পর কিছু দিন কেরাণীগিরি করতে হয়েছিল ডিরোজিওকে। ভাগলপুরে মিসেস্ উইলসনের বাড়ীতে থাকার সময় তিনি দেশপ্রেমমূলক কবিতা রচনা করতে শুরু করে ছিলেন। ১৮২৮ সাল নাগাদ ডিরোজিও কলকাতার ফিরে আসেন এবং হিন্দুকলেজে শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি 'ইণ্ডিয়া গেজেট', 'ক্যালকাটা ম্যাগাজিন', 'দি ইণ্ডিয়ান ম্যাগাজিন' প্রমুখ পত্রপত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। হিন্দু-কলেজের তরুণ ছাত্ররা এই তরুণ শিক্ষকের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। গতানুগতিকভাবে শিক্ষকতাকার্য তিনি করেননি। ছাত্রদের মনোবিকাশের দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি চেয়েছিলেন ছাত্রদের স্বাধীন মতামত ও চিন্তাধারা বিকশিত হোক। এ্যাডাম্, বেন্হাম বার্কলে, লক, মিল, হিউম, স্টিউয়ার্ট, টম পেন, ব্রাউন প্রমুখ দার্শনিক ও রাজনীতিবিদদের রচনাদি পাঠের ব্যাপারে তিনি ছাত্রদের উৎসাহিত করতেন। ছাত্রদের স্বাধীন মতামত বিকাশের জন্যই তিনি একাডেমিক এসোসিয়েশন নামে একটি বিতর্ক সভা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেকথা আমরা পরে আলোচনা করব। ইউরেশিয়ান ডিরোজিও ভারতকে মাতৃভূমি রূপে বন্দনা করে গেছেন। কাশীপ্রসাদ ঘোষের আগেই তিনি দেশপ্রেমমূলক কবিতা লিখেছেন। তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতার নাম 'To India My Native Land'—

> "My Country! in thy day of glory past
> A beauteous halo circled round thy brow,
> And worshiped as a deity thou wast.
> Where is that glory, where that reverence now?
> Well—let me dive into the depths of time,
> And bring from out the ages that have holled
> A few small fragments of those wrecks sublime,
> Which human eye may never more behold;"

স্বাধীনচিন্তা এবং স্বাধীনতার তিনি ছিলেন পরোমপাসক। আর একটি কবিতার তিনি স্বাধীনতার বন্দনাগীতি রচনা করেছেন—

"Oh Freedom ! there is something dear
E'en in they very name,
That lights the alter of the soul
With everlasting flame.
Success attend the patriot sword,
That is unsheathed for thee !"

ডিরোজিওকে ঘিরে যে তরুণ অনুরাগীর দল সমবেত হয়েছিল তাঁদের সংখ্যা প্রায় ১৮-এর অধিক।[১০] এ'দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, মাধবচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, অমৃতলাল মিত্র। এ'রা শুধু যে হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর পাঠ নিতেন তা নয়, এ'টালিতে ডিরোজিওর ঘরে তাঁরা সমবেত হতেন। নিষিদ্ধ খাদ্য ও পানীয়ের উচ্ছ্বাসে এ'রা আবিষ্ট হয়েছিলেন ঠিকই, বাঁধভাঙ্গা বন্যার উচ্ছ্বাস রক্ষণশীল হিন্দুসমাজকে আঘাতও করেছে। তথাপি ডিরোজিও প্রভাবিত ছাত্রদের ইতিবাচক দিকগুলিও উপেক্ষণীয় নয়। সেই ইতিবাচক দিকগুলি এইরকম—

(ক) সত্যানুসন্ধিৎসা,
(খ জ্ঞানানুসন্ধিৎসা,
(গ) স্বাধীনতাচেতনা,
(ঘ) উদারনৈতিক চিন্তা,
(ঙ) বিতর্ক ইত্যাদির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা,

তরুণ ছাত্রদের ডিরোজিও কি চোখে দেখতেন তারই জীবন্ত নজির পাওয়া যাবে তাঁর একটি সনেটে—

Expanding like the petals of young flowers
I watch the gentle opening of your minds,
And the sweet loosening of the spell that binds
Your intellectual energies and powers
That stnetch, (like young birds in soft summer hours ;
Their wings to try their strength.
O ! how the winds
Of circumstance, and freshening April showers
Of early knowledge, and unnumbered kinds
Of new perceptions shed their influence ;
And how you worship truth's omnipotence !
What joyouse rains upon me, when I see
Fame in the mirror of faturity,
Weaving the chaplets you have yet to gain,

And then I feel I have not lived in vain.[১১]

ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন যে, ইয়ং-বেঙ্গলের চিন্তাচেতনার উপর ডিরোজিও ব্যতীত রামমোহন রায়ের প্রভাবও পড়েছিল। ইয়ং-বেঙ্গলের একজন বিখ্যাত নেতা তারাচাঁদ চক্রবর্তীর সঙ্গে রামমোহন রায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ১৮২৮ সালে রামমোহন রায় যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর প্রথম সম্পাদক হন তারাচাঁদ চক্রবর্তী। ১৮০০শ শকের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' তারাচাঁদ ও রামমোহনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্পর্কে নানা কাহিনী মুদ্রিত রয়েছে। ইয়ং-বেঙ্গলের আর একজন বিখ্যাত নেতা রসিককৃষ্ণ মল্লিকও যে রামমোহন রায়ের সংস্পর্শে এসেছিলেন সেকথা শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে মুদ্রিত রয়েছে। ১৮৩৪ সালে কলকাতার টাউন হলে রামমোহনের স্মরণ-সভায় রসিককৃষ্ণ মাতৃভূমির উন্নতি বিধানার্থে রামমোহনের কার্যাবলীকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানান। রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' থেকে জানা যায় ইয়ং-বেঙ্গলের নেতা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় রামমোহনের ঔপনিষদিক একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করতেন। ভারতবর্ষে শিক্ষিত ইউরোপীয়দের উপনিবেশ স্থাপনের যে চিন্তা রামমোহন পোষণ করতেন তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন ইয়ং-বেঙ্গলের কেউ কেউ।

ইয়ং-বেঙ্গলের কার্যক্রমকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করে আলোচনা করতে পারি—একটি সভাসমিতি প্রতিষ্ঠা, অন্যটি হল সাময়িক পত্রিকার প্রকাশ (১৮২৮ সালে ইয়ং-বেঙ্গল দল 'একাডেমিক এসোসিয়েশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। হিন্দু কলেজের তরুণ শিক্ষক ডিরোজিওর অনুপ্রেরণা এবং উপদেশের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে উক্ত কলেজের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরা এই সভা স্থাপন করেন। এই সভার সভাপতি ছিলেন ডিরোজিও এবং সম্পাদক ছিলেন উমাচরণ বসু। সভ্যদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী, শিবচরণ দেব, গোবিন্দচন্দ্র বসাক প্রমুখেরা। মাণিকতলার সিংহ পরিবারের বাগান বাড়িতে এই সভার অধিবেশন বসত। ডিরোজিওর জীবন চরিতকার লিখেছেন যে একাডেমিক এসোসিয়েশনে—"Night after night, uuder the presidency of Derozio, and with Omachurn Bose as Secretary, the lads of the Hindu College read their papers, discussed, bebated and wrangled ; and acquired for themselves the facility of expressing their thoughts in words and the power of ready reply and argument."[১২]

বিচিত্র বিষয় এই সভায় আলোচিত হত—

(ক) স্বাধীন ইচ্ছা,

(খ) অদৃষ্ট,

(গ) প্রত্যয়,

(ঘ) পবিত্র সত্য,

(ঙ) গুণাবলী অনুশীলনে মহান কর্তব্য,
(চ) পাপের নীচতা,
(ছ) স্বদেশপ্রেমের মহত্ত্ব,
(জ) পৌত্তলিকতার অসারত্ব,
(ঝ) ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি।

এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনায় স্বাভাবিকভাবেই যুবকদের মনে যুগপৎ প্রেরণা এবং চাঞ্চল্য দেখা যায়। ছাত্ররা কার্যত যেসব আচরণ করতে শুরু করে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ তাতে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। খাদ্যাখাদ্যে অনাচার, শ্রেণীভেদে অনাস্থা, প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতির প্রতি অশ্রদ্ধা, প্রচলিত ধর্মব্যবস্থার বিরুদ্ধে অনাস্থা একদিকে যেমন নতুন যুগের সূচনা করল অন্যদিকে তেমনি রক্ষণশীল সমাজে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করল।[১৩]

ডিরোজিওর জীবনচরিতকার লিখেছেন যে, একাডেমিক এসোসিয়েশন বিবিধ প্রভাব বিস্তার করে। প্রথমতঃ এর ফলে বাংলাদেশে নানাবিধ সভাসমিতি গড়ে উঠতে শুরু করে, স্বাধীন মতামতের বিকাশ ও বিস্তার ঘটতে শুরু করে, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য ভাবধারার মধ্যে তীব্র সংঘাত উপস্থিত হয়।[১৪] দ্বিতীয়তঃ এর ফলে কয়েক মাসের মধ্যে দেশীয়দের দ্বারা পরিচালিত ১২ থেকে ১৪টি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।[১৫]

'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা একাডেমিক এসোসিয়েশনকে কেম্ব্রিজ এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ ছাত্রসংসদ গুলির সঙ্গে তুলনা করেছিল। রামগোপাল ঘোষের মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে একাডেমিক এসোসিয়েশন সম্পর্কে 'হিন্দু পেট্রিয়টে' লেখা হয়—

"What the Oxford and Cambridge Clubs are to those universities, the Acadamic Association was to the old Hindu College. As the greatest senators and statesmen of England cultivate oratory in those clubs, so did the first alumni of the Hindu College, who have in after life so eminently distinguished themselves, cultivated their debating powers in that Association."[১৬]

১৮৩৮ সালের প্রথম দিকে 'সোসাইটি ফর দি একুইজিশন অফ জেলারেল নলেজ' বা 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভাটির উদ্যোক্তা ছিলেন তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রাজকৃষ্ণ দে প্রমুখেরা। এই সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল—"Acquiring and diffusing useful knowledge, with special refernce to the knowledge about the condition of the country, and of promoting friendly relations between the members."[১৭]

তারাচাঁদ চক্রবর্তী ছিলেন সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার সভাপতি,

রামগোপাল ঘোষ এবং কালাচাঁদ শেঠ ছিলেন সহ-সভাপতি, যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র এবং রামতনু লাহিড়ী। প্রত্যেক মাসে একবার এই সভার সভ্যরা হিন্দু কলেজ গৃহে মিলিত হয়ে ইংরেজী অথবা বাংলায় লেখা নানা প্রবন্ধ পাঠ করতেন। প্রবন্ধগুলির বিষয় বৈচিত্র্য ছিল। রাজনীতি ও ইতিহাস বিষয়ে যেমন প্রবন্ধ রচিত হত তেমনি রচিত হত বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ। এই সভাটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হয়ে সমাজ কল্যাণে ব্যাপৃত ছিল। বাংলা সাহিত্যের অনুশীলন এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা বাংলা-ভাষায় বাঙালী কর্তৃক এই সভাতে প্রথম ব্যক্ত করা হয়। সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধটির রচয়িতা ছিলেন সংবাদ পূর্ণোচন্দ্রোদয়ের তৎকালীন সম্পাদক উদয়চরণ আঢ্য।

'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকায় সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার কার্যকলাপ সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণটি প্রকাশিত হয় সেটি এই রকম—

"Society for the Aequisition of General Knowledge.

Under this designation, there has existed in Calcutta a society of respectable Hindoo young men, who meet once a month with the view of mutual edification and improvement. Although the society has existed for several years, its members are so modest and have so studiously resisted publicity as to be hardly known that the society does exist. They have nevertheless, been steady and zealous in promoting the objects. The profess io depend themselvs to 'the acquisition of general knowledge,' and to gain this end the members assemble once every month at the Hindoo College, when several of the young gentlemen produce each his essay or paper, weich is read to the meeting, and received as part of the proceedings There is no restriction imposed as to the character or nature of the subject to be treated upon, but any member may select whatever subject he considers within the scope of his ability on which may be most consonant with his peculiar taste on department of study ; nor is the liberty deried for the writer to dress his essay either in the English or in the Bengalee language as he may think best. In this way, since the establishment of the society, a great variety of topics have been treated of at the meetings of the society, and the most choice essays and papers have been collected together and printed as the "transactions" of the society. Two little volumes of these transactions have

already passed through the press. It may be added that the society at present hss about two hundred members."

[বঙ্গশ্রী পত্রিকার ১৩৫৯ সালের আশ্বিন সংখ্যায় 'নব্যশিক্ষা ও দেশজ্ঞান' নামক প্রবন্ধে যোগেশচন্দ্র বাগল 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার' আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়েছেন।]

১৮৩০ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি একাডেমিক এসোসিয়েসনের সদস্যরা 'পার্থেনন' নামে একটি ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রথম সংখ্যায় ঘোষণা করা হয়েছিল যে মাসে ৪ বার এই পত্রিকা প্রকাশ করা হবে, কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ছিল—

"Hindu by birth, yet European by education and its concomitants, they need some organ for the communication of their sentiments, some tablet where they may register their thought."[১৯]

'পার্থেননে' ভারতবর্ষে ব্রিটিশের স্থায়ীভাবে বসবাস, বিচার আদালতে অনাচার, স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিতর্ক মূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভৌমিক লিখেছেন,—"১৮৩০ সালে 'পার্থেনন' নামে একটি প্রগতিশীল পত্রিকা প্রকাশ করে এই নবীন গোষ্ঠী স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষে এবং পৌত্তলিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। হিন্দু রক্ষণশীলদের নিয়ে গঠিত অভিভাবক সমিতির নির্দেশে পত্রিকাটির দ্বিতীয় সংখ্যা আর সূর্যালোকের সাক্ষাৎ পায়নি। বালকদের বাচালতা দমনে এই ব্যবস্থা ইংরেজ কায়েমী স্বার্থের মুখপাত্র জন বুল সমর্থন করেছিল। জুরির দ্বারা বিচারের একটি রাজনৈতিক দাবি ঐ পত্রিকায় উল্লিখিত হওয়ায় অনেকে শঙ্কিত হয়েছিলেন।"[২০]

হিন্দু-কলেজের ছাত্ররা 'দি হিন্দু পাইওনিয়ার' নামে আর একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেছিল। এই পত্রিকায় স্বাধীনতা, বিদেশীর অধীন ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার একটি প্রবন্ধে ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসনের সমালোচনা করে লেখা হয় যে এই শাসন ব্যবস্থায় ভারতবাসীর মতামত প্রতিফলিত হয় না। দেশের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও দেশবাসীর কোনও হাত নেই। ব্রিটিশ শাসকেরা স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন। ফলে এই রকম শাসনে বাণিজ্যিক বা রাজনৈতিক কোন দিক দিয়ে দেশবাসীর কোন উন্নতি সম্ভব নয়।[২১]

১৮৩১ সালের ১৮ই জুন 'জ্ঞানান্বেষণ' নামে আর একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রচলিত আছে যে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ই পত্রিকাটির উদ্যোক্তা ছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাময়িক পত্র' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লিখেছেন যে, দক্ষিণারঞ্জন ছাড়াও এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রসিককৃষ্ণ মল্লিক, মাধবচন্দ্র মল্লিক, তারকচন্দ্র বসু, রামগোপাল ঘোষ, রামচন্দ্র মিত্র, হরমোহন চট্টোপাধ্যায়।[২২] এই পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক কে ছিলেন সে প্রশ্নের

মীমাংসা অবশ্য আজও হয়নি।[২৩] 'জ্ঞানান্বেষণে'র শিরোভূষণ ছিল দু'টি সংস্কৃত শ্লোক এবং তারই অনুবাদ চারটি ছত্র বাংলা পদ্য—

বাঞ্ছা হয় জ্ঞান তুমি কর আগমন।
দয়া সত্য উভয়কে করিয়া স্থাপন॥
লোকের অজ্ঞানরূপ হর অন্ধকার।
একেবারে শঠতারে করহ সংহার॥

সংস্কৃত ও বাংলা এই শ্লোক দু'টি বিশ্লেষণ করলে 'জ্ঞানান্বেষণের' মূল উদ্দেশ্য অবগত হওয়া যায়। মিথ্যাচার ও ভণ্ডামি দূর করা, অজ্ঞতারূপ অন্ধকার দূর করাই ছিল এর লক্ষ্য। 'জ্ঞানান্বেষণের' প্রথম সংখ্যায় পত্রিকার মুখবন্ধস্বরূপ প্রবন্ধটি এই রকম—

"এর প্রয়োজন এই যে, এতদ্দেশীয় বিশিষ্ট বংশোত্তর অনেক মহাশয়েরা লোকের প্রবঞ্চ বাক্যেতে প্রতারিত হইতেছেন, তাহাতে তাঁহারদিগের কোনরূপেই ভাল হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া খেদিত হইয়া বিবেচনা করিলাম যে নানা দেশ প্রচলিত বেদ বেদান্ত মনু মিতাক্ষর প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা দ্বারা তাঁহারদিগের ভ্রান্তি দূর করিতে চেষ্টা করিব।

"দ্বিতীয়তঃ এই যে এতদ্দেশ নিবাসি অনেকেই আপন জাতিবিহিত ধর্মের প্রতি জিজ্ঞাসা করিলে যথাশাস্ত্রানুসারে কহিয়া থাকেন কিন্তু সেই মহাশয়েরা এমন কর্ম করেন যে তাহা কোন বিশিষ্ট লোকেরই কর্তব্য নহে। ইহার কারণ কি তাহাও বিবেচনা করতে হইবেক।

"তৃতীয়তঃ এই যে ভূগোল প্রভৃতি গ্রন্থ যদ্যপি এতদ্দেশে দেশান্তরীয় ও বঙ্গদেশীয় ভাষায় নানা প্রকারে প্রকাশ হইয়াছে তথাপি সে অতিবিস্তারিত রূপে প্রচার হয় নাই অতএব সকলের আশু বোধের নিমিত্তে সেই সকল গ্রন্থ আমরা বঙ্গদেশীয় ভাষায় ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিব। এবং অন্য ২ বিষয় যাহা প্রকাশ করা অবশ্যক তাহাও উপস্থিতানুসারে প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না ইতি।"[২৪]

'জ্ঞানান্বেষণে' রাজনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত প্রবন্ধই বেশি প্রকাশিত হ'ত। ভারতবর্ষের উপর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামক একটি মার্কেণ্টাইল কোম্পানীর রাজনৈতিক কর্তৃত্বের তীব্র সমালোচনা করা হয় এই পত্রিকায়। লেখা হয়—

"A body of merchants has been placed over us as our Sovereigns. The question is, How (sic) far can they frame laws and administer justice, so as to protect our rights and liberties, consistently with their mercantile spirit ? The administration of British India must necessarily be composed of a council of merchants, whose principal aim as such it will be to promote their own interests, and to manage their affairs with as little expense as possible. In a word they will try to make their government subservient to one ignoble principle of GAIN (sic)."[২৫]

নানা প্রবন্ধে 'জ্ঞানান্বেষণ' অভিযোগ করতে থাকে যে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষীয়দের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার ব্যাপারে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। বিচার বিভাগ সামগ্রিকভাবেই ত্রুটিপূর্ণ এবং বৈষম্যভারাতুর। রাজা রামমোহন রায় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার জন্য যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন 'জ্ঞানান্বেষণ' তাকে তীব্রভাবে সমর্থন করেছে। ভারতবর্ষীয়দের স্বাধীন মতামত প্রকাশের ব্যাপারে সমূহ প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য জ্ঞানান্বেষণ আবেদন জানিয়েছে লর্ড বেণ্টিঙ্কের কাছে। কলকাতার পুলিশ বিভাগেরও তীব্র সমালোচনা করেছে জ্ঞানান্বেষণ। পত্রিকার মতে দুর্নীতিপূর্ণ পুলিশ বিভাগে শৃঙ্খলার চিহ্নমাত্র নেই। সামান্যতম কাজের জন্য পুলিশ উৎকোচ গ্রহণে দ্বিধাহীন। জ্ঞানান্বেষণে প্রশাসনিক পদে এবং অন্যান্য চাকুরীর ব্যাপারে ভারতবর্ষীয়দের দাবিকে তীব্রভাবে তুলে ধরা হয়। জ্ঞানান্বেষণের একটি প্রবন্ধে লেখা হয় ভারতীয়দেরকে—

"Should also be allowed to share in their own government; for unless this be done, the Hindus will scarcely be great as a NATION."[২৬]

ভারতবর্ষ ভারতীয়রাই শাসন করবে—জ্ঞানান্বেষণ এই সুরও তুলেছিল। শাসন ব্যাপারে যোগ্য হওয়ার জন্যই উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন। ভারতের ইংরেজ শাসকেরা যদি সত্যই ভারতবন্ধু হন তাহলে তাঁরা ভারতীয়দের শিক্ষার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করবেন। জ্ঞানান্বেষণ লিখল—

"It becomes the paramount duty of our government, if it really have the good of its subjects at heart, to spare no means in its power to facilitate the education of the natives; nor we can be said to be expecting too much when we request it to appropriate a part of the immense revenue that India Yields to the intellectual improvement of her benighted sons."[২৭]

যদিও জ্ঞানান্বেষণ মূলতঃ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের পত্রিকা ছিল তথাপি শ্রমজীবী দরিদ্র মানুষের প্রতি তার সহানুভূতির প্রকাশ দেখা যায় বিভিন্ন প্রবন্ধে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সরকার এবং জমিদারেরা লাভবান হলেও দরিদ্র রায়তরা বঞ্চিত হয়েছে বলে পত্রিকাটিতে লেখা হয়। মফঃস্বল আদালতে দরিদ্র রায়তরা কিভাবে লাঞ্ছিত হয় তার বিবরণও পত্রিকাটিতে তুলে ধরা হয়।

১৮৪২ সালের এপ্রিল মাসে 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' নামে ইয়ং-বেঙ্গলদের আর একটি মুখপত্র প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সম্পাদক ও পরিচালক ছিলেন রামগোপাল ঘোষ। 'ক্যালকাটা রিভিউ'র ১৯১১ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত রামগোপাল ঘোষের একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং প্যারীচাঁদ মিত্র এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যায়

লিখবেন এবং বিশেষ করে তারাচাঁদ প্রবন্ধগুলি দেখে দেবেন বলে স্থির হয়েছিল। প্রথমে পত্রিকাখানি মাসিকরূপে আত্মপ্রকাশ করলেও ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর থেকে পাক্ষিক এবং ১৮৪৩ সালের মার্চ থেকে সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। ১৮৪৩ সালের ২০শে নভেম্বর পত্রিকাটির শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন—"পত্রিকাখানি অগৌণে নব্য বঙ্গের মুখপত্র হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। ইহা যেমন সরকারের কৃতকর্মের কঠোর সমালোচনা করিতে কুণ্ঠিত হইত না, তেমনি সমাজের নানা গলদ উদ্ঘাটিত করিতেও পশ্চাদপদ হয় নাই। প্রগতিমূলক সকল প্রচেষ্টারই ইহা অগ্রণী ছিল।"[২৮]

পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে জানানো হয় যে এই পত্রিকা —

(ক) ব্রিটিশ সরকারের কাছে ভারতবর্ষীয়দের অভাব অভিযোগ উত্থাপন করবে,

(খ) দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য ব্রিটিশ শাসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে,

(গ) শিক্ষিত সম্প্রদায়কে দেশের উন্নতি সাধন ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করবে।

একদিকে এই পত্রিকা যেমন রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়েছিল, ধর্মসভার কার্যক্রমকে কঠোর সমালোচনা করেছিল অন্যদিকে তেমনি প্রগতিপন্থী সংস্কারমূলক কার্যক্রমকে স্বাগত জানিয়েছিল। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলন পত্রিকার উষ্ণ সমর্থন লাভ করেছিল। ১৮৪৩ সালের দাসত্বনিরোধ আইনকে স্বাগত জানিয়েছিল 'স্পেকটেটর'। সমস্ত রকম শোষণের বিরুদ্ধে এই পত্রিকা উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করেছিল। জমিদার এবং তালুকদাররা রায়তদের কিভাবে শোষণ করে তার দীর্ঘ বিবরণ পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কঠোর সমালোচনা করা হয়। শোষিত শ্রমজীবীদের প্রতি প্রকাশ্য সহানুভূতি জানানো হয় এই পত্রিকায়। বলা হয় যে, ভারতবর্ষ থেকে দূরবর্তী উপনিবেশগুলিতে শ্রমিকদের নিয়ে যাওয়া অন্যায়।

'বেঙ্গল স্পেকটেটর' ভারতবর্ষ শাসনের ব্যাপারে ভারতীয়দের অগ্রাধিকারের প্রশ্ন উত্থাপন করে। সমরজিৎ চক্রবর্তী লিখেছেন—

"The Charter Act of 1833 had provided that no one would be disabled from holding office on the ground of his religion, place of birth, descent and colour. But the Government showed no inclination to honour this pledge. All important positions in the administration were exclusively meant for the white men and only a handful of educated Indians were given minor appointments. The Spectator, like most other contemporary papers, was opposed to such discrimination. It suspected that the distinction between covena-

nted and non-covenanted officials was being maintained because the Directors wanted to please their own friends and relations. Interestingly, while the Bengal Spectator was urging on the Government to appoint Indians to the higher offices of the State, the Nityadharmanuranjiak, started in the late forties by the conservatives, was opposed to acceptance of Government offices by the educated Bengalis. It bitterly criticised the young Bengal for their anglicism and commented that the cunning Englishmen were fiddling with the "Stupids" (Young Bengal) by tempting them witm small allurements. By giving jobs to Some Ghose, Bose, Mitra, Pal, Datta, De, Kar, Rakshit, Chatterjee, Mukherjee, Banerjee or Ganguli they were out to cause great injury to the country. Expressing its utter disgust the Nityadharmanuranjika remarked that if the educated young men could defend their own religion then the Englishmen would not have called the Indians uncivilised. But instead, by taking. 'The food left in the dishes by the Europeans' they earned this bad name for themselves "[২৯]

শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেও পত্রিকাটিতে পর্যাপ্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পত্রিকার মতে আইন প্রণয়ন, রাজস্ব সংগ্রহ এগুলিই শুধু সরকারের একমাত্র কর্তব্য নয়, উত্তম প্রশাসনের স্বাক্ষর শিক্ষাবিস্তারের মধ্যেও নিহিত। ব্যবহারিক শিক্ষা এবং জীবনোপযোগী শিক্ষার দাবি জানানো হয় পত্রিকায়।

এবার আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর ইয়ং-বেঙ্গল সম্প্রদায়ের নেতা ও নায়কদের রাজনৈতিক চিন্তাচেতনার পরিচয় গ্রহণ করব।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে দেশপ্রেমের বাণী প্রচারক ছিলেন ডিরোজিও স্বয়ং। যুক্তিবাদী এবং মানবপ্রেমিক ডিরোজিও ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলে মনে করতেন। তাঁর দেশাত্মবোধক ইংরেজী কবিতাগুলিতে ভারতপ্রেমের উজ্জ্বল স্বাক্ষর দেখা যায়। ১৮২৮ সালে প্রকাশিত ডিরোজিওর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ফকীর অফ জাংঘীরার' প্রথম কবিতাটি মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে উদ্দেশ্য করে রচিত। ডিরোজিও প্রসঙ্গে পূর্বেই আমরা এই কবিতাটির উল্লেখ করেছি। ডিরোজিওর এই দেশপ্রেম ইয়ং-বেঙ্গল সম্প্রদায়ের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। ১৮৩০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকায় প্রকাশিত কাশীপ্রসাদ ঘোষের নিম্ন কবিতাটির মধ্যেও দেশপ্রেমের তীব্রসুর বেজেছে—

"Land of the Gods and lofty name ;
Land of the fair and beauty's spell ;

Land of the birds of mighty fame,
My native land ! for e'er farewell !"

কাশীপ্রসাদ এবং তাঁর বন্ধুরা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তবে তাঁরা সেই সঙ্গে এটাও অনুভব করেছিলেন যে স্বাধীনতার সূর্যোদয় হ'তে এখনও বিলম্ব আছে। কাশীপ্রসাদ ঘোষের 'ইণ্ডিয়া' নামক আরও একটি কবিতাতে দেশপ্রেমের তীব্রসুর বেজেছে। এই কবিতাটির উল্লেখ আমরা দেখতে পাই ১৮৩১ সালের মুখার্জীর ম্যাগাজিন পত্রিকায় কবিতাটির অংশবিশেষ এইরকম—

"But woe me ! I never shall live to behold, / That day of Thy trimph, when firmly and bold, / Thow shalt mount on the wings of an eagle on high, / To the region of Knowledge and blest Liberty."[৩০]

ইয়ং-বেঙ্গলের যুক্তিনিষ্ঠা এবং স্বদেশানুরাগ তাদেরকে দেশ ও সমাজের নানাবিধ কল্যাণকর কর্মে নিয়োজিত করেছিল। নলিনীকান্ত রায় ঠিকই বলেছেন যে, ধর্মভাব বিবর্জিত দেশাত্মবোধ, যা সেদিনের বাঙ্গালী মানসিকতায় দুর্লভ ছিল, তার ধারক ও প্রধান প্রবক্তা ছিলেন ডিরোজিও শিষ্য সম্প্রদায়।[৩১]

দেশ এবং সমাজের উন্নয়নমূলক বহুবিধ কর্মপ্রচেষ্টায় এঁদের মনীষা ও উদ্যম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতে হয়।

ইয়ং-বেঙ্গল সম্প্রদায় দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লবের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। এঁদেরই কেউ কেউ মনে করতেন যে ভারতবর্ষে ফরাসী বিপ্লবের অনুরূপ কোন বিপ্লব অচিরেই সংঘটিত হবে। ১৮৪৩ সালের 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকায় সম্ভাব্য বিপ্লব সম্পর্কে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রবন্ধ রচয়িতার নাম ছিল না, 'Old Hindu' এই ছদ্মনাম ছিল। Old Hindu' রচিত প্রবন্ধের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'The friend of India' পত্রিকায় লেখা হয়—

"To assens that if the Natives had enjoyed the blessings of the French Revolution, they would by this time hame been treated like men, and assumed a proper position among the nations of the earth, is to write absolute nonsense. Let him read theirs and Allison before he again ventures to long for a revolution which would have turned the Hoogly into a revolutionary torrent, and established a permanent guillotine in Tank Square."[৩২]

ব্রিটিশ শাসন ভারতীয় স্বার্থের প্রতিকূল—ইয়ং-বেঙ্গল সম্প্রদায়ের অনেকেই এ-মত পোষণ করতেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার একটি প্রবন্ধে ভারতবর্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকে তীব্র আক্রমণ করে লিখেছেন যে ন্যায়মূলকনীতির উপর এই সরকার প্রতিষ্ঠিত নয়। পরিহাস করে তিনি বলেছেন যে একদল বণিক অকস্মাৎ প্রশাসকের পদে উন্নীত হয়েছে, এদের কাছে ভারতবাসী

সুশাসন আশা করতে পারে না। এই সরকার ভারতবর্ষকে শোষণ ও দোহন করতেই শুধু উৎসাহী। ভারতবর্ষের বিচার বিভাগের প্রহসনকে তিনি তীব্র আক্রমণ করেছেন। রসিককৃষ্ণ ভারতবর্ষে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজনৈতিক কর্তৃত্বের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তিনি লিখেছেন—

"As long as the present system continues in operation, those evils which we have pointed out, will continue to exist."[৩৩]

রসিককৃষ্ণের মত দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ভারতবর্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকে সমালোচনা করেছেন। ১৮৪৩ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি হিন্দু কলেজে পঠিত 'Present Condition of the East India Company's Courts of Judicature and Police under the Bengal Presidecy' প্রবন্ধটি তারই প্রমাণ। বিচার বিভাগের দুর্নীতি সম্পর্কে তিনি অভিযোগ উত্থাপন করেন। স্পষ্টভাবেই তিনি বলেন যে পিওন থেকে সেরেস্তাদার পর্যন্ত সকলেই কোন না কোন ভাবে উৎকোচ গ্রহণ করে। পুলিশ বিভাগের দুর্নীতি সম্পর্কেও তিনি অনুরূপ অভিযোগ উত্থাপন করেন। তিনি বলেন যে আপন স্বার্থেই ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সমূহ সম্পদ আত্মসাৎ ও শোষণ করছে। ইয়ং-বেঙ্গলের আর একজন নায়ক রামগোপাল ঘোষ ১৮৬১ সালে হরিশচন্দ্রের স্মৃতি-সভায় বলেছিলেন—

"In a country like this, and under a government such as they had, it was impossible to expect native talent and native genius to bo appreciated and promoted. They were not living in a free country, or under a representative government. He did not find fault with the existing rule ; perhaps it was the best they could have under present circumstances ; but with an exclusive civil service and no outlet for career there was no stimulus to exertion."

উচ্চতর চাকুরী বাকুরীর ক্ষেত্রে এবং প্রশাসনিক পদে ভারতীয়দের দাবিরও প্রবক্তা ছিলেন ইয়ং-বেঙ্গল সম্প্রদায়। রসিককৃষ্ণ মল্লিক 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় সরকারী চাকুরীতে শিক্ষিত ভারতবাসীকে নিযুক্ত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সেই সময় দুর্নীতির অজুহাতেই ভারতবর্ষীয়দের প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় চাকুরীতে নিযুক্ত করা হতো না। রসিককৃষ্ণ এই অভিযোগ স্বীকার করে বলেন যে ভারতবর্ষীয় অফিসারদের দুর্নীতি পরায়ণতার কারণ দু'টি। তাদের বেতন কাজের পক্ষে উপযুক্ত নয়। 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ভারতীয়দের অংশ থাকা উচিত।[৩৪]

রসিককৃষ্ণের মত দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রশাসনিক পদে ভারতীয়দের দাবী

উত্থাপন করেন। ১৮৪৩ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি মাণিকতলা গার্ডেন হাউসে একটি সভায় দক্ষিণারঞ্জন বললেন—

"Was it not right and proper that those who necessarily knew so much of the country, in consequence of their having been born and educated on the soil, should be permitted to share the places of trust and emolument, now monopolished by Europeans, and contribute their aid in the administration of the law ?"

১৮৪৩ সালের ১৮ই এপ্রিল কলকাতার টাউন হলের সভাতে তারাচাঁদ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা প্রশাসনিক পদে ভারতীয়দের অগ্রাধিকারের ব্যাপারে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৮৪৩ সালের ৬ই জুলাই বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সভাতে অনুরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রে ইংরেজদের একচেটিয়া অধিকারের তীব্র সমালোচনা করেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী। ১৮৪৩ সালের ১৫ই জানুয়ারি 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' পত্রিকায় তারাচাঁদ সিভিল সার্ভিস সম্পর্কে লেখেন—

"Open it to public competition, and the result will be more salutary and advantageous in every point of view."

প্রশাসনিক পদে ভারতীয়দের দাবীর আর একজন প্রবক্তা হলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। ১৮৫৩ সালে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ পুনর্নবীকরণের সময় প্যারীচাঁদ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এসময় একটি পুস্তিকাও রচনা করেছিলেন। ১৮৪৬ সালে প্যারীচাঁদ লিখেছিলেন—

"If the interests of the country are to be served, the line of demarcation which now exists between the covenanted and the uncovenanted must be broken down, as properly qualified condidates increase in number."

ইয়ং-বেঙ্গল দল আইনের ক্ষেত্রে শাসক এবং শাসিতের সমানাধিকার দাবি করেছিলেন। ১৮৪৯ সালে বেথুন সাহেব আইনের ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গদের সমানাধিকারের যে খসড়া রচনা করেন তার বিরুদ্ধে বর্ণসচেতন শ্বেতাঙ্গরা আন্দোলনে মুখর হয়ে ওঠে। ১৮৪৯ সালের ২৯শে ডিসেম্বর কলকাতার টাউন হলে শ্বেতাঙ্গরা সমবেত হয়ে বেথুন সাহেবের খসড়াকে 'কালা আইন' আখ্যা দেয়। রামগোপাল ঘোষ শ্বেতাঙ্গদের অন্যায় আন্দোলনের বিরুদ্ধে কলম ধরেন। তিনি—"A few Remarks on certain Draft Acts, commonly called Black Acts"—নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। বেথুন সাহেবের খসড়াকে সমর্থন করে তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেন যে এর মধ্যে অন্যায়মূলক বা বৈষম্যমূলক কোন ব্যাপার নেই। রামগোপাল লেখেন—

"Is it just, is it fair, is it honest, that a hundred millions

of Her Majesty's native subjects should be taxed so that the European delinquent from the most distant corners of the Empire may enjoy the benefit of being judged by English laws instead of the East India Company's regulation? Englishmen should blush to perpetuate such an iniquitous system."

জুরী ব্যবস্থাকে প্রসারিত করার পক্ষেও তিনি মত প্রকাশ করেন। তবে তিনি লেখেন—

"But whatever these suggestions may be, save us from that glaring absurdity of the English jury system, which makes it necessary that twelve men shall always be of one mind in every question submitted to their consideration."

রায়তদের উপরেও কি ধরণের অত্যাচার হয় সে প্রসঙ্গও তিনি উত্থাপন করেছেন। আইনের সুবিচার রায়তরা পায় না। রায়তের প্রশ্নে রামগোপাল লিখেছেন।

"He (Ryot) must bear and be content that the Englishman is a superior being, that he cannot be touched......he cannot be polluted by the contamination of the same laws which govern such animals as you."

রামগোপাল ঘোষের মত দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ও আইনের ক্ষেত্রে শাসক এবং শাসিতের সমানাধিকার দাবি করেছিলেন। দক্ষিণারঞ্জন সাম্যের একজন বড় উপাসক ছিলেন। ঈশ্বরের রাজ্যে সকলেই সমানভাবে থাকবে এই ছিল তাঁর মত। ভারতবর্ষে শ্বেতাঙ্গরা আইনের যে সুযোগ সুবিধা ভোগ করে কৃষ্ণাঙ্গরা সে সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়—এই বিধি ব্যবস্থা দক্ষিণারঞ্জনের কাছে পীড়াদায়ক ছিল।

ইউরোপীয়দের বর্ণ গৌরবকে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সমালোচনা করেছেন। তাঁরই অনুরোধে গভর্ণর জেনারেলের প্রাইভেট সেক্রেটারী ১৮৪৮ সালে এই প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন যে গভর্ণমেণ্ট হাউসে ভারতীয়রাও সমান মর্যদা লাভ করবে। শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে বর্ণবৈষম্য দূর করার জন্যেই ১৮৪৭ সালের মে মাস Family Literary Club গঠন করেন।

রামগোপাল ঘোষের মত দিগম্বর মিত্র শ্বেতাঙ্গদের Black Act আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে ১৮৫৭ সালের ৬ই এপ্রিল কলকাতার টাউন হলে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভায় তাঁর বক্তৃতা স্মরণীয়। তিনি জাতিপাঁতির বিচারকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেন এবং বলেন যে অন্তরে জাতিবৈষম্য পুঞ্জিত রেখেছে যারা সেই শ্বেতাঙ্গদের কিভাবে যোগ্য বিচারক বলে মেনে নেওয়া যায়!

মফঃস্বলের বিচারালয়ে ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচার না হওয়ার প্রচলিত রীতিটিকে কিশোরীচাঁদ মিত্র অন্যায় এবং অগণতান্ত্রিক বলে মনে করতেন। দিগম্বর মিত্রের মত তিনিও বিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের Black Act বিরোধী আন্দোলনে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

উল্লেখযোগ্য যে ১৮৫৭ সালের ৬ই এপ্রিল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়—

(ক) মফঃস্বল ফৌজদারী কোর্টে ইউরোপীয় ও ভারতীয় উভয়েরই বিচার হবে,

(খ) বিভিন্ন পদে আসীন ভারতীয় অফিসাররা উপযুক্তভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করছেন।

(গ) শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ প্রয়োজন।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার ব্যাপারে ইয়ং-বেঙ্গল দল সোচ্চার হয়েছিলেন। ১৮২৩ সালে প্রেস রেগুলেশন বাতিল করে ১৮৩৫ সালের আইন গ্রহণ স্বাধিকার রক্ষার সংগ্রামের ক্ষেত্রে বিরাট বিজয় হিসাবে দেখা দিয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাদাতা চার্লস মেটকাফকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য কলকাতার নাগরিকেরা টাউন হলে একটি সভার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই সভায় অন্যতম বক্তা ছিলেন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। দক্ষিণারঞ্জন তাঁর বক্তৃতায় বলেন—

"আমরা যে স্বাধীনতা চাই তা সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা নয়, তা দায়িত্বপূর্ণ অথচ অবাধ স্বাধীনতা। দোষী ব্যক্তি আইনের অধীন নিশ্চয় হবে। সে যদি দণ্ডযোগ্য হয় বিচারালয় নিশ্চয় তাকে দণ্ড দেবে। আমি এজন্য দুঃখিত যে প্রস্তাবিত আইন বিধিবদ্ধ না করার জন্য লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযোগের যথেষ্ট কারণ রয় গেছে। যদি তিনি এ আইন ভাল বিবেচনা করতেন তবে উচিত ছিল আইনটি তুলে দেওয়া। এর কোনটি না করা নিছক ভণ্ডামি মাত্র।"

আমরা পূর্বেই বলেছি যে ইয়ং-বেঙ্গল দল সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক জীবনের সঙ্গে আন্তরিকভাবে নিজেদের যোগ স্থাপন করতে পারে নি। তবে বুদ্ধিগত দিক দিয়ে এঁদের কেউ কেউ দেশের রায়তদের সমস্যা অনুভব করবার চেষ্টা করেছিলেন। রায়তদের অধিকার রক্ষার জন্য চেষ্টিত হয়েছিলেন কেউ কেউ। রসিকরক্ষ মল্লিক অনুভব করেছিলেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলা দেশের রায়তদের জীবনে দুর্বিষহ অভিশাপ ডেকে এনেছে। রায়তদের উপর জমিদারদের অত্যাচারও নিন্দিত হয়েছে তাঁর লেখনীতে।

রায়তদের পক্ষে আর একজন বড় প্রবক্তা হলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। অনুমান করা যায় যে 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' পত্রিকায় কৃষকদের দুর্দশার বিবরণ সম্বলিত সবকটি প্রবন্ধই তাঁরই রচনা। আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে প্যারীচাঁদের কৃষক দরদী ভূমিকার বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

ইয়ং-বেঙ্গল দল শিক্ষা বিস্তারের উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। যেহেতু

শিক্ষা চেতনা বিস্তারের হাতিয়ার, তাই উন্নত জীবনের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। ইয়ং-বেঙ্গল মনে করতেন শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারে মনোযোগী হওয়া ভারতের ব্রিটিশ সরকারের একটা নৈতিক দায়িত্ব। তারাচাঁদ চক্রবর্তী বলেছিলেন যে জনগণের অধিকার রক্ষা, অন্যায় অবিচার দূরীকরণ এবং সামগ্রিক উন্নতিবিধান যদি সরকারের লক্ষ্য হয় তাহলে শিক্ষাবিস্তারের কর্মসূচী তাকে গ্রহণ করতেই হবে। তারাচাঁদ শুধু তাত্ত্বিক শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না। ব্যবহারের উপযোগী শিক্ষার উপরেও তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁরই মত রাধানাথ শিকদারও টেকনিক্যাল্ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। ইয়ং-বেঙ্গলের আর একজন নেতা রামগোপাল ঘোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। শুধু শিক্ষাবিস্তার নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতার ব্যাপারে এঁরা যেমন উৎসাহ দেখিয়েছেন তেমনি উৎসাহ দেখিয়েছেন মাতৃভাষা মাধ্যম গ্রহণ করার ব্যাপারে।

চার

ডিরোজিওর শিষ্য সম্প্রদায়ের মত রামমোহন রায়েরও একদল শিষ্য সম্প্রদায় ছিল। ইয়ং বেঙ্গলের মত এঁরা সমাজ ও সরকারের উৎস ও স্বরূপ সম্পর্কিত তাত্ত্বিক ভাবনায় ভাবিত না হলেও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমকালীন সমস্যা এবং অভাব অভিযোগের সমাধান চাইতেন। ইংরাজী শিক্ষায় এঁরা সকলেই শিক্ষিত ছিলেন। এঁদের রাজনীতিজ্ঞান ছিল। সরকারী নীতির বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচনা এঁরা করতেন এবং দেশবাসীর রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার চেষ্টাও করতেন। এইসব আন্দোলন পরিচালনার জন্য সংঘবদ্ধ কর্ম-প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তা এঁদের উপলব্ধিতে ধরা পড়েছিল। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার এইজন্যই লিখেছেন—

"Neither the Serampore missionaries, nor the anti-Rammohun party made any systematic and organised effort to ameliorate the political and economic condition of the people. What characterised the disciples of the Raja from them was their wide outlook in politics."[৩৫]

ক] দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন প্রখর বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। রামমোহনের সঙ্গে বয়সের পার্থক্য সুদীর্ঘ হলেও কর্মগতভাবে দ্বারকানাথ তাঁর বন্ধুস্থানীয় ছিলেন।

দ্বারকানাথ উপলব্ধি করেছিলেন যে অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সংবাদপত্র একটা বড় শক্তি। স্বদেশবাসীর স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রেও সংবাদপত্র একটি বিশিষ্ট রক্ষাকবচ। তিনি দেখেছিলেন যে নানা দিক থেকে স্বদেশবাসীর স্বার্থ আক্রান্ত ও পদদলিত হচ্ছে, তাই সংবাদপত্রের মাধ্যমে যে ধরণের সুফল পাওয়া যায় তা গ্রহণ করার জন্য তিনি কেবল অর্থ ব্যয় করতেন না, ব্যক্তিগতভাবে পরিশ্রম

করতেও দ্বিধা করতেন না।[৩৬] দ্বারকানাথ নিজে কোন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন নি বটে, কিন্তু সেকালের প্রভাবশালী ইঙ্গবঙ্গ সংবাদপত্রের বড় শেয়ার তিনি কিনেছিলেন। ১৮২৪ সালে বিধিবদ্ধ প্রেস রেগুলেশন প্রত্যাহার করাব জন্য যে আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন রামমোহন, সেখানে তাঁর সহযোগী শক্তি ছিলেন দ্বারকানাথ। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বাস্তবায়িত হবার পর, কলকাতার নাগরিকরা গভর্ণর জেনারেল মেটকাফের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য ১৮৩৫ সালের ৮ই জুন কলকাতার টাউন হলে যে জনসভা করেন সেখানে দ্বারকানাথ বলেন ঃ

"মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার পথে যে সমস্ত বাধা নিষেধ ছিল সেগুলো দূর করবার জন্য সব সময় আমি আগ্রহান্বিত ছিলাম এবং সে সম্পর্কে যে সব সভায় জনমত প্রকাশ পেত সেগুলিতে আমি অংশ নিয়েছি। অতএব এ প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য আমি যে আনন্দানুভব করব তা খুবই স্বাভাবিক।"[৩৭]

দ্বারকানাথ বৃটিশ শাসনের সুফল সম্বন্ধে উচ্চকণ্ঠ হলেও তার ক্ষতিকারক দিকগুলি সম্বন্ধে অসচেতন ছিলেন না। ১৮৩৬ সালের ১৮ই জুনের একটি সভায় তিনি বলেন যে বৃটিশ রাজশক্তি—

"ভারতবাসীর বহু অধিকার হরণ করেছে। তাদের জীবন, স্বাধীনতা, সম্পদ সবই বৃটিশ সরকারের কৃপার বিষয়।"[৩৮]

অন্যদিকে তিনি আত্ম অধিকার রক্ষার ব্যাপারে ভারতবাসীর ঔদাসীন্যকে ধিক্কার জানিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

"অধিকাংশ দেশবাসী বলে, 'যদি আমার একটা চোখ নষ্ট হয় তাহলে অন্যটার যত্ন নিতে হবে'— ; এবং এইভাবে তারা নিজেদেরকে সরিয়ে রাখে, স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করে।"[৩৯]

মফঃস্বল অঞ্চলে আইন শৃঙ্খলার রক্ষকরাই যে জনগণের অধিকার হরণ করে সে বিষয়টি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পুলিশ রিফর্ম কমিটির কাছে সাক্ষ্যদান কালে দ্বারকানাথ তীব্রকণ্ঠে বলেছিলেন ঃ

"দারোগা থেকে শুরু করে নিচের তলার পিওন পর্যন্ত সকলেই অসৎ। ঘুষ ছাড়া একটা কাজও সেখানে হয় না।"[৪০]

গ্রামাঞ্চলে অত্যাচার ও নৈরাজ্যের এক ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছিলেন দ্বারকানাথ। গ্রামাঞ্চলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের দাবি করেছিলেন তিনি। তিনি দাবী করেছিলেন ঃ

"The present Darogahs should be abolished, and the Thannas remodelled on the plan of those in calcutta."[৪১]

ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবর্ষে বিচার বিভাগেও দুর্নীতি যে রন্ধ্রে রন্ধ্রে সে সম্পর্কে দ্বারকানাথ অসচেতন ছিলেন না। ১৮৩৬ সালে একটি বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন ঃ

"যে একনায়কতন্ত্র বর্তমানে আমাদের ভীতির কারণ তার হাত থেকে আত্ম-

রক্ষাও আমাদের দায়িত্ব। ভদ্রমহোদয়গণ, যদি আমি আপনাদের কাছে কয়েকটি মামলার খুঁটিনাটি বিবরণ দিই, এবং নিরপেক্ষতা, সুবিবেচনা ও ন্যায় বিচারের ভান করে অনেক হাকিম সেগুলো যেভাবে বিচার করেছেন তা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করি, তাহলে আমরা বক্তব্য শেষ করতে আরো কিছুক্ষণ বেশী সময় লাগবে।"[৪২]

দ্বারকানাথ বলেছেন যে মফস্বল আদালতের যারা হাকিম তারা ততটা দোষী নয়, যতটা দোষ যে পদ্ধতিতে আইন প্রয়োগ করা হয় সেই পদ্ধতির। বিচার বিভাগের দুর্নীতি রোধ করার জন্য তাঁর প্রস্তাব—

i] সুপ্রিম কোর্টে জুরী দ্বারা বিচার প্রবর্তন,

ii] মফঃস্বল অঞ্চলেও জুরীদ্বারা বিচার ব্যবস্থার বিস্তৃতি সাধন।

দ্বারকানাথের রাজনৈতিক ভাবনার স্বরূপ সম্পর্কে কিশোরীচাঁদ মিত্রের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ

"রাজনীতি ক্ষেত্রে দ্বারকানাথ একদিকে যেমন ছিলেন রাজভক্ত অপরদিকে তেমনি ছিলেন উদারনৈতিক। তাঁর রাজনৈতিক মতের প্রধান সূত্র ছিল ভারতের প্রতি সুবিচার কামনা এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য।··· মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা এবং স্টীমের সাহায্যে যাতায়াত ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য তিনি যে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাতে দেখা যায় যে মাঝে মাঝে সরকারের বিরোধিতা করার উপযোগিতা এবং শাসকবর্গের কার্যধারা নিয়ন্ত্রণে শিক্ষিত জনমতের গুরুত্ব তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। জনস্বার্থ সম্পর্কিত প্রশ্নে এবং জনসভাগুলি সম্পর্কে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ পেত। তাতে তাঁর চিন্তার স্বাধীনতা, নিরপেক্ষ বিচার ক্ষমতা এবং দৃঢ় প্রত্যয়ই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল।"[৪৩]

খ] ডঃ আলেকজেণ্ডার ডাফ যদিও বলে ছিলেন যে, 'রিফর্মার প্রকাশের প্রথম দিকে প্রসন্নকুমার ঠাকুর 'radical and extremist views' পোষণ করতেন ("In politics, the 'Reformer' at first assumed a tone of rancorous and indiscriminate violence towards the British Government"[৪৪]) তথাপি প্রকৃত প্রস্তাবে প্রসন্নকুমার ছিলেন রামমোহনেরই শিষ্য। তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৬৮ সালের ২৯শে অক্টোবর বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের উদ্যোগে যে শোকসভার অনুষ্ঠান হয় সেখানে রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রসন্নকুমারের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঠিক ব্যাখ্যা করেই বলেছিলেন ঃ

"Baboo Prosunno Coomar was to say a liberal conservative on a moderate progressionist."[৪৫]

সভাসমিতি স্থাপন ও সংবাদপত্র প্রকাশের মাধ্যমে জনমত সংগঠিত করার গুরুত্ব তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। স্বল্পস্থায়ী গৌড়ীয় সমাজ[৪৬] মূলতঃ তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩১ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি তিনি প্রকাশ করেন ইংরেজী সাপ্তাহিক 'Reformer'। পত্রিকাটি যে সেকালে জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ছিল তার প্রমাণ প্রচার সংখ্যা। নিম্নের তালিকাটি লক্ষ্য করা যেতে পারে ঃ

পত্রিকা	প্রচার সংখ্যা
Gyananneshun	১০০
India Gazette	৩৭৩
Calcutta courier	১৭৫
Bengal Chronicle	২০৮
Bengal Herald	২৪২
Indian Register	২০০
Enquirer	২০০
Reformer	৪০০

রামমোহন বা দ্বারকানাথের মত প্রসন্নকুমারও বৃটিশ শাসনকে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে অপরিহার্য বলে মনে করতেন। ১৮৩১ সালের জুলাই মাসে তিনি বলেছিলেন :

"If we were to be asked, what Government we would prefer, English or any other, we would one and all reply, English by all means, ay, even in preference to Hindu Government."[৪৭]

বৃটিশ শাসনের প্রতি এই পক্ষপাতিত্ব অবশ্য নিতান্ত অন্ধ এবং যুক্তিবিচার বর্জিত ছিল না। বৃটিশ শাসন যে সর্বগুণযুক্ত এবং সর্বদোষবিরহিত সে কথা অন্ধভাবে গ্রহণ করে নিতে পারেন নি তিনি। প্রসন্নকুমার লিখেছেন :

"We accordingly take the liberty of pointing out the defects which we perceive in the existing institutions of the country, with a sincere desire for their improvment."[৪৮]

শাসিত ভারতবাসীর প্রতি শাসক ইংরেজের উদ্ধত আচরণকে প্রসন্নকুমার সমালোচনা করেছেন। 'On the insecurity of the British Indian Empire' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে ভারতের অতীত ইতিহাসে শাসিতের প্রতি শাসকের এমন আচরণ দেখা যায় নি। প্রসন্নকুমারের মতে, ভারতবাসীর প্রতি ইংরেজের বৈষম্যমূলক আচরণের আর একটি দৃষ্টান্ত হল উচ্চতর প্রশাসনিক পদে ভারতীয়দের নিয়োগের ব্যাপারে চরম অনীহা। অনুমান করা যেতে পারে যে, ভারতীয়দের উচ্চতর ও গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের ব্যাপারে তাঁর জোরালো বক্তব্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক ১৮৩২ সালের ৬নং রেগুলেশন প্রবর্তন করেন।

মফঃস্বলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বৃটিশ শাসকের ব্যর্থতার সমালোচনা করেন প্রসন্নকুমার। জুরীর দ্বারা বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তনের উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন :

"The ministers of religion, who were also the legislators, easily discovered the weakness of the people, who, from

ignorance, were credulous of the most absurd doctrines, which were offered for their belief, and to place their power by sacrificing the rights of the people, which were in a manner entrusted to their charge, by the credulous mob. Thus the appeal from the verdict of the panchayat was made to rest with the king."[৪৯]

ভূম্যধিকারী সভার সক্রিয় সদস্য হিসাবে প্রসন্নকুমার নিষ্কর জমি বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার আন্দোলনেও সামিল হয়েছিলেন তিনি।

(গ) হিন্দু কলেজের প্রতিভাবান ছাত্র গোবিন্দচন্দ্র দত্ত রামমোহনের মত গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসনের উপর আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি। লর্ড কর্ণওয়ালিসের পূর্বে ভারতবর্ষে যে শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাকে চরিত্রগত দিক থেকে সামন্ততান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে তিনি লিখেছিলেন ঃ

"Tyrannical and cruel themselves, the nobility of the counry ruled absolute over their own dominions—seldom permitting strangers to interfere in matters connected with their tenanty, whom they considered their own exclusive property, and putting down all crimes, except those which they themselves committed, with a rod of iron."[৫০]

চাকুরি ও বেতনের ক্ষেত্রে তিনি শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয়দেব মধ্যে সমতা দাবি করেছিলেন। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের প্রশ্নে রামমোহনের সমমতাদর্শী ছিলেন তিনি। তাঁর মতে বিচার বিভাগের সঙ্গে শাসন বিভাগের সংযুক্তি নানা দুর্নীতি ও অব্যবস্থার উৎস।

"There is scarcely any principle in jurisprudence more important than the separation of these two offices."[৫১]

বিচারের ক্ষেত্রে সমতা এবং ভারতীয়দের জন্য ন্যায়বিচারের পথ সুগম করার দাবি জানিয়ে তিনি বলেছিলেন ঃ

"The necessity of dealing with all alike, of breaking down the invidious distintion of having one description of tribunal for the governors, and another for the governed, is too evident to be questioned."[৫২]

(ঘ) মূলতঃ ধর্মসাধক ও ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকরূপে খ্যাতনামা হলেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক চেতনাবিকাশের ইতিহাসে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাঁর 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা 'তত্ত্ববোধিনী সভার' মুখপত্ররূপে তত্ত্বকথা প্রচার করলেও কালক্রমে তা উনিশ শতকের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে।[৫৩]

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিভিন্ন বিভাগে ভারতীয়দের চাকুরিতে নিয়োগের ব্যাপারে তারাচাঁদ চক্রবর্তী যে আন্দোলন করেন দেবেন্দ্রনাথ সে আন্দোলনে সামিল হন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৪৩ সালের ১৮ই এপ্রিল কলকাতায় যে জনসভা হয় দেবেন্দ্রনাথ সে সভায় প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করেন।[৫৪]

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন গঠনে তাঁর উদ্যোগ ছিল। সংগঠনটিকে তিনি সর্বভারতীয় চরিত্র দানেরও চেষ্টা করেছিলেন। এই সংগঠনের প্রথম সম্পাদক হিসেবে পল্লীবাসী দরিদ্র জনগণের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষার দাবি জানিয়ে তিনি বলেছিলেন ঃ

"The rural population, whose industry most largly contributes to the resources cf the State, were left not only without adequate protection, but without many of the advantages which are enjoyed by other classes."[৫৫]

লবণ কর সম্পর্কিত সরকারী নীতির বিরুদ্ধে এবং নিষ্কর জমি বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন। ১৮৫৩ সালে সনদ পরিবর্তনের সময় ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এই সময় দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন যে দাবিগুলির উপর ভিত্তি করে জনমত সংগঠিত করেছিল, সেগুলি হল ঃ

i] ভূমির উপর সরকারী পাওনা হ্রাস,

ii] ব্যক্তিগত সম্পদ রক্ষা,

iii] লবণ ও আফিং-এর উপর ইংরেজ একচেটিয়া ব্যবসার অধিকার বিলোপ,

iv] পুলিশ ও বিচার বিভাগের সংস্কার,

v] ভাইসরয়ের আইন সভায় ভারতীয় প্রতিনিধি নিয়োগ,

vi] ভারতবর্ষে নিয়মতান্ত্রিক আইনসভা প্রবর্তন।

পাঁচ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক চেতনার এই প্রেক্ষাপটটিকে সামনে রেখে আমরা এবার হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রাজনীতি ভাবনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব।

হরিশচন্দ্রের জীবনী আলোচনায় প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি পর্যাপ্ত অ্যাকাডেমিক শিক্ষা তিনি লাভ করতে পারেন নি। স্বাশিক্ষিত এই মানুষটি প্রকৃত প্রস্তাবেই—"Was a self made man."[৫৬] পাশ্চাত্য ভাবধারাকে কেবল বহিরঙ্গেই তিনি অঙ্গীকার করেন নি, আপন জীবন দর্শনের উপাদানে পরিণত করে নিয়েছিলেন। তাঁর রচনাগুলি তাঁর যুক্তিবাদী মানসিকতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁর সমুহ সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমরা একমত হই বা না হই, স্বীকার করতে দ্বিধা থাকে না যে হরিশ সংস্কারানুগ পথে যেমন বিচরণ করেন নি, তেমনি মেনে

চলেন নি কোন আপ্তবাক্য। শ্রেণীস্বার্থ বা সুবিধাবাদ তাঁর দৃষ্টিকে অন্ধ করে নি। হরিশকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ না বলে বোধকরি বলা উচিত যে রাজনীতি ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান, রাজনীতি ছিল তাঁর অস্থি-মজ্জায়। এই রাজনীতির টানেই 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন তিনি। বাক্যে ও আচরণে এই রকম খাঁটি রাজনৈতিক মানুষ তাঁর সমকালে আর কেউ ছিলেন না। বিদ্যায় ও ব্যক্তিত্বে রামমোহন—দ্বারকানাথ—দেবেন্দ্রনাথ—প্যারীচাঁদ প্রমুখেরা তাঁর তুলনায় শ্রেষ্ঠ নিঃসন্দেহে ; কিন্তু অন্যান্য কর্মের সঙ্গে তাঁরা রাজনীতিচর্চা করেছেন আর একটি কর্ম হিসেবে। হরিশ কিন্তু রাজনীতি চর্চা ব্যতীত অন্য কিছুই করেন নি। হরিশের মৃত্যুর পর গিরিশচন্দ্রের উক্তিকে আদৌ অত্যুক্তি বলে মনে হয় না :

"সম্প্রতি আমরা যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল্য অনুধাবন করতে শিখেছি তার প্রাণস্বরূপ ছিলেন হরিশচন্দ্র।"[৫৭]

হরিশচন্দ্রের ইংরেজী রচনাবলীর সম্পাদনা প্রসঙ্গে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত যথার্থই বলেছেন :

"We do not rate the life and work of Hurrish Chunder Mookerji as a merely brilliant career. We can trace to him the source and the nourishment of that political life in our people whose force and importance we are only beginning to appreciate and which are no doubt big with huge possibilites in the future."[৫৮]

মার্কসীয় দর্শনে 'পেশাদার বিপ্লবী' শব্দদ্বয় যে অর্থে প্রযুক্ত হয় সে অর্থে হরিশকে 'পেশাদার রাজনীতিবিদ' বলা বোধকরি অসঙ্গত হবে না। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পরিচালনা করতে গিয়ে তিনি যেমন ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি দ্বারা চালিত হন নি, তেমনি নাম কেনার মধ্যবিত্তসুলভ মোহের দ্বারাও আবিষ্ট হন নি। 'হিন্দু পেট্রিয়ট ও হরিশচন্দ্র' শীর্ষক আলোচনায় আমরা তথ্য প্রমাণ সহযোগে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে উক্ত পত্রিকার প্রকাশ অব্যাহত রাখার জন্য তাঁকে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল।

পাশ্চাত্য রাজনীতিবিদ ও রাজনীতি চিন্তার সঙ্গে হরিশচন্দ্রের যে হৃদ্য পরিচয় ছিল, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত হরিশের ইংরেজী রচনা সংকলন থেকে তার কিছু অভিজ্ঞান উদ্ধৃত করা যাক :

অ] The Real Disease প্রবন্ধে জেমস উইলসন নামক ইংরেজ অর্থনীতিবিদের নামোল্লেখ।

আ] Indiscriminate Retribution And The Antagonism of Race' প্রবন্ধে ফরাসী দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর পর্যালোচনা ও লামার্টিনের উদ্ধৃতি।

ই] The Atrocities প্রবন্ধে ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসের নির্বাচিত

ঘটনাবলীর দ্বারা তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে হত্যা, অত্যাচার ও প্রতিশোধ-স্পৃহা সেখানেও ছিল।

ঈ] The Future of Indian Government প্রবন্ধে ইংরেজ জনগণের মানসিকতা ও রাজনৈতিক মেজাজের ব্যাখ্যা—"The English peole are essentially conservative as much nine-tenth of the human race."

উ] Native Gentlemen officers প্রবন্ধে চতুর্দশ লুই ও নেপোলিয়নের প্রসঙ্গে উত্থাপন।

ঊ] An Indian Parliament প্রবন্ধে আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা-বাণী, প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার, বৃটিশ পার্লামেন্টের প্রসঙ্গ।

ঋ] Federalization প্রবন্ধে আমেরিকার রাজ্যগুলির শাসনব্যবস্থার দৃষ্টান্ত।

ঌ] The Mandarins প্রবন্ধে ক্রমওয়েল, ফিলিপ অফ ম্যাসিডন, রোমের প্রজাতন্ত্র প্রভৃতির প্রসঙ্গ।

এ] A plea For caste প্রবন্ধে ফরাসী ও আমেরিকার বিপ্লবের উল্লেখ—"It is a singular fact in nearly all the revolutions on earth that men, when they have once made up their minds to disobey their sovereign, or disacknowledge existing laws, pause to begin the offensive ere they have dragged to light some obscure repudiated statute or a law that was certainly made, but was never enforced whereon to allay the anxiety of their national conscience; for, with the exception of the American and the French Revolution, all political struggles have ostensible been to assert or to deny historical, but unrecognized rights."

ঐ] A plea For caste প্রবন্ধে ঈজিপ্ট, পেরু, গ্রীসের ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ।

ও] The Social progress of India প্রবন্ধে ইংলণ্ডের স্টুয়ার্টদের প্রসঙ্গ।

ঔ] English And Hindoo Civilization :—A Contrast প্রবন্ধে অর্থনীতিবিদ ম্যালথাসের প্রসঙ্গ, ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা—"The miseries of over-production are felt as extensively among the capitalist as those of scarcity are felt by lower classes."

ক] National Education প্রবন্ধে সুইজারল্যাণ্ড, প্রাশিয়ার সরকারের শিক্ষানীতির পর্যালোচনা।

খ] The Necessity of A Language For India প্রবন্ধে লিখেছেন —"Politicians, who are at the same time philosophers, like M. De Tocqueville, have however shown that the anomaly was possible only in the remoteness of America from the whirlpool of European politics."

স্বদেশ ও বিদেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর পর্যালোচনায় সংবাদপত্র একটি বড় হাতিয়ার। হরিশ দেশী ও বিদেশী সংবাদপত্রের নিবিড় পাঠক ছিলেন। তাঁর রচনাবলীতে যেসব সংবাদপত্রের উদ্ধৃতি ও প্রসঙ্গ আছে সেগুলি হল :

ক] Central Star
খ] The Times
গ] The Friend of India
ঘ] The Englishman
ঙ] The Saturday Review
চ] The Economist
ছ] The Morning Star
জ] The Leader
ঝ] The Indian Field
ঞ] The Edinburgh witness
ট] The Dacca News
ঠ] The Hurkaru
ড] The Madras Athenaeum
ঢ] The Bombay Times
ণ] The Bombay Gazette
ত] The Westminister Review

স্বমত প্রতিষ্ঠার জন্য এবং স্বমতের বিরোধী মত খণ্ডনের জন্য হরিশ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রসঙ্গ ও উদ্ধৃতিকে কিভাবে কাজে লাগিয়েছেন তার দু'চারটি দৃষ্টান্ত :

ক] "The Friend of India has 'not patience to reply' to the argument of the petitioners 'that the measure will be useless."[৫৯]

খ] "The Edinburgh Review indeed which came out immediately after the publication of report almost resented the weakness of the commissioners."[৬০]

গ] "If the rebellion is purely a demonstrative movement of the Hindustani race as Index expounds and which the Madras Athenaeum accepts, Behar must be allowed to

contain a strong and large modicum of that national element of India."[৬১]

ঘ] "The gist of the Hurkaru's argument is that if natives are admitted to any of the offices now held by covenanted Europeans discontent would spread over the land. We endeavoured in our last number to expouse the fallacy of this imputation on our national character."[৬২]

ঙ] "The Englishman has the modest assurance to write—'we do not hesitate to say that all classes of Her Majesty's subjects should in criminal matters be amenable to the same tribunals !' Not hesitate ! Why the paper has been affirming precisely the contrary for years ! so have the whole of his party. Why was the Act that was to render them amenable Black."[৬৩]

চ] —"Not that we deny the utility of such exhortations as the Bombay Gazette has put forth."[৬৪]

পেশাদার রাজনীতিবিদের মত হরিশচন্দ্র সমকালীন সরকারী ঘোষণাপত্র ও দলিলাদির সম্বন্ধে সজীব সন্ধান রাখতেন। বিভিন্ন সভা সমিতি ও পার্লামেন্টের বিতর্কও তাঁর দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হয় নি। যেমন—

ক] The Country And The Government প্রবন্ধে ১৮৫৭ সালের মে মাসে গভর্ণর জেনারেলের ঘোষণাপত্রের উল্লেখ।

খ] The Crisis And The Native Princes প্রবন্ধে আর্ল অফ ডার্বি উত্থাপিত ইণ্ডিয়ান বিলের (৩ নং) পর্যালোচনা।

গ] The East India Company প্রবন্ধে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অফ ডিরেক্টরদের আবেদনপত্রের উল্লেখ।

ঘ] India In The House of Commons প্রবন্ধে ভারতবর্ষ সম্পর্কে হাউস অফ্ কমন্সের বিতর্কের আলোচনা।

ঙ] The Transfer, The Proclamation প্রভৃতি প্রবন্ধে ক্ষমতার হস্তান্তর সম্বন্ধে মহারানীর ঘোষণাপত্রের আলোচনা।

চ] The Reconciliation প্রবন্ধে চেম্বার অফ কমার্সের ঘরে মহারানীর ঘোষণাপত্র সম্পর্কিত সভার বিবরণ।

ছ] The New Sale Law Bill প্রবন্ধে স্যর জন পিটার গ্রাণ্ট কর্তৃক উত্থাপিত বিক্রয় আইন সম্পর্কিত বিলের পর্যালোচনা।

জ] লর্ড স্ট্যানলির বক্তৃতার পর্যালোচনা আছে Lord Stanley On Indian Policy প্রবন্ধে।

ঝ] 'The Indian Debate প্রবন্ধে হাউস অফ কমন্সে রিফর্ম' বিল সম্পর্কিত বিতর্কের আলোচনা।

ঞ] হ্যালিডের পুলিশ 'মিনিটের উল্লেখ আছে Constitutionalism In India প্রবন্ধে।

ট] Employment of Natives প্রবন্ধে বেতন কমিশনের রিপোর্টের পর্যালোচনা।

সমকালের অন্যান্য অনেক শিক্ষিত বাঙালীর মত হরিশচন্দ্র বৃটিশ শাসনের ফলপ্রদ দিকগুলি সম্পর্কে সপ্রশংস ছিলেন। তাঁর মতে ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের ফলে যেসব উপকার সাধিত হয় সেগুলি হল ঃ

ক] শৃঙ্খলা স্থাপন,

খ] আইনের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা,

গ] জীবনের নিরাপত্তা বিধান,

ঘ] রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা,

ঙ] ইউরোপীয় সভ্যতার সুফল বিতরণ।

১৮৫৮ সালের একটি প্রবন্ধে হরিশ লিখেছিলেন ঃ

"The company has carried order where it was chaos, imposed laws on lawless herds of banditti, given security to possession and property, where it was perpetual danger and disturbance, scattered the luxuries of European civilization, diffused the blessings of Anglo-Saxon energy and industry, founded an admirable system of political equality, and brought justice to the poor man's door."[৬৫]

শুধু এই নয়, হরিশ বৃটিশ শাসনের সপ্রশংস উল্লেখ অন্যত্রও করেছেন, পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা তার উল্লেখ করেছি। কিন্তু এই সব উদ্ধৃতি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব স্বার্থান্বেষীসুলভ অন্ধ স্তাবকতা এর মধ্যে নেই। হরিশের দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্য ও প্রগতিশীলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আমরা তাঁর বক্তব্যের পাশাপাশি অন্যান্য মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্য পাঠ করি।

'মুখার্জীস ম্যাগাজিন' এবং 'রেইস এণ্ড রায়ত' পত্রিকার সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখার্জী বলেছিলেন যে ভারতবর্ষে রাজতন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন শাসন সম্পর্কে জনগণের কোন অভিজ্ঞতা নেই, সুতরাং তথাকথিত নিয়মতান্ত্রিক শাসন এখানে সার্থক হবে না।[৬৬] 'হিন্দু পেট্রিয়টের' পরবর্তী সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল একদিকে যেমন বৃটিশের সহযোগিতায় ভারতের স্বায়ত্তশাসন কল্পনা করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি 'হিন্দু পেট্রিয়ট'কে জমিদারদের স্বার্থরক্ষক বলে ঘোষণা করেন।[৬৭]

এইসব বুদ্ধিজীবীরা কেউই হরিশের মত প্রথমাবধি বৃটিশ শাসনের উপকারিতা সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করেন নি। ১৮৫৭ সালের ২১শে জানুয়ারি

হিন্দ্ব পেট্রিয়টের একটি প্রবন্ধে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে হরিশের সংশয় স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। হরিশ বলেছেন যে হাউস অফ কমন্সে ভারত দরদী কেউ কেউ আছেন হয়ত ঃ

"But a nation, far less a nation composed of once fifth of the population of the globe, cannot afford to live upon the charity of individuals."[৬৮]

ক্ষমতার হস্তান্তর যে দ্রুততার সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছে তার মধ্যে হরিশ গূঢ় রহস্যের গন্ধ পেয়েছেন ঃ

"The transfer might be the best possible thing for us, but we are terrified at the pace at which the theory has travelled to practice."[৬৯]

মহারানীর ঘোষণাপত্রকে স্বাগত জানিয়েও বলেছেন ঃ

"It remains to be seen whether the executors of the sovereign's commands can raise themselves to the height of their charge,"[৭০]

ব্রিটিশ শাসন যে ভারতবাসীর মনে পরাধীনতার বেদনাজনিত ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় হরিশ সে কথা উচ্চারণ করেছেন ঃ

"There is not a single native of India who does not feel the full weight of the grievances imposed upon him by very existence of the British rule in India—grievances inseparable from subjection to a foreign rule."[৭১]

সিপাহী বিদ্রোহে হরিশের প্রতিক্রিয়ার আলোচনা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে করেছি। এই বিদ্রোহে দেশের ভূস্বামীবর্গ যখন ব্রিটিশ রাজের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে ব্যস্ত এবং মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা সন্ত্রস্থ বা উদাসীন, তখন হরিশই বিদ্রোহের সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণানুসন্ধানে উৎসাহী। শুধু তাই নয়, হরিশ সিপাহীদের দুর্দশায় একদিকে যেমন ব্যথিত, অন্যদিকে তাদের প্রতি ব্রিটিশ রাজশক্তির অন্যায় দমন-পীড়নে ক্ষুব্ধ। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকার অলীক প্রচারেরও তিনি প্রতিবাদী। নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি তার প্রমাণ ঃ

ক] Indiscriminate Retribution And the Antagonisim of Race —Hindoo Patriot, 7.1.1858

খ] Non-Official Misrepresentation—ঐ, ঐ

গ] English Opinion. —ঐ, ঐ

ঘ] Retribution—ঐ, 21.1.1858

ঙ] Reaction In English Feelings—ঐ, 18.2 1858

চ] English Opinion And Indian Facts.—ঐ, 15.4,1858

ছ] The Atrocities And Retribution.—ঐ, 6.5 1858

জ] The Atrocities.—ঐ, 8 7.1858

ঝ] The Atrocities And The Atrocity Mongers.—ঐ 19.8.1858

ঞ] The Times Special Correspondent. – ঐ, 26,8.1858

ট] Confiscation OF The Property of Rebels.—ঐ, July, 1858

ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও শ্বেতাঙ্গদের জাতিগর্ব সহ্য করতে পারেন নি হরিশ। ভারতবাসীর প্রতি ইংরেজের ঘৃণা, ও অত্যাচারের প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি। 'Treatment of the Native' প্রবন্ধে তিনি বোম্বাই-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন যে ভারতবাসীর প্রতি ইংরেজের এই অবিচারের দৃষ্টান্ত বিচ্ছিন্ন নয়। হরিশ লিখেছেন ঃ

"It is not the Bombay sessions alone which bears evidence of the wanton violence that marks the habitual behaviour of a large and growing class of Europeans towards the natives of this country. At a recent prosecution in the Supreme Court, the Advocate General had cause to lament over a similar state of feeling between the two classes."[৭২]

জাতিগর্বে শ্বেতাঙ্গরা এত মত্ত যে কৃষ্ণাঙ্গদের মানুষ বলেই তারা ভাবে না। কৃষ্ণাঙ্গদের উপর এদের অত্যাচার অপ্রতিহত গতিতে বেড়ে চলেছে, কারণ বিচারালয় এদেরই পক্ষ নেয়। দেশীয় মানুষ ও সংবাদপত্র এই ধরণের, অত্যাচারের ঘটনা সাহসিকতার সঙ্গে তুলে ধরে না বলেও হরিশ ক্ষোভ প্রকাশ করেন ঃ

"No gentle teaching will convince them that the nigger has a soul or that he is made to do anything but minister, aye even with his life, to the wants of the Shaheb. Not that we deny the utility of such exhortations as the Bombay Gazette has put forth. Far from it. They secure, if not to reform the 'young men', to shame their betters (sic) habits of thought and expression into more becoming than is common among them. The majority of the Indian Press are afraid of speaking of the evil. There are a discreditable few who delight in its existence. The occasional expression of such opinions as the Gazette propounds will gradually have an effect upon the most callous and the most timorous of our contemporaries. Thus, again, there are the juries which are privileged to try European offenders against the persons

and lives of natives. The culpable levity with which these juries treat such offences, the profligate obstinacy with which some jurymen hold out to save the guilty from condemnation can only be cured by the action of a healthy public opinion such as can be produced and rendered effective only by repeated remonstrances of the nature published above. It rests, however, with the judges of the land to teach, the great lesson that an all-protecting law watches with equal care, the life, liberty and person of the whitest and darkest of Her Majesty's subjects."[৭৩]

পাবলিক ইনসট্রাকশনের ডিরেক্টর ডঃ মোয়াট একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, ভারতবাসী জাতিবৈরের সূত্রপাত করেছে। হরিশচন্দ্র ডঃ মোয়াটের বক্তব্য খণ্ডন করে বলেছেন যে এ মনোভাবের জনক ইংরেজ ঃ

"The term antagonism of race was first employed about the state of relations between our countrymen and our European fellow-subjects not by the former but by the latter. It was first employed in formal and set language by those assembled the Town Hall about two years ago to oppose the enactment of a law proposed with a view, among other things, to bring European British subjects to the law of the country. It was then used and there used in a sense intentionally offensive to the feelings of the entire native public and degrading to their character and position. It was broadly stated, and without reserve or qualification, that the native of India was incapable of sitting judicially over the act, conduct and affairs of the European by reason of the 'antagonism of race'. Now this fact, namely, that this phrase was first employed by those who now charge us with having initiated hostilities, goes to prove that, so far as the feeling is concerned, the Europeans in India are principally responsible for whatever 'antagonism of race' has been evoked by subsequent events."[৭৪]

জাতিবৈর মনোভাবের জন্য ইংরেজরা শিক্ষিত বাঙালীকে দায়ী করে। তথ্য প্রমাণ সহযোগে এই অভিযোগ হরিশ অস্বীকার করেছেন। এই বিষয়ে শিক্ষিত বাঙালী এবং ইংরেজের মনোভাবের তুলনামূলক আলোচনা করে তিনি ইংরেজকেই অভিযুক্ত করেছেন ঃ

"All that by any perversity of constructive genius could be made to denote manifestations on the part of the 'educated natives' of an 'antagonism of race' are the speeches delivered at the Town Hall meeting in support of the non-exemption law and the writings in this journal Now, nine-tenths of the sentiments expressed in those speeches were positively, as they were purposely, complimentary to our opponents on the occasion. The burden of the argument used in those speeches was that the subjection of Englishmen to the jurisdiction of the Mofussil criminal courts would ensure what the unaided exertion of the natives would fail to achieve. The majority of the speakers dwelt upon this point with an earnestness and sincerity that now seem to us really misplaced. One spsech, indeed, was spoken on the occasion that adopted a stronger and, we hesitate not in saying, a higher tone. When Babu Rajendralal Mitter denounced the 'sweepings of Europe' he simply inflicted a merited chastisement on a class which the great British public and British Society have repudiated with no concealed scorn. It is no small fault in a Bengalee that he should refuse to recognise a countrymen of the Ellenboroughs and the Brights in a set of men afraid to answer to the law and proud of an outlaw's privileges. Yet, even the language, harsh as it hears, bore a sanse full of respect for the British character. The speaker plainly intimated that he could not reconcile it to his knowledge of that character—and all who personally know the speaker know that his knowledge on that head is not small—that claims so monstrously unjust as those advanced by the non-exemptionists should be preferred by genuine true hearted Britons. Never did a nation receive a higher compliment than the British in Badu Rajendralal Mitter's speech."[৭৫]

১৮৫৭ সালের শেষ দিকে আগ্রার ইংরেজ শাসক এক অদ্ভুত নির্দেশনামা জারী করে। সেই নির্দেশনামাটি নিম্নরূপ ঃ

"Whereas it has been ascertained by statements made by divers Shaheblogues, that Hindostanees, on meeting them

in the public thoroughfares, do not salute them, or stop their horses or conveyances in token of respect when such shaheblouges are passing by : and whereas such conduct is highly unbecoming and may be counted as impertinence on the part of the Hindustanees : Be it therefore notified, under order of the officer commanding the station, that every Hindustanee driving in a carriage, riding or walking within the limits of the cantonment, must salute every shaheblogue of rank and every Gorah whom he may meet on his way, and if riding or driving in a carriage must take to one side of the road so as to allow such Shaheb or Gorah to move on ; a non-compliance with the order rendering the offender liable to arrest and punishment. And let this Notification be proclaimed by beat of drum daily for an entire month and weekly for the three following months, and let a copy hereof be forwarded to the Magistrate of Agra, that its purport may be made known in the city of Agra."[১৬]

বলপূর্বক শ্রদ্ধা ও সম্মান আদায়ের এই ঘৃণ্য প্রচেষ্টা হরিশকে উত্তেজিত করে তুলেছিল। ভারতবাসীর প্রতি ইংরেজের অবজ্ঞার আরো নানাবিধ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে শাসকের এই মনোভাবই শাসিতকে বিদ্রোহের প্রেরণা দেয় ঃ

We beg our readers to believe that the foregoing is a genuine order passed by the British officer holding the office of a Magistrate under Government of India. It has been placarded all over the military cantonment, and we believe it has since then been adopted by the city authorities. The strictest obedience is enforced to it : and that not always by the aid of the police. Similar orders have been issued in other parts of the North Western Provinces.

"Intense meanness or wretched purility is not the offence which we condemn in the authors of this rescript. They come in not merely for a share of simple unalloyed contempt. Ample as that share is they must need excite and draw forth also the disgust of all right-minded men. They remind one of the class of sturdy mendicants who wander

in the streets of Indian cities and exact bounties from decent people by threatening to exhibit their filthy habits.

"If, as some of our English contemporaries pretend the rebellion has brought out some new phases of native character tn India, it has added not a little to our knowledge of the character of our British fellow-subjects. We had, for instance, hitherto believed that they were a haughty race, but never deficient in self-respect. We know that there was a class among Englishmen, as among other nations, who distitute of every claim to social consideration, sigh for that state of lawlessness in which alone their importance is recognized. We know the intense anxiety of the shop boys, sub-editors and section writers in India to be treated as men. We know their bitter hatred of those who refuse to address them in letters as Esquires. We know also that a better class of Englishman hold fast to the faith that the European as such is a superior being to the Indian as such. But we did not know that there existed in the classes which fill the higher grade of the civil and military services of the Government of India the consciousness that they were excluded from the benefits of all conventional rules of civility and politeness except such as could be enforced by 'fine or imprisonment.' We did not know that the feeling which mixed with spilt sherry made the parisian patriots of the revolution reel at the sight of respectability in any shape, could, under circumstances, actuate British Haves as well as Have-Nots.

"We are taught one thing more : We have often said that we do not believe a great part of the accounts given of atrocities committed in India during the mutinies. We will now believe it. Any land may produce rebels, but a land where man like authors of this order hold power can alone breed such rebels as executed Nana Shahib's commands."[৭৭]

হরিশ তাঁর 'Who Is To Blame' নামক প্রবন্ধটিতে নিপুণ নৈয়ায়িকের মত বিদগ্ধভঙ্গীতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উচ্চারণ করেছেন ঃ

ক] অনস্বীকার্য যে, ইংরেজের প্রতি ভারতবাসীর গোপন অন্তরে সঞ্চিত হয়েছে ক্ষোভ ও ঘৃণা। এর জন্য দায়ী কে?

খ] ভারতবর্ষে শাসক ও শাসিতের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ক্রমশঃ বিস্তৃতি ও গভীরতা লাভ করছে। এর জন্য দায়ী কে?

গ] ভারতের বর্তমান শাসকরা একদিন নর্মানদের ঘৃণা করত। আজ ভারতবর্ষে তারা নিজেরাই ঘৃণার পাত্র। এর জন্য দায়ী কে?

উপরি-উক্ত প্রবন্ধে পরিশেষে হরিশ বলেছেন:

"Ten times ten years have rolled by since the English first set foot on Indian soil, yet, alas: they are the objects of strong dislike among the people whom they govern. The English are Christians and live in the nineteenth century after Christs' birth. Who is to blame?"[৭৮]

১৮৫৮ সালে লিখিত একটি প্রবন্ধে হরিশ প্রশ্ন করেছেন: ভারতবর্ষের অধিবাসী কারা? এই প্রশ্নোচ্চারণের সঙ্গত কারণ ছিল। 'ওয়েস্ট মিনিস্টার রিভিউ' পত্রিকায় বলা হয়েছিল যে মিঃ ব্রাইটের মস্তিষ্ক ব্যতীত ভারতবাসীর অন্য কোন অস্তিত্ব নেই। সুতরাং ভারতবাসী যখন স্বাধীনতা, প্রগতি, অধিকার দাবি করে তখন তা মদোন্মত্তের মত মনে হয়। হরিশ বলেছেন:

"The class of writers who maintain that we have no civilization, on gratitude, loyalty, truth, fidelity, public opinion or national feeling, that our aristocracy is no safeguard to the state and that every native is a traitor at heart, are resolved to extinguish us by denying our very existence and to bring down annihilation upon those struggling vestiges of national life which are seen dotted over the vast length and breadth of the land. They would propagate that the Bengal ryot is a myth, the upcountry peasant a phantom of some hot brain, the Madras cultivator a non-entity, the Bombay purvoe the being of a dream, the Mahratta Poorabee an impostor without history, and the rigid Hindu a mesmerized of Egypt"[৭৯]

ভারতবর্ষের অধিবাসী কারা? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হরিশ পরিহাস-মিশ্রিত কণ্ঠে বলেছেন:

ক] যারা ভারতের জমি চাষ করে এবং ভারতের বৃটিশ সরকারের প্রাণরসের যোগান দেয়,

খ] পরাধীন জাতি হিসেবে যাদের ভাগ্য ও ভবিতব্য ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর ও কনট্রোলারদের হাতে নির্ভরশীল,

গ] আপনজনের মত যারা বিদেশীদের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করে দেয়,

ঘ] ভারতের যারা অবিচ্ছেদ্য উপাদান এবং অস্থি-মজ্জা,

ঙ] যাদের ভবিষ্যতের উপর সমগ্র পৃথিবী সোৎসুক দৃষ্টি রেখেছে,

চ] লর্ড ক্লাইভ থেকে লর্ড ক্যানিং পর্যন্ত কেউ-ই যাদের উপেক্ষা করতে পারেন নি।

এইভাবে ভারতবাসীর সংজ্ঞা নির্দেশ করে হরিশ বলেছেন যে ইংরেজরা পছন্দ করুক বা না করুক, ভারতবাসীর অস্তিত্ব আছে। ইংরেজকে রাজনৈতিক সততাসম্পন্ন হবার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছেন ঃ

"The magnanimity and loftiness of a nation consist not in race hauteur and ungenerous display of power,—but in a dignified communication with the less fortunate nation and a course of proper conciliation to induce the latter ro a better course of social life, morality and independence. Let Christian England learn political morality aud international law from Pagan Rome and we may boldly say that her glory will be heightened as she is farther advanced in civilization.[৮০]"

আইনের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণের জন্য ১৮৪৯ সালে বেথুন সাহেব চার আইনের এক খসড়া রচনা করেন ঃ

ক] "An Act for abolish exemption from the Jurisdiction of the East India Company's Criminal courts."

খ] "An Act declaring the law as to the privilege of her Majesty's European subjects,

গ] An Act for trial by jury,

ঘ] An Act for the protection of Judicial officers.

এই চার আইনের খসড়ার প্রথম তিনটি ক্যালকাটা গেজেটে (৩১. ১০. ১৮৪৯) ও শেষেরটি ১৮৪৯ সালের ২১শে নভেম্বর ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশিত হয়। এতে বর্ণ সচেতন শ্বেতাঙ্গ সমাজ অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। প্রস্তাবিত আইনকে কালাকানুন বা 'Black Act' নাম দিয়ে তারা আন্দোলন শুরু করে। ১৮৪৯ সালের ২৯শে ডিসেম্বর কলকাতার টাউন হলে কালাকানুন বিরোধী এক সভারও আয়োজন করা হয়।

শ্বেতাঙ্গ সমাজের অন্যায় দাবির বিরোধিতা ও খসড়া আইনের সমর্থনে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্যরা পাল্টা আন্দোলন শুরু করেন। রামগোপাল ঘোষ রচনা করেন 'A few Remarks on certain Draft Acts, commonly called Black Acts' নামক পুস্তিকা। ১৮৫৭ সালের

৯ই এপ্রিল এক জনসভায় কালাকানুন বিরোধী আন্দোলনের বিরোধিতা করে বক্তৃতা করেন রামগোপাল ঘোষ, কিশোরীচাঁদ মিত্র, দিগম্বর মিত্র, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখরা।

১৮৫৭ সালের ৫ই মার্চ হরিশচন্দ্র এক প্রবন্ধে বললেন যে আইনের ক্ষেত্রে এই বৈষম্যের উৎস সরকারী নীতি। হরিশ অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করে বললেন :

"When the administration of the criminal courts was in the hands of the Nizamut officers, when MahomedReza Khan was the Chief Justice of Bengal, it was, we admit, expedient that the few independent British subjects than residing in the interior should, in common with the far more numerous British-born servants of the East India Company, be subjected to the court established principally for restraining the excesses of the latter. But besides the regular penal jurisdiction of the Supreme Court, the British subjects, those in the service, as well as those not in the service of Company, were subject to the more summary jurisdiction of the local Government which could, at its pleasure, deport any of them from the country. This state of things lasted up to 1833. Up to that date, the legal condition of British subjects was, it must be admitted, far inferior to that of natives. How easy it would have been then to have placed the British-born upon the same footing with natives of the soil in respect of amenability to the local courts. The change would have been hailed as a boon by the former. The ministry in England arranged for this change. The Indian minister of the day announced this proposal formally to the House of Commons. The withdrawal of the power of the local Governments to deport British-born subjects at their pleasure—was effected by Parliament. For the completion of the change by making British-born subjects amenable to the local courts, instructions were sent to the local Government. The local Government disobeyed the ministry, and created the difficulty to which our correspondent refers. The exemption of the British-born from the jurisdiction (summary or arbitrary) of the mofussil authori-

ties is only of twentyfour years' standing, and cannot justly, we submit, be accounted a historical justification of the present state of the law."[৮১]

হরিশচন্দ্র বললেন যে খিস্টান অধিবাসীরা যদি দাবি করে কোন অ-খিস্টান তাদের বিচার করতে পারবে না, তাহলে সে দাবি অ-খ্রীস্টানদের তরফ থেকেও তো উঠতে পারে। ভারতবর্ষে অ-খিস্টানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সংখ্যাগরিষ্ঠের দাবি কেন মানা হবে না! তাছাড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক বিচার ব্যবস্থার ফলে অর্থনৈতিক বোঝাও বাড়বে ঃ

"It is a fact, which we advance with the utmost confidence upon our own responsibility, that the vass majority of the inhabitants of this country, the Hindoos, are less actuated by what has been called the antagonism of race than any other nation on the face of the earth. Hindu judges and juries would give a fairer trial to a British-born offender than any British judge and jury would give a Hindoo offender.'[৮২]

ভারতীয় বিচারকেরা ন্যায়-পরায়ণতার নীতিতে বিশ্বাসী বলে তাঁদের হাতে ইংরেজের অবিচারের ভয় নেই। এই বক্তব্যে হরিশের উদ্যত কটাক্ষ বিদ্ধ করেছে ইংরেজের অন্যায়াচরণকে। . .

ক্রিমিনাল প্রসিডিওর বিলকে কেন্দ্র করে শ্বেতাঙ্গ সমাজের আন্দোলনে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসকবর্গ কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তখন সুপ্রিম কোর্টের বিচারক ও সুপ্রিম লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য স্যার আর্থার বুলার প্রস্তাবিত আইনের সংশোধনের প্রস্তাব করেন। আর্থার বুলারের প্রস্তাব ঃ

ক] শ্বেতাঙ্গদের ফৌজদারী মামলার বিচার করবেন সেশন জজ,

খ] শ্বেতাঙ্গ জুরীরাই শ্বেতাঙ্গদের বিচার করবেন।

বুলারের এই সংশোধনের প্রস্তাবে প্রকারান্তরে শ্বেতাঙ্গ সমাজের মূল দাবিই মেনে নেওয়া হয়েছিল। হরিশ ১৮৫৭ সালের ২৬শে মার্চ লিখিত এক প্রবন্ধে বুলারের প্রস্তাবকে তীব্র সমালোচনায় বিদ্ধ করলেন। হরিশের মূল বক্তব্য এই রকম ঃ

ক] শুধু তত্ত্বগত দিক থেকে নয়, বাস্তব দিক থেকেও এই প্রস্তাব অসমীচীন ;

খ] যাদের স্বভাব আক্রমণাত্মক, এই প্রস্তাব কার্যকরী হলে তাদের নিয়ন্ত্রণের কোন পথই থাকবে না ;

গ] নিজের দেশে যারা আইনের ক্ষেত্রে সাম্যের প্রবক্তা, ভারতে তার বিরোধী কেন ?

ঘ] সেশন কোর্টও স্বেচ্ছাচারী শ্বেতাঙ্গদের নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে না ;

ঙ] শ্বেতাঙ্গ জুরীদের দ্বারা শ্বেতাঙ্গদের বিচার অন্যায় এবং অসঙ্গত ;

চ] শ্বেতাঙ্গরা ভারতীয় জনসংখ্যার একাংশ মাত্র, তাদের জন্য আইনের বিশেষ সুবিধা নীতিবিগর্হিত ;

ছ] আইন তো সকলের হাত থেকে দুর্বলকে রক্ষা করার উপায়।

তীব্র ভাষায় হরিশ বললেন যে আক্রমণাত্মক অন্যায়কারীর প্রতিবিধান না হলে আইনের আড়ম্বর অর্থহীন হয়ে পড়বে ঃ

"If those whose very nature is aggressive are to be left unchecked in a country like this, serious doubts arise as to the necessity of the complicated machinery of legislation and judicature which encumbers the state."[৮৩]

শ্বেতাঙ্গ জুরীদের দ্বারা শ্বেতাঙ্গদের বিচার হরিশের মতে অসঙ্গত এবং অবাস্তব। এতে আর্থিক বোঝা বাড়ে, সামাজিক বৈষম্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যা কোনদিক থেকেই দেশের পক্ষে সুস্বাস্থ্যের লক্ষ্মণ নয়। তাছাড়া এর ফলে প্রকাশ্যভাবেই অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

শ্বেতাঙ্গদের কালা—কানুন বিরোধী আন্দোলন এবং ১৮৫৭ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারির সভা কিভাবে তীব্র জাতিবৈর সৃষ্টি করেছে তার উদাহরণ দিয়ে হরিশ বললেন ঃ

"Accordingly on the fourteenth day of February they held a meeting in which language not particularly guarded was used towards the natives. Hence dates the rise of that bad feeling between Young Bengal and the placeless European which at last merged into savage hostility towards each other. In that meeting every thing native was denounced in terms with an earnestness that would be sublime were they not ridiculous. Native judges were accused of corruption, native palkee-bearers were known to be refractory, even native ayahs were suspected of poisoning European babies, and the 'antogonism of race' which authors in the upper shelves have declared as subsisting between nations was pompously brought forward to answer and perpetuate the political and civil disabilities of young Bengal."[৮৪]

শ্বেতাঙ্গরা দাবি করেছিল যে সুদূর অতীত থেকেই মফস্বল আদালতে বিচারিত না হওয়ার অধিকার তারা লাভ করে আসছে। হরিশের মতে এ দাবি অলীক। স্বার্থসাধনের জন্য তারা ইতিহাস-বিকৃতির পথ বেছে নিয়েছে। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সূচনাকালের নীতি ও আচরণের কথা তারা স্বেচ্ছায় বিস্মৃত হয়েছে।

হরিশ বললেন যে ঃ

"They have forgotten that when the East India Company was more purely an Asiatic power than it is now, it manifested an Asiatic contempt for those rights which are now so fluently discanted upon. They forget that with this Asiatic contempt of theoretical rights the East India Company's Government joined a more then European energy in the enforcement of its policy and its powers. Did the British-born residents in India remember these, they would not have talked at least of the inalienability of their rights."[৮৫]

ইংরেজরা মফঃস্বলের আদালতে বিচারিত না হবার পক্ষে আরো দুটি মিথ্যে যুক্তি হাজির করার চেষ্টা করেছে। তারা বলছে ঃ

ক] পল্লী অঞ্চলে পূর্বের তুলনায় বৃটিশ অধিবাসীর সংখ্যা বেড়েছে,

খ] পল্লী অঞ্চলে পরিমাণের দিক থেকে বৃটিশ পুঁজিও বেড়েছে।

হরিশের মতে এই যুক্তিগুলি সঠিক নয়। বৃটিশ অধিবাসীর সংখ্যা কলকাতাতেই বেশী। পল্লী অঞ্চলে মুষ্টিমেয় যে ইংরেজ বসবাস করে তারা অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির। হরিশ জনৈক জেলাশাসকের বিবৃতি বিশ্লেষণ করে সেই উচ্ছৃঙ্খলতার বর্ণবন্ত পরিচয় দিয়েছেন। মফঃস্বল আদালতে বিচার না থাকার জন্য একজন হত্যাপরাধী শ্বেতাঙ্গ নির্বিবাদে বহাল তবিয়তে থাকতে পারে। গ্রামের গরীব মানুষের সাধ্য নেই যে প্রভূত অর্থব্যয় করে সুদূরস্থিত সুপ্রিমকোর্টে মামলা দায়ের করে। তার উপর, সুপ্রিমকোর্টের শ্বেতাঙ্গ বিচারকের কাছেও সুবিচারের নিশ্চয়তা নেই।

জেলা শাসকের বিবরণ উল্লেখ করার পর হরিশ প্রশ্ন করলেন ঃ

"If then both were placed on the same legal position, under the same advantages of forensic attack and defence would not the Anglo-Saxon still maintain his superiority of advantages? If again, the Anglo-Saxon has in the chief ministers of the law men symphathising with him in all but his aggressive violence, how infinitely is that superiority heightened? To an unprejudiced mind, it would seem partiality enough to place the Anglo-Saxon in this position."[৮৬]

'কালা কানুন' আন্দোলনের অনতিকাল পরেই সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। কালা কানুন বিরোধী ইংরেজ সমাজ তার পুরো সুযোগ গ্রহণ করে। বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে দেশীয়দের বিরুদ্ধে কুৎসার বন্যা ডাকে। বিদ্রোহী সিপাহী তথা সমগ্র দেশীয় জনগণের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থের জন্য শ্বেতাঙ্গ সমাজ মরীয়া

হয়ে ওঠে। প্রথমে কিছুটা অনীহা প্রকাশ করলেও পরে বৃটিশ সরকার শ্বেতাঙ্গদের দাবির কাছে নতি স্বীকার করে। কিন্তু নিপীড়নের মাত্রা বেশী না হওয়ায় শ্বেতাঙ্গরা সন্তুষ্ট হতে পারে নি। তারা তাদের দাবি পূরণের জন্য ইণ্ডিয়ান রিফর্ম লীগ গঠন করে। বিদ্রোহের পরে, ১৮৫৮ সাল থেকে শ্বেতাঙ্গ সমাজ আবার ভারতবাসীর বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধাভিযানে নেমে পড়ে. এই যুদ্ধকে হরিশচন্দ্র পরিহাস করে 'ধর্মযুদ্ধ' বলেছেন ঃ

"Be that as it may, they are at the present moment running amuck of everything native and have entered into a regular crusade against the Hindu race."[৮৭]

হরিশচন্দ্র সমকালীন অন্যান্য মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর মত চাকুরির ক্ষেত্রে সমমর্যদা দাবি করেছেন। 'Employment of Natives' নামক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে ভারতবর্ষে বৃটিশ সরকার রাস্তা তৈরি করেছ, বিদ্যালয় তৈরি করেছে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে, রেলপথ নির্মাণ করেছে—কিন্তু ভারতবাসীর জীবিকার পথ সুগম করেনি। একে তো পরাধীনতার জ্বালায় দেশবাশী জর্জরিত, তার উপর জীবিকার ক্ষেত্রে বৈষম্য তার অসন্তোষকে বর্ধিত করতে সাহায্য করেছে। ঃ

"It is vain to open roads, establish schools, dispense medicines, distribute justice. and import wealth in abundance, if feelings and sympathies of the most powerful operation are wounded by a cold and systematic neglect. It is time that justice should at last be done to our countrymen in this respect, and they be allowed a fair share in the distribution of the 'loaves and fishes' of their own country. Disappointments, resulting from the loss of political independence have kept us on the background, while other nations have risen in the scale of civilization. The sorest of them should now be removed."[৮৮]

প্রশাসনিক ও গুরুত্বপূর্ণ পদে ভারতবাসীর নিয়োগ সম্বন্ধে অনীহা থাকা উচিত নয়। বহু শ্বেতাঙ্গ বলে থাকেন যে এই সব পদের জন্য ভারতবাসী উপযুক্ত নয়। তাদের শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতার অভাব আছে। হরিশের মতে এসব মিথ্যে অজুহাত মাত্র। ভারতবাসীর যোগ্যতা সম্পর্কে বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, উদারচেতা ইংরেজ কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ করেন। সদর কোর্টের বিচারক ও ভারতের আইন পরিষদের সদস্য মিঃ মিলসের বক্তব্য উদ্ধৃত করে হরিশ ভারতবাসীর যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন। মিঃ মিলস তাঁর অভিজ্ঞতা থেকেই বলেছিলেন যে ভারতীয় বিচারক এবং পুলিশ অফিসারের মানোন্নতি ঘটেছে—এবং ক্রমশঃ তারা দায়িত্ব পালনে আরো উপযুক্ত হচ্ছে।

"That we are entitled to a larger share in the adminis-tration of the country is borne out by the testimony of persons of vast local experience and knowledge. We will select, for example, the last competent witness who has spoken on the subject. Mr. Mills who was of the Bengal Civil Service, our readers will admit, is an authority in such a case. He was a judge of the Sudder Court and latterly a member of the Legislative Council of India for Bengal. His knowledge of Indian affairs must be admitted to be great, and his opinions ought, we think, to be considered, on most questions of practical import, decisive. His evidence before the Colonization Committee has elicited facts which after the Rebellion naturally carry all the greater weight with them. 'The character of the native Judges and Police Officers :' he says : 'is very much improved of late years, they are well qualified to fill high offices of the Government of the country and to sit as members of the Legislative Council."[৮৯]

শুধু মিঃ মিলস নন, অন্যান্য আরো অনেকেও অনুরূপ বক্তব্য উত্থাপন করেছেন। বেতন কমিশনারের সাম্প্রতিক রিপোর্টেও অনুরূপ কথা বলা হয়েছে। বৃটিশ সরকার ভারতীয়দের উপর আস্থা স্থাপন করতে পারলে তাদের দ্বারা বহু সুফল লাভ করা যাবে ঃ

"Mr, Mills is not the only person who has thus testified to the intelligence and improved character as of our countrymen public servants. There are others of equal authority who have done the same. The Salary Commissioner in his recent report says that if the Government wishes to have better service from the natives it should repose in them a larger share of confidence. What reasonable objection there exists after these strong recommendations to throw open the service to the natives we are really at a loss to conceive."[৯০]

হরিশের মতে প্রশাসনিক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে ভারতীয়দের নিয়োগ করার ফলে বৃটিশ সরকারের অর্থনৈতিক সুবিধাও হবে। হরিশ সুনির্দিষ্টভাবেই বলেছেন যে, কালেক্টর, অ্যাকাউণ্টেণ্ট ইত্যাদি পদে ভারতীয়দের নিয়োগ করা হলে বর্তমান ব্যয়ের শতকরা পঁচিশ ভাগ হ্রাস পাবে। বেতন কমিশনারের রিপোর্টেও এ বক্তব্য সমর্থিত হয়।

হরিশ বললেন ঃ

"To augment the expenditure of the state under the head to the extent of two lacks of rupees per annum is considered a burden to the finances, while lacks and thousands are spent for purpose of no real benefit to the state. We request, therefore, the present Lieutenant-Governor of Bengal, whose opinions on the subject are well known, to take in hand this question of justice to the most deserving class of his subordinates, nor let it drop till he sees full redress done."[৯১]

উপরের বক্তব্যে দেখা যাচ্ছে যেন-তেন-প্রকারেণ সরকারী চাকুরিতে ভারতবাসীর নিয়োগ হলেই হরিশ সন্তুষ্ট হন না। তিনি চান যোগ্যতা অনুসারে ভারতীয়কে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হোক এবং সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করা হোক। সহকারী দেশীয় বিচারকের প্রশ্নটি তিনি সঙ্গত কারণেই উত্থাপন করেছেন। তাঁদের পারিশ্রমিক অত্যন্ত অল্প, সেই তুলনায় সাধারণ করণিকরাও বেশী পারিশ্রমিক লাভ করে। ১৮৫৩ সালে তাঁদের বেতনবৃদ্ধির প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু বর্তমানেও তা কার্যকরী হয় নি। কেউ কেউ বলেছেন যে এই বেতনবৃদ্ধির ফলে বাৎসরিক যে দুই লক্ষাধিক টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হবে তা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। স্বার্থান্বেষীসুলভ এই বক্তব্য হরিশ গ্রহণ করতে পারেন নি। হরিশ বলেছেন যে সরকারী অর্থের অপব্যয়ের দৃষ্টান্ত তো কম নয়। সমগ্র দেশই তো তীব্র সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে এই অপব্যয়ের ফলে। সুতরাং দেশীয় বিচারকের বেতনবৃদ্ধির প্রশ্নে সরকারের দ্বিধা থাকা উচিত নয়।

বিচারবিভাগীয় পদে ভারতীয়দের নিয়োগ করার ব্যাপারেও হরিশ সোচ্চার হয়েছিলেন। এখানে অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রথমাবস্থায়—

"বিচার বিভাগীয় পদে ভারতীয়দের নিয়োগ করা হবে শুনে সেকালে এদেশীয়দের সকলে খুশী হতে পারেননি। কারণ, ভারতীয় বিচারকরা দুর্নীতি-পরায়ণ হবেন এবং তাঁদের কাছ থেকে সুবিচার পাওয়া দুর্লভ হবে এমন একটা আশংকা অনেকের মধ্যেই দেখা দিয়েছিল।"[৯২]

অবশ্য স্বাধিকার চেতনা বিকশিত হবার ফলে ধীরে ধীরে এ মনোভাব কেটে যায়। শিক্ষিত বাঙালী দুর্নীতির উৎস খুঁজে পায় ইংরেজ বিচারকের মধ্যেই। 'সমাচার দর্পণে' লেখা হয় ঃ

"ইংলণ্ডদেশীয় জজেরাও উৎকোচ বিষচক্রের বহির্ভূত ছিলেন না।"[৯৩]

'সংবাদ ভাস্কর' লিখেছিলেন ঃ

"বিচারস্থলে যদি উৎকোচসম্বন্ধ প্রবল থাকে তবে ঐ সম্বন্ধ সুবিচারের

প্রতিবন্ধক। আমাদের গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে বিলক্ষণ জানেন, তথাপি বিচারস্থলে উৎকোচসম্বন্ধ রাখিয়াছেন।"[১৪]

হাইকোর্টে দেশীয় বিচারক নিয়োগ না করার পক্ষে শ্বেতাঙ্গ সমাজ যেসব যুক্তি উত্থাপন করে সেগুলি হল ঃ

ক] বিচার পরিচালনার বুদ্ধি ভারতবাসীর নেই,

খ] সুবিচারের ক্ষেত্রে দেশীয়দের উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না,

গ] দেশীয় বিচরেকের উপর জনমতের ভরসা নেই,

ঘ] বিচারক হিসেবে দেশীয়দের নিয়োগ রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করবে।

হরিশ বলেছেন যে বৃটিশ সরকার এইসব যুক্তির দ্বারা সম্ভবত প্রভাবিত হতে পারেন, কিন্তু তা যদি হন তাহলে তাঁরা ন্যায়সঙ্গত পথে যেতে পারবেন না ঃ

"The Government of the day will, no doubt, be considerably influenced by the opinions of those high authorities, but they will nevertheless make large allowances for bias and interest from the value of those opinions. It can scarcely be supposed that any statesman of the present day will surrender his judgment to professional gentlemen who seriously believe that there is science in the English practice of the law, or to lay personages who would sacrifice the reform of the Indian judiciary to the vested rights of Zilla judges. The question will be argued and settled on considerations more generally appreciable."[১৫]

দেশীয় বিচারক নিয়োগ করার ব্যাপারে শ্বেতাঙ্গ সমাজের এইসব যুক্তি, হরিশের মতে, কুযুক্তি। হরিশ পাল্টা যুক্তি উত্থাপন করেছেন ঃ

ক] সদরকোর্টে দেশীয় বিচারকদের বিচার যথেষ্ট বিজ্ঞতাপ্রসূত,

খ] আইনবিষয়ক শিক্ষার যে সুযোগ শ্বেতাঙ্গদের আছে সে সুযোগ দেশীয়দের নেই। সে সুযোগ থাকলে তাদের যোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হত।

"To belive that no native is intellectually competent to sit in the High Court, you must believe that no native delivers an intelligible judgment or draws out an intelligible statement of reason of appeal; that in a profession open to trained European lawyers, such as pleading in the Sudder Court, natives have continued to take the lead without any share of intellectual capacity;"[১৬]

এবং—"We admit the advantages of the superiority of general education possessed by English lawyers and the gentlemen of the Civil Service. But is not the superiority

more than balanced by the special knowledge which a native can always bring to bear upon the business of judicature in the first instance or in appellate sittings ?"[৯৭]

গ] বিচারবিভাগীয় পদগুলির ব্যবস্থাপনার মধ্যেই দুর্নীতির বীজ আছে। ইংরেজ বিচারকরাও কি দুর্নীতিপরায়ণ নন ?

ঘ] শ্বেতাঙ্গদের তৃতীয় যুক্তির প্রত্যুত্তরে হরিশ বলেছেন যে ঃ এরও কোন সারগর্ভতা নেই। জনমত বলতে যদি ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতকে বোঝায় তাহলে শ্বেতাঙ্গদের এ যুক্তি কোন যুক্তিই নয়। শ্বেতাঙ্গদের যুক্তিগুলি খণ্ডন করে শেষে হরিশ বললেন ঃ

"Lastly, it should not be forgotten that the systematic official degradation in which natives are held has exercised a no very beneficial influence on the tone either of native public opinion or of native official opinion, and it is only surprising that a service so ill-treated as the uncovenanted judicial service is, should not have been further demoralised than it is—should yet maintain the high character it does inspite of such discouragement. Surely, if ever the judicial maxim of allowing nobody to profit by his own wrong has been violated, it is in the case of the Indian Government which, after doing all it can to injure and lower the character of native officials, is allowed to plead that injured and lowered character as an argument to injure and lower it more and more."[৯৮]

পাঞ্জাবে সরকারী পরীক্ষায় দেশীয়দের অংশগ্রহণের সুযোগ না দেওয়াকেও তীব্র সমালোচনায় বিদ্ধ করেছেন হরিশচন্দ্র। ১৮৫৮ সালের জুন মাসে পাঞ্জাবে সরকারী কর্মে নিয়োগের ব্যাপারে একটি পরীক্ষা হয়। স্যার জন এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান যে দেশীয়রা এই পরীক্ষা দিতে পারবে না। তবে পরে তাদের সে সুযোগ দেওয়া হবে। হরিশ পরিহাস করে বলেছেন যে স্যার জন ভবিষ্যতের আশ্বাস দিয়েছেন বটে, কিন্তু ভারতবাসী সে সুদিনের মুখ কোনদিনও দেখবে না। ১৮৫৬ সালের ১৮ই জানুয়ারি ভারত সরকারের এক সিদ্ধান্তে বলা হয়েছিল যে ভারতবাসী ও শ্বেতাঙ্গ সমাজ উভয়েই পরীক্ষার ব্যাপারে সমানাধিকার লাভ করবে। স্যার জন সে সিদ্ধান্তকে গ্রাহ্য মনে করেন নি। হরিশের ভাষায় তিনি 'Fiery genius.'

মঙ্গল পাণ্ডের অপরাধে সমগ্র ভারতবাসী যেন শ্বেতাঙ্গ সমাজের কাছে অপরাধী। ভারতবাসীর উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থের জন্য তাই তারা মরীয়া। শ্বেতাঙ্গ সমাজের হিংস্র মনোভাব অনবদ্য হরিশ তুলে ধরেছেন ঃ

"Injustice so flagrant and wanton as is manifested by the notification, would hardly have been dreamt of at any other season than the present. But the times have undergone a change. Panday has revolted and his sins must be visited on the heads of the millions who claim with him a community of religion, or a community of birth."[৯৯]

সমকালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ভারতীয়দের নিয়োগের দাবি উঠেছিল। হরিশও সে দাবির সমর্থক ছিলেন। হরিশের মতে সিভিল সার্ভিস তার সূত্রপাতের লগ্ন থেকেই দুর্নীতিপূর্ণ। ঃ

"The Indian Civil Service has been from the date of its formation a corporation in itself. As close in its constitution as any guild of the middle ages, it has its own objects, peculiar training, peculiar maxims of actions, and even a peculiar code of morals. It is an institution, and it has a history as distinct as that of any other institution in the civilised world. It is a dynasty, and is the object of dynastic attachments and hatred. Its existence in this peculiar form is, however, identified with that of the great corporation whose offspring it is. Now, therefore, when the past career of that corporation has come to be reviewed in earnest, it is found that the career of the parent is the career of the child, that to criticise the conduct of the Company is to criticise the acts of the Indian Civil Service."[১০০]

হরিশের মতে সিভিল সার্ভিস নিয়মতান্ত্রিকতার শত্রু, স্বৈরতন্ত্রের উৎস। এই প্রতিষ্ঠান প্রথম থেকেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ব্যাপারে ভারতীয় জনগণের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে আসছে। সিভিল সার্ভিসই প্রথমাবধি ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে বাধা দিয়েছে, পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রচারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে, রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কুক্ষীগত ও কেন্দ্রীভূত করেছে নিজেদের হাতে ঃ

"Tried on this count the Indian Civil Service can not, we fear, expect a verdict of acquittal. From the first it has offered a passive but determined resistance to the progress of constitutionalism—the true form in which British political action manifests itself whereever it is allowed fairly to operate. From the first it has proclaimed

itself the governing agency of an Asiatic power, of an Oriental despotism. From the first it has denied the capacity of the people of India to participate in the political progress of rest of the British dominions. From the first it has opposed the introduction of 'English ideas' into the internal policy of the country. It has discountenanced English education, the spread of English language, and the adoption of the external forms of European civilization. It has discouraged special progress except in the direction of material prosperity. Lastly, it has monopolished political power, and exercised a sort of social tyranny intolerable alike to natives and Europeans. For these grave offences it deserves the penalty of extinction it has incurred. These offences are the effects of the system, and the system must therefore be broken up."[১০১]

১৮৫৭ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি লিখিত আর একটি প্রবন্ধেও হরিশ বলেছেন যে।"[১০২] ঃ

ক] সিভিল সার্ভিস ভারতীয় জনগণকে রক্ষা করে নি,

খ] শাসনতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বের পরিবর্তে স্থানিক অভিজাততন্ত্রের জন্ম দিয়েছে,

গ] ইউরোপীয় সভ্যতার দূত হিসেবেও কোন ভূমিকা পালন করে নি,

ঘ] দেশের শাসন সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায় নি,

ঙ] ভারতবাসীকে অন্তরঙ্গভাবে জানা ও চেনার ব্যাপারে কোন উৎসাহ দেখায় নি।

সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের নিয়োগের দাবি তুলেছেন হরিশ। এ ব্যাপারে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের স্মারকপত্রকে সমর্থন করে হরিশ বলেছেন যে সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতা ভারতীয়দের আছে। 'হরকরা' পত্রিকার বক্তব্যকে আক্রমণ করে তিনি লিখেছেন ঃ

"So much for the motives, now for the matter. The 'Hurkaru' treats the memorial as an argument for the recognition of the eligibility of natives to the convenanted Civil Service. Our contemporary needs to be told that this eligibility was affirmed a quarter of a century ago by the highest authority in the realm. The task of the memorial is the easier one of exposing the dodge by which the intentions of the Supreme Legislature have been set at naught by a

wily and selfish executive. That this task has been successfully executed is apparent from the fact that the defenders of the present system are in the course of the discussion thrown upon the merits of the previous questions—whether the higher offices of state in India should at all be opened to natives of the country,—question which, let us again remind our contemporary, has been settled. Such dodges, we admit, are not without precedent in British history. The mean shifts which were for a time resorted to by a section of English politicians to prevent the Catholics of Ireland from profitting by the Emancipation Act show to what trickery a party, baffled in fair political warfare, may be driven. The giants, however, who won Catholic Emancipation were not to be fettered by such bonds as their opponents could wind round them ; and Catholic Emancipation became a fact as well as a statute of Parliament. The British Indian Association has now a similar task before it. It can not, of course, command the influence which the leaders of the Catholic Association wielded ; but its opponents are proportionately weak in organization and influence."[১০৩]

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে হরিশ যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর কথা ভেবেছিলেন তার প্রমাণ নিম্ন প্রবন্ধগুলি :

ক] Mr. Bright's Last Indian Speach,

খ] Federalization,

গ] The Indian Debate,

ঘ] The Patriarchal System.

হরিশের মতে ভারতবর্ষে একটি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের ফলে বহু অসুবিধা ও সর্বনাশ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন :

ক] সমগ্র দেশ জুড়ে রাজনৈতিক স্থবিরতা সৃষ্টি হয়েছে,

খ] ভাবতবাসীর নানা বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করে সব প্রদেশে একই রকম নীতি নিয়ম আরোপ করার চেষ্টা হয়েছে,

গ] শাসন ও বিচারবিভাগের মধ্যে সীমারেখা টানা হয় নি,

ঘ] অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নৈরাজ্য এবং অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে।

মিঃ ব্রাইটের মত সমর্থন করে হরিশ বলেছেন যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ফলে ভারতের সম্যক শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে :

"In legislation, material progress, education, and every-

thing that promotes social welfare, the advantages of federalization as we have frequently had occasion to point out, are equally conspicuous. If the empire is to be remodlled, it must be remodelled on the principle of federalization."[১০৪]

শুধু যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো নয়, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে হরিশ ভারতীয় জনতার প্রতিনিধিত্বও দাবি করেছেন। ইংরেজের পক্ষে ভারতীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান অসম্ভব। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন ঃ

"Can a revolution in the Indian Government be authorised by parliament without consulting the wishes of the vast millions of men whose benefit it is proposed to be made ?"[১০৫]

নিজেই তার উত্তর দিয়েছেন ঃ

"The time is nearly come when all Indian questions must be solved by the Indian."[১০৬]

হরিশের মতে হাউস অফ কমন্সে কিছু হিন্দু ও কিছু মুসলমান সদস্য গ্রহণ করলেই ভারতীয়দের অধিকার সুরক্ষিত হবে না। হরিশ বলেছেন ঃ

"What we want is not the introduction of a small independent element in the existing Council, but an Indian Parliament."[১০৭]

টীকা

১। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের উক্তি। ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভৌমিকের 'নব্যবঙ্গে রাষ্ট্রচিন্তার ধারা' গ্রন্থে উদ্ধৃত. পৃঃ-২৬

২। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রসঙ্গে (১৮৫৭-১৮৫৯)। মার্কস ও এঙ্গেলস। প্রগতি প্রকাশন. মস্কো। পৃ. ১৫-১৬

৩। ঐ, ঐ, পৃঃ ৩২

৪। ঐ, ঐ, পৃঃ ২০

৫। স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা। নরহরি কবিরাজ। পৃঃ ৬৪

৬। ঐ, ঐ, পৃঃ ৯৬

৭। মোহনলাল মিত্র ও কানাইলাল দত্ত সম্পাদিত 'উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল' গ্রন্থে স্বপন বসুর প্রবন্ধ : 'উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার রাজনৈতিক চিন্তাধারা'। পৃঃ ৩৩৪

৮। রামমোহনের রাজনৈতিক ভাবনার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাবে নিম্ন গ্রন্থগুলিতেঃ

ক] History of Indian Social and Political Ideas Dr. B. B Majumdar.

খ] বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা। সৌরীন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

গ] নব্যবঙ্গে রাষ্ট্রচিন্তার ধারা। ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভৌমিক।

ঘ] জাগৃতি ও জাতীয়তা। যোগেশচন্দ্র বাগল।

ঙ] সঙ্কল্প ও সাধনা। ঐ

৯। Atulchandra Gupta সম্পাদিত 'Studies in Bengal Renaissance' গ্রন্থে Susobhan Sarkar-এর প্রবন্ধ 'Derozio and young Bengal', P-17

১০। Henry Derozio. Thomas Edwards, P-121

১১। History of Indian Social and Political Ideas P-54

১২। Henry Derozio. P-31

১৩। ঊনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল গ্রন্থে ডঃ মল্লার ঘোষের প্রবন্ধ পৃঃ ৪৭৮।

১৪। Henry Derozio. P-38

১৫। ঐ, P-41

১৬। H. P. 25.1.1868

১৭। History of Indian...P-53

১৮। Bengal Harkaru. 16.1.1843

১৯। History of Indian...P-53

২০। নব্যবঙ্গে রাষ্ট্রচিন্তার ধারা। পৃঃ ৮১

২১। History of Indian...P-53

২২। বাংলা সাময়িক পত্র (১ম)। পৃঃ ৩৯

২৩। যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পর্কিত পূর্ববর্তী গ্রন্থের ডঃ সুরেশ মৈত্রের প্রবন্ধঃ জ্ঞানান্বেষণ পৃঃ ৪৪৭। শ্রীমৈত্রের সম্পাদনায় এই পত্রিকার নির্বাচিত রচনা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

২৪। ঐ, পৃঃ ৪৪১

২৫। The Bengali Press (1818—1868) Smarajit Chakraborty. P-63

২৬। ঐ, ঐ, পৃ. 64

২৭। ঐ, ঐ, পৃঃ 65

২৮। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, পৃঃ ১৬৬

২৯। The Bengali Press, P-97

৩০। Mookerjee's Magazine, 1861 P-25

৩১। যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পর্কিত পূর্ববর্তী গ্রন্থে নলিনীকান্ত রায়ের প্রবন্ধ। পৃঃ ৩১৫

৩২। The Friend of India. 16.3.1843

৩৩। India Gazette পত্রিকার 1833 সালের 8 April ও 28 February সংখ্যা

৩৪। India Gazette, 20.3.1833

৩৫। History of Indian···P-76

৩৬। দ্বারকানাথ ঠাকুর। কিশোরীচাঁদ মিত্র। দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ অনূদিত। পৃঃ ৪৮

৩৭। ঐ, ঐ, পৃঃ ৫৩

৩৮। Autobiography. Rajnarayan Bose. P-117

৩৯। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮৩০ শক।

৪০। History of Indian···P-81

৪১। ঐ, P—82

৪২। দ্বারকানাথ ঠাকুর...পৃঃ ৬৬

৪৩। ঐ, পৃ, ১৪১—২

৪৪। India Gazette, 17.2.1830

৪৫। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা। যোগেশচন্দ্র বাগল। পৃঃ—১৩২

৪৬। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ৬০ তম বর্ষে যোগেশচন্দ্র বাগলের গৌড়ীয় সমাজ সম্বন্ধে তথ্যবহুল আলোচনা আছে।

৪৭। Mookerjee's Magazine, 1861, P-251

৪৮। ঐ, ঐ

৪৯। India Gazette, 17.2.1830

৫০। Calcutta Review, VI, P-163

৫১। ঐ, ঐ, P. 149

৫২। History of Indian…P-90

৫৩। বাংলা সংবাদপত্র ও বাংগালীর নবজাগরণ। ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৫১

৫৪। The Bengal Spectator. 25.4.1843

৫৫। History of Indian...P-84

৫৬। ঐ, P. 92

৫৭। Mookerjee's Magazine, June, 1861

৫৮। Selections from the writings of Hurrish Chunder Mookerji, Introduction, P—13

৫৯। ঐ, P—169

৬০। ঐ, P—122

৬১। ঐ, P—184

৬২। ঐ, P—252

৬৩। ঐ, P—281

৬৪। ঐ, P—300

৬৫। The Hindu patriot. 14.1.1858

৬৬। The Prince in India and to India. P-7

৬৭। Hindoo Patriot. 17.3.1879

৬৮। Selections from the...P-214

৬৯। ঐ, P—140

৭০। ঐ, P—144

৭১। ঐ, P—15

৭২। ঐ, P—299

৭৩। ঐ, P—300

৭৪। ঐ, P—309

৭৫। ঐ, P—310—11

৭৬। ঐ, P—295—6

৭৭। ঐ, P—296—7

৭৮। ঐ P—297—9

৭৯। Hindoo Patriot. 4.3.1858

৮০। ঐ, ঐ

৮১। ঐ, 5.3.1857

৮২। ঐ, ঐ,

৮৩। ঐ, 26,3.1857

৮৪। ঐ, 14.1.1858

৮৫। ঐ, 26 2.1857

৮৬। ঐ, 19.2.1857

৮৭। ঐ, 14.1.1858

৮৮। Selections from the…P—255-6

৮৯। ঐ, P—256

৯০। ঐ, ঐ

৯১। ঐ, P—257

৯২। বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালীর নবজাগরণ। পৃঃ ২৫৩

৯৩। সমাচার দর্পণ, ২।৩।১৮৩৩

৯৪। সংবাদ ভাস্কর, ৫।৭।১৮৪৯

৯৫। Selections from the…P,—259

৯৬। ঐ. P—259

৯৭। ঐ, P—260

৯৮। ঐ, I—261-2

৯৯। ঐ, P—264

১০০। ঐ, P—253

১০১। ঐ, P—254-5

১০২। ঐ, P—247-8

১০৩। ঐ, P—251

১০৪। ঐ, I—227

১০৫। ঐ, P—126

১০৬। ঐ, ঐ

১০৭। ঐ, I—215

চতুর্দশ অধ্যায়

হরিশচন্দ্র ও সমকালীন কয়েকজন

রামলোচন ঘোষ (১৭৯০—১৮৬৬)

ঢাকার নিকটস্থ এক গ্রামে ১৭৯০ সালে মনোমোহন ঘোষ ও লালমোহন ঘোষের পিতা রামলোচন জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজী শিক্ষা লাভের পর তিনি পাটনায় জজ কোর্টে সেরেস্তাদার হন। ১৮৪১ সালে সরকারকর্তৃক কৃষ্ণনগরের মুখ্য সদর আমীনের পদে নিযুক্ত হন। শিক্ষাবিস্তারে তাঁর উৎসাহ ছিল, ঢাকা ইংলিশ সেমিনারী ও কৃষ্ণনগর কলেজ স্থাপনে তাঁর প্রয়াস তারই নজির। মাতৃ-ভাষা চর্চার ক্ষেত্রেও তাঁর উৎসাহ ছিল। হিন্দু কলেজ পাঠশালার আদর্শে ঢাকা কলেজের অধীনে বাংলা পাঠশালা স্থাপনের প্রস্তাব করেন। বাঙালী ছেলেদের সিভিল সার্বিস পরীক্ষা দেবার জন্য বিলাতে প্রেরণের কথাও তাঁরই প্রথম মনে হয়। ১৮৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা'র তিনি প্রতিষ্ঠাতা সভ্য ছিলেন। এই সভায় রাজনৈতিক আলোচনার সূত্রপাতও তিনি করেন। সরকার কর্তৃক খাজনা-মুক্ত জমির পুনর্গ্রহণের ব্যাপারে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার অন্যান্য সদস্যরা যখন সরকারী নীতির সমালোচনা করেন তখন রামলোচন তাকে সমর্থন করেন—"His main contention was that the rich Zemindars dependent to a large extent on the returns from their rent free lands, spent most of their time on the gratification of their desires." ১৮৬৬ সালের মার্চে রামলোচন মৃত্যুমুখে পতিত হন।

দ্র.

Freedom movement of Bengal. P—32—34

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা। যোগেশচন্দ্র বাগল। পৃ—২৬—৩৬

সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র (২য় খণ্ড)। বিনয় ঘোষ

The Government Gazettee of 23 January 1817 and of 3 September 1818.

সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম ও ২য় খণ্ড)।

Reort of the General committee of public Instruction of the presidency of Fort william in Bengal, for 1885, P. 34

Three speeches made by pratt, Kalidas Mitra, Ramlochan Ghosh at a meeting held at Krishnagr college, collected and edited by srinath De, P— 26, শ্রীরামপুর ১৮৫৬

মতিলাল শীল (১৭৯২—১৮৫৪)

চৈতন্যচরণ শীলের পুত্র মতিলাল ১৭৯২ সালে কলকাতার কলুটোলায় জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাভাবে তিনি বেশীদূর লেখাপড়া শিখতে পারেন নি। মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে ফোর্ট উইলিয়ামে কেরাণী পদে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং পরে ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। দানবীর হিসাবে খ্যাত মতিলাল 'শীলস্ ফ্রী কলেজ' নির্মাণ করেন এবং কলিকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য বিস্তীর্ণ স্থান দান করেন। প্রগতিপন্থী মতিলাল বিদ্যাসাগরের সংস্কারমূলক প্রচেষ্টাকে সাহায্য করেছিলেন। সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁর সমর্থন ছিল। ১৮৫৪ সালের ২৯শে মে তাঁর মৃত্যু হয়।

দ্র.

দানবীর মতিলাল শীল। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

The Modern History of Indian chiefs, Rajas, Zemindars (II) L. N. Ghosh.

সংবাদপত্রে সেকালের কথা। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কালীনাথ রায়চৌধুরী (১৭৯৭—১৮৪০)

১৭৯৭ সালে টাকীর জমিদার পরিবারে কালীনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজী, সংস্কৃত, পারসী ও বাংলা ভাষায় কালীনাথের যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। রামমোহনের প্রগতিশীল চিন্তার দ্বারা কালীনাথ আকৃষ্ট হন এবং নানাবিধ সংস্কার কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে দেশবাসীর মনের অজ্ঞতা দূরীভূত করার উদ্যোগ তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তবে শুধু ইংরেজী শিক্ষা নয়, তিনি অনুভব করেছিলেন যে দেশবাসীর মানসিক, নৈতিক এবং অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণের প্রয়োজন আছে। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন। 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা'র প্রতিষ্ঠাতা সভ্য ছিলেন কালীনাথ। ১৮৪০ সালের ১২ই ডিসেম্বর তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন।

দ্র.

সংবাদপত্রে সেকালের কথা। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গীয় সমাজ। সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী

Life and letters of Raja Rammohun Ray. S. D. collet.

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (১৭৯৯—১৮৫৯)

১৭৯৯ সালে শ্রীহট্টের পঞ্চগ্রামে গৌরীশংকরের জন্ম হয়। কলকাতায় এসে তিনি রামমোহন এবং ইয়ং বেঙ্গলের সংস্পর্শে আসেন। সতীদাহ প্রথা লোপের পক্ষে তিনি রামমোহনের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার এবং বিধবা বিবাহ আন্দোলনে তাঁর উৎসাহ ছিল। 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা'র তিনি

অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। মূলতঃ তিনি ছিলেন সাংবাদিক। 'জ্ঞানান্বেষণ' 'সংবাদ ভাস্কর' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। তাঁর মধ্যে নানা বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটেছিল। প্রগতিশীল আন্দোলনের সমর্থক হলেও পরে তিনি ধর্ম সভাকেও সমর্থন করেন। ব্রিটিশ প্রশাসন ও পুলিশ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদ করেন। ১৮৫৯ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।

দ্র.

বাংলা সাময়িক সাহিত্য / কেদারনাথ মজুমদার।

গৌরীশংকর তর্কবাগীশ (সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ৮ নং)। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৪—১৮৫৫)

হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের ছাত্র। আপন উদ্যোগে ইংরেজী ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। জীবিকার সূত্রে নানা কর্মস্থলে ঘুরে প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। ১৮৩৮ সালে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁরই নেতৃত্বে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত হয়। তিনি 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' পত্রিকার অন্যতম প্রধান লেখক ছিলেন। 'কুইল' নামক পত্রিকাটিও তিনি সম্পাদনা করেন। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থার সমালোচক ছিলেন তারাচাঁদ। ভারতীয়দের জন্য চাকুরীর ক্ষেত্রে উচ্চতর পদ দাবি করেছিলেন তিনি। শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারের দিকে তাঁর উৎসাহ ছিল। সামাজিক সংস্কার এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর মতামত ছিল প্রগতিশীল। মিশনারীদের ধর্মান্তরীকরণে প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি।

দ্র.

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ / শিবনাথ শাস্ত্রী

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা / যোগেশচন্দ্র বাগল

History of Political Thought. B. B. Majumder

A Biographical sketch of David Hare. Peary Chand Mitra.

জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮০৮—১৮৮৮)

১৮০৮ সালে জগন্মোহনের পুত্র জয়কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। উদার, স্বাধীনচেতা প্রগতিপন্থী জমিদার ছিলেন। শিক্ষাবিস্তারে তাঁর অকৃপণ বদান্যতা ছিল। উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার ও হাইস্কুল—যা পরে কলেজে পরিণত হয়—তাদের জনক জয়কৃষ্ণ। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনেরও তিনি সক্রিয় সমর্থক। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ১৮৭৮ সালে সরকারের স্বাধীন বাণিজ্য নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। ১৮৮৫ সালে দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গেও যোগ ছিল। ১৮৮৬ সালে দাদাভাই নওরোজীর সভাপতি নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা ছিল। ১৮৮৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

কালীকৃষ্ণ দেব (১৮০৮—১৮৭৪)

কলকাতার শোভাবাজার মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পৌত্র, রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের মধ্যম পুত্র কালীকৃষ্ণ দেব ১৮০৮ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা ও সংস্কৃত ছাড়াও ইংরেজী, ফরাসী এবং উর্দু ভাষাতে কালীকৃষ্ণ নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন। গ্রেট ব্রিটেন এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের রোয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির তিনি একজন যোগাযোগকারী সদস্য ছিলেন। ১৮০৩ পালে উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক তাঁকে রাজাবাহাদুর উপাধি দেন। কালীকৃষ্ণ রক্ষণশীল দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে সরকারের কাছে তিনি আবেদন করেন। রাধাকান্ত দেবের মৃত্যুর পর কালীকৃষ্ণই রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তবে রক্ষণশীল দলের নেতা হলেও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারেও কালীকৃষ্ণ উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন। 'ভূম্যধিকারী সভা'র সদস্য এবং 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে'র সহ সভাপতি হিসাবে ব্রিটিশ সরকারের জমি এবং শাসন সংক্রান্ত নীতিবিরোধী আন্দোলনে যোগদান করেন। বিচারের ক্ষেত্রে বৈষম্যেরও তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন। ১৮৭৪ সালের ১১ই এপ্রিল কালীকৃষ্ণের মৃত্যু হয়।

কাশীপ্রসাদ ঘোষ (১৮০৯—১৮৭৩)

জমিদার শিবপ্রসাদ ঘোষের পুত্র কাশীপ্রসাদ ১৮০৯ সালের ৫ই আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজের খ্যাতনামা ছাত্র। ইংরেজী ভাষায় অসাধারণ দক্ষতা। তাঁর 'Shair' ও 'The Boatmansong' তাঁকে কবিখ্যাতি দান করে। বুদ্ধিদীপ্ত মনীষার জন্যই তাঁকে কলকাতার অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ও জাস্টিস অব দি পীস পদ দেওয়া হয়। রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করলেও ভূম্যধিকারী সভার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। 'হিন্দু ইনটেলিজেন্সার' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। ১৮৪৬—১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এই পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৮৭৩ সালের ১১ই নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

দ্র.

The Indian press on Raja Kali krishna Bahadur L. N. Ghosh

রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর (ভারতবর্ষ চৈত্র, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ)।
মন্মথনাথ ঘোষ,

Freedom Movement in Bengal

বিশ্বকোষ (৪র্থ খণ্ড)। নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত।

মুক্তির সন্ধানে ভারত। যোগেশচন্দ্র বাগল।

The Government Gazette, 14th Feb, 1828

Dictionary of Indian Biography. C. E. Buckland

সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম)।

রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০—১৮৫৮)

নবকিশোর মল্লিকের পুত্র রসিককৃষ্ণ ১৮১০ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা হিন্দু কলেজে। ডিরোজিওর শিষ্য, ইয়ং বেঙ্গলের একজন। কিছুদিন হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা, ১৮৩৭ সালে ডেপুটি কালেক্টর। 'পার্থেনন', 'জ্ঞানান্বেষণের সঙ্গে যুক্ত। সামাজিক সংস্কারে উদ্যোগী। ইংরেজী শিক্ষা-বিস্তার ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার প্রবক্তা। সরকারের আইন ও বিচার বিভাগের সমালোচনা করেন বিভিন্ন সময়ে। সরকারী কর্মে ভারতীয়দের নিযুক্তির দাবি তোলেন। কৃষক স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়াস ছিল, তিনি মনে করতেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ১৮৫৮ সালের ৮ই জানুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।

শিবচন্দ্র দেব (১৮১১—১৮৯০)

১৮১১ সালে হুগলী জেলার কোন্নগরে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজের ছাত্র হিসেবে ডিরোজিওর সান্নিধ্য লাভ করেন। ১৮৪৩ সালে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। মেদিনীপুর ও কোন্নগরের ব্রাহ্মসমাজ তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮০ থেকে ১৮৮৪ পর্যন্ত তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ছিলেন। বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁর নিগূঢ় সংযোগ ছিল। দেশে শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করেন তিনি। ১৮৯০ সালের ১২ই নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

তারকনাথ তর্কবাচস্পতি (১৮১২—১৮৮৫)

১৮১২ সালের নভেম্বর মাসে বর্ধমান জেলার কালনার এক সংস্কৃত পণ্ডিতের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র ছিলেন তিনি। বিদ্যাসাগরের আহ্বানে ১৮৪৪ সালে সংস্কৃত কলেজে তিনি যোগদান করেন এবং একাদিক্রমে ১৩ বৎসর সেই কলেজে অধ্যাপনা করেন। মনের দিক থেকে তিনি রক্ষণশীল ছিলেন না। স্ত্রী শিক্ষা সমর্থন করতেন বলেই বেথুন স্কুলে আপন কন্যাকে ভর্তি করিয়ে দেন। বিধবা বিবাহ আন্দোলনও তাঁর অন্তরের সমর্থন লাভ করে। সংস্কৃত ভাষায় বহু গ্রন্থাদি রচনা করেন। ১৮৮৫ সালের জুন মাসে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দ্র.

মুক্তির সন্ধানে ভারত / যোগেশ চন্দ্র বাগল।

The calcutta Gazettee. 3Jan. 1835

ভারতকোষ (৫ম)

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ। শিবনাথ শাস্ত্রী

সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র (১ খণ্ড)। বিনয় ঘোষ।

Freedom Movement in Bengal. Edited by Nirmal Sinha

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩—১৮৮৫)

১৮১৩ সালের ২৪শে মে ইয়ং বেঙ্গলের মধ্যমণি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জীবনকৃষ্ণ ছিলেন একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণ। ১৮২৩ সালে হেয়ার স্কুলে তিনি ভর্তি হন এবং ১৮২৪ সালে 'স্কুল সোসাইটির' বৃত্তিভোগী ছাত্র হিসেবে তিনি হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। ছাত্র হিসাবে তিনি হিন্দু কলেজে অত্যন্ত কৃতিত্বের পরিচয় দেন। শিক্ষা সমাপ্ত করার পর কৃষ্ণমোহন নানা স্কুল কলেজে শিক্ষকতা করেন। ১৮৩২ সালে ১৭ই অক্টোবর কৃষ্ণমোহন আলেকজাণ্ডার ডাফ সাহেবের কাছে খৃীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। এবং ইংল্যাণ্ডের পাদ্রীপদ লাভ করেন। ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ ছাত্র না হলেও ডিরোজিওর ভাবধারা তাঁকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। 'একাডেমিক এসোসিয়েশনের' তিনি একজন সক্রিয় এবং উৎসাহী সদস্য ছিলেন। ইয়ং বেঙ্গলের মুখপত্র 'দি এনকোয়ারার' তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। কৃষ্ণমোহন দেশবাসীর মানসিক জাগরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে সংস্কারাচ্ছন্ন দেশে যুক্তিবাদী চিন্তার বিস্তার হওয়া প্রয়োজন। বৃত্তি-মূলক শিক্ষার উপরেও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সংস্কৃত এবং বাংলায় সুপণ্ডিত কৃষ্ণমোহন দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির কথা চিন্তা করতেন। সমকালীন শিক্ষার বাহন সম্পর্কে শিক্ষাকমিটির সদস্যদের সঙ্গে তাঁর বাদানুবাদের বিবরণ থেকে জানা যায়, কৃষ্ণমোহনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে বাংলাই ক্রমে শিক্ষার বাহন হবে। কৃষ্ণমোহন বৈষম্য এবং অসাম্যের প্রতিবাদ করেছেন। ব্রিটিশের জাতিগর্ব এবং জাতিবৈর মনোভাবকে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা করেছেন। রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন কৃষ্ণমোহন মুদ্রাযন্ত্রের আইনের প্রতিবাদ করেছিলেন, তিনি ভারতসভার সভাপতি হয়েছিলেন এবং কলকাতায় পৌরসভার নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হলে তার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৮৮৫ সালের ১১ই মে কৃষ্ণমোহন মৃত্যুবরণ করেন।

দ্র.

Dictionary of Indian Biography. C. E. Buckland

বিদ্যাসাগর / চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, ৫৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা)। যোগেশচন্দ্র বাগল।

A Biographical sketch of Rev K. M. Banerjea. R. Ghosh

আদর্শ কৃষ্ণমোহন / দুর্গাদাস লাহিড়ী

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় / সাহিত্য সাধক চরিত মালা, ৭২ নং

রাধানাথ শিকদার (১৮১৩—১৮৭০)

তীতুরাম শিকদারের পুত্র রাধানাথ ১৮১৩ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজের ছাত্র হিসাবে তিনি ডিরোজিওর সংস্পর্শে আসেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি টাইট্‌লার সাহেবের কাছে নিউটনের প্রিন্সিপিয়া শিক্ষা করেন এবং জর্জ এভারেস্টের অধীনে ত্রিকোণ মিতিভিত্তিক জরিপ বিভাগে প্রথম ভারতীয়রূপে কর্মগ্রহণ করেন। ১৮৫২ সালে পৃথিবীর উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ হিসেবে হিমালয়ের এভারেস্ট শৃঙ্গের আবিষ্কার করেন এবং ঐ বৎসরই চিফ্‌ কম্পিউটার পদের সঙ্গে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ অফিসে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হিসা'ব নিযুক্ত হন। ইয়ং বেঙ্গলের অন্যান্য সদস্যদের মত তিনি শিক্ষাবিস্তারের গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন। কারিগরী শিক্ষার বিস্তার সম্পর্কে তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল। নারীমুক্তির উপায় হিসাবে নারীশিক্ষার উপরেও তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে তিনি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। হিন্দুধর্মের নানা কুসংস্কার, রীতি ও প্রথার বিরুদ্ধে তিনি নানাসময় প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি কিশোরীচাঁদ মিত্রের সুহৃদসমিতিব একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন। রাধানাথ শোষণ ও অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছেন। ১৮৭০ সালের ১৭ই মে চন্দননগরে তাঁর মৃত্যু হয়।

রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩—১৮৯৮)

নদীয়া জেলার বারুইহুদা গ্রামে ১৮১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে রামতনু জন্মগ্রহণ করেন। ১৮২৬ সালে কলকাতায় এসে প্রথমে হেয়ার সাহেবের স্কুলে, পরে হিন্দু কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করেন। হিন্দু কলেজেই তিনি শিক্ষাগুরু হিসাবে ডিরোজিওকে লাভ করেন এবং তাঁর চিন্তায় ও কর্মে শিক্ষাগুরুর প্রভাব সংক্রামিত হয়। ১৮৩৩ সালে হিন্দুকলেজে নিম্নতম শিক্ষকের কর্মগ্রহণ করেন। ১৮৫১ সাল থেকে তিনি বর্ধমান উত্তরপাড়া বরিশাল প্রভৃতি জেলা স্কুলে প্রধান শিক্ষক রূপে কাজ গ্রহণ করেন। রামতনু দেশের মানসিক জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই মানসিক জাগরণের উপায় হিসাবে তিনি আধুনিক শিক্ষাবিস্তার, নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তি, সামাজিক সংস্কারের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। রামতনু বিধবাবিবাহের সমর্থক ছিলেন, জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতাকে অপরাধ বলে মনে করতেন এবং যুক্তিহীন প্রাচীন বিশ্বাস এবং প্রথাগুলির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও আক্রমণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন।

দ্রঃ

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। শিবনাথ শাস্ত্রী

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা। যোগেশচন্দ্র বাগল

মুক্তির সন্ধানে ভারত। যোগেশচন্দ্র বাগল

Twelve Men of Bengal in the Nineteenth Century. F. B. Bradly—Birt.

শিক্ষকতা করার সময় যুক্তিবোধে ছাত্রদের জাগ্রত করার চেষ্টাও তিনি করতেন। ১৮৭৬ সালে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হবার পরেই রামতনু রাজনীতি বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৮৮৬ সালে প্রথম জাতীয় অধিবেশনে উদ্বোধনী সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন। ১৮৯৮ সালের ১৮ই আগস্ট রামতনু লাহিড়ীর মৃত্যু হয়।

শ্যামাচরণ শর্মা সরকার (১৮১৪—১৮৮২)

১৮১৪ সালের ২০শে মার্চ নদীয়ায় হরনারায়ণ সরকারের পুত্র শ্যামাচরণ জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দি, উর্দু, সংস্কৃত, ইংরেজী, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষায় তিনি অত্যন্ত নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজে কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর সদর দেওয়ানী আদালতে তিনি নিযুক্ত হন। ১৮৫০ সালে লর্ড ডালহৌসী তাকে প্রধান ইংরেজী অনুবাদক হিসেবে নিযুক্ত করেন। ১৮৭২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক হন তিনি। শিক্ষাবিস্তারে তাঁর আগ্রহ ছিল। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে দেশীয় ভাষার উপরে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী এবং সুরেন্দ্রনাথের মত শ্যামাচরণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠনের গুরুত্ব অনুভব করেন। ১৮৭৬ সালের ২৬শে জুলাই 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে'র উদ্বোধনী সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৮৮২ সালে ১৪ই জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়।

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪—১৮৮৩)

রামনারায়ণ মিত্রের পুত্র প্যারীচাঁদ ১৮১৪ সালের ২২শে জুলাই কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজের ছাত্র হিসাবে তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৮৩৫ সালে তিনি কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান হন এবং পরে সেক্রেটারী ও কিউরেটর পদে উন্নীত হন। অল্প কিছুদিন পরে চাকুরী পরিত্যাগ করে ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন। দেশের নানা সভা-সমিতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। শিক্ষাবিস্তার এবং সামাজিক সংস্কারে তিনি মনোনিবেশ করেন। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি পুরাতন রীতি ও প্রথার বিরুদ্ধে নানা পত্র-পত্রিকায় তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। দেশে কৃষিশিক্ষার

দ্রঃ

শ্যামাচরণ সরকার (সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ২৬ নং)। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহাত্মা শ্যামাচরণ সরকারের জীবনচরিত। বেচারাম চট্টোপাধ্যায়

A General Biography of Bengal Celebrities (Vol. I). R. G. Sanyal.

History of political Thought. Dr. B. B. Majumdar

Bengal Under the Lieutenant Governors (part II). C. E. Buckland.

বিস্তারেও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে তিনি 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস এবং অন্যান্য নানা গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলার রাজনৈতিক চেতনার ইতিহাসেও তাঁর অবদান স্মরণীয়। 'জ্ঞানান্বেষণ' 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড', 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় প্যারীচাঁদ রচিত নানা প্রবন্ধে ভারতীয়দের ক্ষোভ বেদনা প্রতিফলিত হয়েছে। প্রশাসনিক ও অন্যান্য পদে ভারতীয়দের নিয়োগের ব্যাপারে তিনি সোচ্চার ছিলেন। সিভিল সার্ভিসেও অধিক ভারতীয়ের নিয়োগের দাবি তিনি করেছিলেন। প্যারীচাঁদ দেশের কৃষকদের অধিকারকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। দেশীয় জমিদার এবং নীলকরদের কৃষক শোষণেরও তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন। কৃষক-দের সুবিচারের জন্য গ্রাম্য পঞ্চায়েতের পুনঃ প্রবর্তন প্যারীচাঁদ প্রত্যাশা করেছিলেন। ১৮৮৩ সালের ২৩শে নভেম্বর প্যারীচাঁদ মৃত্যুবরণ করেন।

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪—১৮৭৮)

পরমানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র দক্ষিণারঞ্জন ১৮১৪ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর ছাত্র ছিলেন। এ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশনের সক্রিয় সদস্য। কলকাতার কালেক্টর হিসেবে প্রথম চাকুরি, পরে ত্রিপুরার মহারাজার সেক্রেটারী, মুর্শিদাবাদের নবাবের দেওয়ান নিজামত, ১৮৫৯ সালে শঙ্করপুরের তালুকদার। ১৮৭১ সালে সরকার তাঁকে 'রাজা' উপাধি দেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রবক্তা। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার উৎসাহী সভ্য। বৃটিশ শাসনের সমালোচক। বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি ও বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সঙ্গে সংযুক্ত। নারীশিক্ষার প্রবক্তা। ১৮৭৮ সালের ১৫ই জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়।

রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫—১৮৬৮)

১৮১৫ সালে হুগলীতে জন্ম। সারবোর্ণ স্কুল ও হিন্দু কলেজে শিক্ষা। এ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশনের সক্রিয় সদস্য। মিঃ য়োশেপের সহকারী হিসেবে কর্মজীবন শুরু, পরে ১৮৪৮ সালে নিজস্ব ফার্ম। শিক্ষা প্রসারের প্রবক্তা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অন্যতম উদ্যোগী। 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বেঙ্গল স্পেক্টেটরের নিয়মিত লেখক। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি ও বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্য। সুবক্তা। সরকারী চাকুরিনীতির সমালোচক। আইনের ক্ষেত্রে সাম্যের প্রবক্তা। 'ব্ল্যাক অ্যাক্ট'

দ্র.

প্যারীচাঁদ মিত্র। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

Freedom Movement in Bengal. History of political thought. Dr. B. B. Majumdar.

Reminiscences and Anecdotes of Great Men of India (part I) R. G. Sanyal.

রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। মন্মথনাথ ঘোষ।

সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২য় খণ্ড)। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আন্দোলনের বিরুদ্ধে পুস্তিকা রচনা। ইংল্যাণ্ডে ভারতবাসীর অভিযোগ উত্থাপনের জন্য মঞ্চ স্থাপনের পরিকল্পনা। ১৮৬৮ সালের ২৫শে জানুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।

দিগম্বর মিত্র (১৮১৭– ১৮৭৯)

শিবচন্দ্র মিত্রের পুত্র দিগম্বর ১৮১৭ সালে কোন্নগরে জন্মগ্রহণ করেন। হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজে শিক্ষা। ডিরোজিওর ছাত্র। শিক্ষকতা, কেরানি-গিরি, তহশীলদারি, ব্যবসা নানাবিধ জীবিকা তিনি গ্রহণ করেন। পরে ধনী জমিদার হন। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদক ছিলেন, লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য ও কলকাতার শেরিফ হন। সরকার তাকে 'রাজা' উপাধি দেন। আইনের ক্ষেত্রে সাম্যের প্রবক্তা। জনগণের উপর থেকে করের বোঝা কমানোর জন্য আন্দোলন করেন। ১৮৭৯ সালের ২০শে এপ্রিল তাঁর মৃত্যু হয়।

দ্র.

Freedom Movement in Bengal. p 107-110

History of political thought. Dr. B. B. Majumdar

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা। যোগেশচন্দ্র বাগল।

A General Biography of Bengal Celebrities (Vol I). R. G. Sanyal.

Journalism in Bengal (Journal of the Bengal Academy of Lit. I, No. 6, 6 Jan. 1894). Nobogopal Mitra.

আত্মচরিত। রাজনারায়ণ বসু

Speeches of Ram Gopaul Ghose—His pamphlet on the Black Acts—and Minutes on Education together with a short account of his life (published by charu chandra Mitra, cal. 1868)

Speeches of Babu Ramgopal Ghose, with a biographical sketch and likenes. Amritlal Basu.

Public Speeches of the late Babu Ramgopal Ghose and his remarks on the Black Acts (Valmiki press, cal 1871)

Reminiscences and Anecdotes of Great Men of India (part I). R. G. Sanyal.

Life of Raja Digumbar Mitra. Bholanath chandra.

Bengal Under the Lieutenant Governors (vol. II). C. E. Buckland.

রমাপ্রসাদ রায় (১৮১৭—১৮৬২)

রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদ ১৮১৭ সালের জুলাই মাসে জন্মগ্রহণ করেন। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান স্কুল ও হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৩৮ সালে ডেপুটি কালেক্টর হন। ১৮৪৫ থেকে সদর দেওয়ানি কোর্টে ওকালতি শুরু করেন। লর্ড ডালহৌসী তাঁকে সরকারী উকিল মনোনীত করেন। ১৮৬২ সালে বাংলার লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে নির্বাচিত হন ও ঐ একই বৎসরে হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় জজ হন। ১৮৩২ সালে 'সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা'র সভাপতি হন এবং বাংলা ব্যবহারের সমৃদ্ধি ঘটাবার চেষ্টা করেন। 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। স্ত্রী স্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষারও প্রবক্তা। বিধবা বিবাহ আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে যোগ দেন। ১৮৬২ সালের ১লা আগস্ট তাঁর মৃত্যু হয়।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭—১৮৫৮)

রামধন চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র মদনমোহন নদীয়া জেলার বিল্বগ্রামে ১৮১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত কলেজের তিনি কৃতী ছাত্র ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন তাঁর সতীর্থ। হিন্দু কলেজ পাঠশালা, সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠানে মদনমোহন শিক্ষকতা করেন। মদনমোহন নারীশিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ করেছিলেন। ১৮৪৯ সালে হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের পর থেকে তিনি নিজ কন্যাদ্বয়কে ঐ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন এবং ছাত্রীদের বিনা বেতনে শিক্ষা দিয়ে, শিশুপাঠ্যপুস্তক রচনা করে বেথুন সাহেবকে নানাভাবে সাহায্য করেন। স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে রক্ষণশীল মনোভাবের প্রতিবাদ করে তিনি 'সর্বশুভকরী' পত্রিকায় একটি চাঞ্চল্যকর প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। ১৮৫৮ সালের ৯ই মার্চ কান্দীতে তাঁর মৃত্যু হয়।

রাজেন্দ্র দত্ত (১৮১৮—১৮৮৯)

বৌবাজারের বিখ্যাত জমিদার অক্রূর দত্তের পৌত্র রাজেন্দ্র দত্ত ১৮১৮ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ডেভিড হেয়ারের স্কুল এবং হিন্দু কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন। ডিরোজিওর প্রভাবে তাঁর মনে যুক্তিবাদী চিন্তা জাগ্রত হয়। কলকাতা মেডিকেল কলেজেও তিনি কিছুদিন পড়াশুনা করেন। রাজেন্দ্র দত্ত শিক্ষাবিস্তারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন এবং জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। ১৮৮৯ সালে ৫ই জুন তাঁর মৃত্যু হয়।

দ্র.

Freedom Movement in Bengal

সেকালের লোক। মন্মথনাথ ঘোষ।

মদনমোহন তর্কালংকার (সাহিত্যসাধক চরিতমালা—১৩ নং)। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুরাতন প্রসঙ্গ। বিপিনবিহারী গুপ্ত

সরল বাংলা অভিধান। সুবলচন্দ্র মিত্র

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—(১৮১৯—১৮৮৬)

১৮১৯ সালের এপ্রিলে চাংড়িপোতায় দ্বারকানাথের জন্ম। শিক্ষা সংস্কৃত কলেজে। বরাবর কৃতি ছাত্র। কিছুদিন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে শিক্ষকতার পর সংস্কৃত কলেজে আসেন, বিদ্যাসাগরের সহকারী হিসেবে কিছুদিন ছিলেন। পরে সাহিত্যের অধ্যাপক। বিখ্যাত 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রবক্তা। 'কল্পদ্রুম' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর মতে ইংল্যাণ্ডের মত 'Mixed Constitution' সরকারের আদর্শ রূপ। আইন ও প্রশাসনের পৃথকীকরণের প্রবক্তা। বিলাতে ভারতের সঠিক বক্তব্য উত্থাপনের জন্য ৩ জন প্রতিনিধি পাঠাবার চেষ্টা করেন। বাণিজ্য ও অন্যবিধ ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তিনি। গণশিক্ষার প্রবক্তা। ১৮৮৬ সালের ২৩শে আগস্ট জব্বলপুরে তাঁর মৃত্যু হয়।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত (১৮২০—১৮৬৭)

সদাশিব পণ্ডিতের পুত্র শম্ভুনাথ ১৮২০ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে তিনি কাকার কাছে মানুষ হন। লক্ষ্ণৌতে উর্দু ও পার্সী শিখতে যান ও ১৪ বছর বয়সে কলকাতায় ফিরে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে ভর্তি হন। ১৮৪১ সালে সদর দেওয়ানী আদালতে মাসিক ২০ টাকা দক্ষিণায় রেকর্ড রক্ষকের চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৮৪৫ সালে রবার্ট বার্লোর অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৪৮ সালে ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৫৩ সালে সরকারের উকিল হন। ১৮৫৫ সালে ২ বছরের জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজের 'Chair of Regulation Law' পদে অধিষ্ঠিত হন। পরে তিনি হাইকোর্টের বিচারক হন। উল্লেখযোগ্য যে তিনিই প্রথম ভারতীয় জজ। বিচারক হিসাবে তাঁর নিরপেক্ষতা ও দক্ষতা সর্বজনবিদিত। আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। শিক্ষাপ্রসার, মাতৃভাষার উন্নতি ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি প্রয়াসী হন। প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক কর্মে অংশগ্রহণ না করলেও বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল।

দ্রঃ

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। শিবনাথ শাস্ত্রী

History of political thought. Dr. B. B. Majumdar.

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (সা. সা চরিতমালা)। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

History of the press in India. S. Natarjan.

সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (২য় খণ্ড)। বিনয় ঘোষ

Dictionary of Indian Biography. C. E. Buckland.

রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২—১৮৯১)

জন্মেঞ্জয় মিত্রের পুত্র রাজেন্দ্রলাল ১৮২২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতার কয়েকটি স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করার পর তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন, কিছুদিন পরে আইন পড়তে শুরু করেন, তারপর সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসী এবং জার্মান ভাষা শিক্ষা করেন। মাত্র ২২ বৎসর বয়সে রাজেন্দ্রলাল বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটির সহসম্পাদক এবং লাইব্রেরীয়ান হন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'সারস্বত সমাজ' প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৮৮৫ সালে এসিয়াটিক সোসাইটির প্রথম বাঙালী সভাপতি নির্বাচিত হন। বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য তাঁর প্রচেষ্টা স্মরণীয়। ১৮৫১ সালে রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রকাশিত হয়। 'সারস্বত সমাজে' ও তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। মাতৃভাষাকে তিনি শিক্ষার প্রধান মাধ্যমরূপে তিনি মনে করতেন। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন'-এর স্তম্ভরূপে দীর্ঘকাল তিনি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কয়েকবার তিনি এই সংগঠনে সহসভাপতি এবং সভাপতি হন। নীলকরদের অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন রাজেন্দ্রলাল। হরিশচন্দ্র মুখার্জীর গুণগ্রাহী বন্ধু ছিলেম তিনি। প্রশাসনিক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে ভারতীয়দের নিয়োগের দাবিতে তিনি উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। ১৮৯১ সালের ২৬শে জুলাই রাজেন্দ্রলাল মৃত্যুবরণ করেন।

কিশোরীচাঁদ মিত্র (১৮২২—১৮৭৩)

১৮২২ সালের ২২শে মে কলকাতায় কিশোরীচাঁদ জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন। ইয়ং বেঙ্গল দলভুক্ত কিশোরী ১৮৪২ সালে ডাফ স্কুলে অবৈতনিক শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। এরপর তিনি লীগাল রেমেব্রান্স অফিসের কেরানী, এসিয়াটিক সোসাইটির সহ সম্পাদক এবং ১৮৪৬ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ করেন। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার উৎসাহী সদস্য ছিলেন। ১৮৪৩ সালে তিনি হিন্দু থিওফিলানথ্রপিক সোসাইটি গঠন করেন।

দ্রঃ

Freedom Movement in India,

Reminiscences and Anecdotes of Great Men of India (part-I) R. G. Sanyal

রাজেন্দ্রলাল মিত্র (সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ৪০ নং)। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র (১ম)। বিনয় ঘোষ

কর্মবীর কিশোরীচাঁদ। মন্মথনাথ ঘোষ

বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি ও বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনেরও সদস্য ছিলেন। শিক্ষা বিস্তারে এবং আইনের ক্ষেত্রে সাম্যপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি একজন উৎসাহী প্রবক্তা ছিলেন। সরকারী চাকুরীতে অধিক সংখ্যক ভারতীয়ের অংশগ্রহণের দাবিও তিনি উত্থাপন করেন। বৃটিশ শাসন সম্পর্কে সমালোচনার দ্বারা তিনি ইংরেজের বিরাগভাজন হন এবং ওয়াকোপের অভিযোগক্রমে ১৮৫৮ সালের ২৮শে অক্টোবর জেলাশাসকের পদ থেকে তাঁকে খারিজ করে দেওয়া হয়। চাকুরি যাবার পর পত্রপত্রিকায় তিনি ভারতের রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে প্রবন্ধ রচনা করতে শুরু করেন। ১৮৫৪ সালে সামাজিক উন্নতি বিধানের জন্য তিনি 'সুহৃদ সমিতি' গঠন করেন। ১৮৭৩ সালের ৬ই আগস্ট তাঁর মৃত্যু হয়।

দুর্গাচরণ লাহা (১৮২২—১৯০২)

প্রাণকৃষ্ণ লাহার পুত্র দুর্গাচরণ ১৮২২ সালের ২৩শে নভেম্বর চুঁচুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজে ইংরাজী শিক্ষালাভ করার পর তিনি পিতার ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। তিনি প্রথম ভারতীয় যিনি কলকাতার পোর্টকমিশনার হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন দুর্গাচরণ হিন্দুমেলার লক্ষ্য ও আদর্শকে সমর্থন করেন এবং ১৮৮৫ সালের শেষদিকে তিনি জাতীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশে জুরীব্যবস্থা রহিত হলে দুর্গাচরণ তার প্রতিবাদ করেন। বাঙ্গালীর ব্যবসায়িক উন্নতির জন্যে তাঁর উদ্যম স্মরণীয়। ১৯০২ সালে দুর্গাচরণের মৃত্যু হয়।

ভোলানাথ চন্দ্র (১৮২২—১৯১০)

রামমোহন চন্দ্রের পুত্র ভোলানাথ ১৮২২ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী এবং পরে হিন্দু কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন। রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্র ভোলানাথ ছাত্র হিসেবে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। জাতীয় শিক্ষাবিস্তারে তাঁর উদ্যম স্মরণীয়। দেশবাসীকে অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভর করার চেষ্টাও তিনি করেন। তাই তিনি ব্যবহারিক শিক্ষার উপরে গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁকে অনেকে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের জনক

দ্রঃ

Bengal under the Lieutenant Governors (vol. II). C. E. Buckland

The Modern History of Indian Chiefs, Rajas, Zamindars (part II). Lok Nath Ghosh.

History of political thought. Dr. B. B. Majumdar

আত্মচরিত। রাজনারায়ণ বসু

মুক্তির সন্ধানে ভারত। যোগেশচন্দ্র বাগল

Twelve Men of Bengal in the Nineteenth Century. F. B. Bradly Birts.

বলে অভিহিত করেন। ১৯১০ সালের ১৭ই জুন ভোলানাথ চন্দ্র মৃত্যুমুখে পতিত হন।

প্যারীচরণ সরকার (১৮২৩—১৮৭৫)

ভৈরবচরণ সরকারের পুত্র প্যারীচাঁদ কলকাতার চোরবাগানে ১৮২৩ সালের ২৩শে জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে হেয়ার স্কুলে এবং পরে হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ছাত্র হিসাবে তিনি অত্যন্ত কৃতী ছিলেন। শিক্ষাসমাপনান্তে প্যারীচরণ শিক্ষকতাবৃত্তি গ্রহণ করেন। তিনি একজন আদর্শ শিক্ষাব্রতী ছিলেন। ডেভিড হেয়ারের মত তিনি শিক্ষার্থীর মানসিক ও নৈতিক বিকাশের উপর গুরুত্ব দিতেন এবং যুক্তিবাদী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করতেন। বৃত্তি শিক্ষার উপরেও তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন যে সামাজিক উন্নতির জন্য স্ত্রীশিক্ষা অপরিহার্য। বেথুন স্কুলে ছাত্রী সংগ্রহের ব্যাপারে প্যারীচরণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। সমাজ সংস্কারেও তিনি অংশ গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনেও তিনি সাহায্য করেন, এবং 'সুরাপান নিবারণী সভা' স্থাপন করেন। ইংরেজী শিক্ষার গুরুত্ব অনুভব করলেও ইংরেজের অন্ধ অনুকরণকে তিনি পছন্দ করতে পারেন নি। হিন্দুমেলার তিনি একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। কর্মরত অবস্থায় ১৮৭৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর প্যারীচরণ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

লালবিহারী দে (১৮২৪—১৮৯৪)

১৮২৪ সালের ১৮ই ডিসেম্বর বর্ধমান জেলায় লালবিহারী দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালায় পড়ার পর কলকাতার ডাফ্ সাহেবের স্কুলে তিনি শিক্ষালাভ করেন এবং পরে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন। কর্মজীবনে তিনি নানা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেছিলেন। খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হলেও স্বাধীনচেতা, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন লালবিহারী ছিলেন স্বদেশপ্রেমিক। দেশবাসীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, গণশিক্ষার প্রসার, মাতৃভাষার উন্নতি প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁর অপরিমিত উৎসাহ ছিল। ১৮৯৪ সালের ২৮শে অক্টোবর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

দ্রঃ

ভোলানাথ চন্দ্র। মন্মথনাথ ঘোষ

Life of Peary Churn Sircar. M. N. Sircar.

প্যারীচরণ সরকার। নবকৃষ্ণ ঘোষ

আত্মচরিত। রাজনারায়ণ বসু

Life of Lal Behari Dey. G. Macpherson.

সেকালের লোক। মন্মথনাথ ঘোষ

কৈলাশচন্দ্র বসু (১৮২৭—১৮৭৮)

হরলাল বসুর পুত্র কৈলাসচন্দ্র ১৮২৭ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ও হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৪৬ সালে এক ইংরেজ কোম্পানীতে কেরানীর চাকুরী লাভ করেন। ১৮৫৪ সালে বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে চাকুরিতে ঢোকেন। ১৮৬০-৬১তে সিভিল ফাইনান্স কমিশনে প্রধান সহকারী, ১৮৬২ সালে রাজস্ব বিভাগের সুপারিণটেনডেণ্ট হন। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে ও দরিদ্র মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে সক্রিয় কার্যক্রম গ্রহণ করেন। ক্রিশ্চান মিশনারী—বিশেষতঃ আলেকজাণ্ডার ডাফের বিরুদ্ধে তিনি প্রবল সমালোচনা করেন। ১৮৪৯-৫১ পর্যন্ত 'দি লিটারারী ক্রনিকল' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে প্রবন্ধ লিখতেন। সরকারী চাকুরিতে অধিক ভারতীয় নিয়োগের আন্দোলনে যোগ দেন। ১৮৭৮ সালের ১৮ই আগস্ট মৃত্যুমুখে পতিত হন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮২৯—১৮৬৯)

১৮২৯ সালে কলকাতার সিমলায় জন্ম। শিক্ষা ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে। ১৬ বছর বয়সে অর্থ বিভাগে কেরানীর চাকুরী গ্রহণ ১৮৫০ সালে কলকাতার মিলিটারী পে একজামিনারের অডিটর নিযুক্ত হন। ২০ বছর বয়সে বেঙ্গল রেকর্ডার পত্রিকা প্রকাশ করেন, ১৮৫৩ সাল থেকে হিন্দু পেট্রিয়টের সঙ্গে জড়িত হন। ১৮৬১ সালে সাপ্তাহিক 'বেঙ্গলি' পত্রিকা প্রকাশ করেন। বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন, বিধবাদের কর্ম সংস্থানের কথাও ভেবেছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় সরকারের শিক্ষা সংকোচনের তীব্র প্রতিবাদ করেন। মিশনারীদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করেন। নীলবিদ্রোহে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। আইনের ক্ষেত্রে বৈষম্যসহ অন্যান্য সরকারী নীতির সমালোচনা করেন। ইংল্যাণ্ডের কাঠামো অনুসারে ভারতে সরকারের কাঠামো গড়ার অভিমত ব্যক্ত করেন। দেশীয়দের উপর শ্বেতাঙ্গদের পীড়ন ও অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেরও সমালোচক। ১৮৬১ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

দ্রঃ

Freedom Movement in Bengal.

Life of Girish Chunder Ghosh. Manmath Nath Ghosh.

Selections from the writings of Girish Chundra Ghosh. edited by Manmath Nath Ghosh.

দ্বারকানাথ মিত্র (১৮৩৩—১৮৭৪)

১৮৩৩ সালে ২৪ পরগণা জেলায় দ্বারকানাথের জন্ম। হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল, হুগলী কলেজিয়েট স্কুল ও হুগলী কলেজে তাঁর শিক্ষা। কৃতি ছাত্র। ১৮৫৬ সালে উকিল হিসাবে সদর দেওয়ানী আদালতে যোগদান করেন, সেখানে শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও রমাপ্রসাদ রায়ের সংস্রবে আসেন। স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষ। হাইকোর্টের জজ হিসেবে কর্মরত অবস্থায় নিরপেক্ষতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। শ্বেতাঙ্গদের বশংবদ হন নি। হরিশচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। রায়তদের বন্ধু ছিলেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক সংঘ স্থাপনের পরিকল্পনা করেন বেঙ্গল এসোসিয়েশন নামে। দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানবুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলার জন্য চেষ্টিত। ১৮৭৪ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি মৃত্যু।

কৃষ্ণদাস পাল (১৮৩৮—১৮৮৪)

ঈশ্বরচন্দ্র পালের পুত্র কৃষ্ণদাস ১৮৩৮ সালের এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। গৌরমোহন আঢ্যের স্কুল, হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে তিনি শিক্ষালাভ করেন। ১৮৫৬ সালে তিনি আলিপুর জজের আদালতে অনুবাদকের কাজ করেন, ১৮৫৮ সালে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে' সহকারী সম্পাদকের পদ লাভ করেন। হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তিনি 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদনা করেন। ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন তিনি। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, আইনের ক্ষেত্রে সাম্য ইত্যাদিরও তিনি প্রবক্তা ছিলেন। রাজনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি-শীল হলেও জমিদার গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি যত্নবান ছিলেন। ১৮৮৪ সালের ২৪শে জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়।

দ্রঃ

History of political thought. B. B. Majumdar

Life of the Justice Dwaraka Nath Mitter. Dinbandhu Sanyal.

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনী। কালীপ্রসন্ন দত্ত।

Dwarakath Mitter. A Biography (Calcutta Review. Vol. 132, January 1911). Shumboo Chunder Dey.

A Nation in making. Surendra Nath Banerjee.

The life of Hon'ble Rai Kristo Das Pal Bahadur. R. G. Sanyal.

Kristo Das Pal. N. N. Gosh.

Speeches and minutes of the Hon'ble Kristo Das Pal.

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৩৯—১৮৯৪)

মথুরমোহন মুখোপাধ্যায় নামক খ্যাতনামা ব্যবসায়ীর পুত্র শম্ভুচন্দ্র ১৮৩৯ সালে বরানগরে জন্মগ্রহণ করেন। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ও হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ইংরেজী ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। কলেজে থাকার সময় কৃষ্ণদাস পালের সঙ্গে ক্যালকাটা মান্থলি ম্যাগাজিন প্রকাশ করেন।। পরে 'মর্নিং ক্রনিকল' ও 'হিন্দু ইনটেলিজেন্সারে' সাংবাদিকতার শিক্ষা নেন। 'হিন্দু পেট্রিয়টের'ও বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। ১৮৬১ সালের ফেব্রুয়ারিতে 'মুখার্জীস ম্যাগাজিন' পত্রিকা শুরু করেন।—এই পত্রিকা ১৮৮২ সালে সাপ্তাহিক 'রইস ও রায়তের' সঙ্গে একীভূত হয়। কর্মজীবন তাঁর বিচিত্র। কিছুদিন ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমির প্রধান শিক্ষক ছিলেন, পরে মুর্শিদাবাদের বাংলার নাজিমের দেওয়ান—কাশীপুর রাজার সচিব—রামপুরের নবাবের ব্যক্তিগত সচিব ও ত্রিপুরার মহারাজার মন্ত্রী হিসাবে কাজ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের উপর তাঁর এক পুস্তিকা লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। ১৮৬০ সালে আয়কর সম্বন্ধে অনুরূপ পুস্তিকা রচনা করেন। ১৮৭৫ সালে তাঁর প্রবন্ধ "The Baroda Coup detat ; The Empire is peace" প্রবন্ধ আলোড়ন সৃষ্টি করে। বাঙালী যুবকদের বেকারী ও দুর্দশা তাঁকে ভাবিত করেছিল এবং এর জন্যই ১৮৭৫ সালে শিশির ঘোষ, নরেন্দ্র সেনের সঙ্গে ইণ্ডিয়ান লীগ স্থাপন করেন। ১৮৮৩ সালে ইলবার্ট বিল সম্বন্ধেও তাঁর সক্রিয়তা দেখা যায়। শম্ভুচন্দ্র অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান ঐক্যের তিনি একজন প্রবক্তা ছিলেন। নবাব আবদুল লতিফ বাহাদুরসহ তাঁর বহু মুসলমান বন্ধু ছিলেন। হোমিওপ্যাথী বিদ্যায় তাঁর গবেষণার জন্য আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টর ডিগ্রি দেয়। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে তিনি ছিলেন, "A de facto Doctor of Literature and a profound observer and judge of men." ১৮৯৪ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

দ্র.

An Indian Journalist, Being the life, Letters and correspondence of Dr. Sambhu Chundra Mookerjee. F. H. Skrine.

Reminisences and Anecdotes of greatmen of India. R. G. Sanyal.

History of political thought. Dr. B. B. Majamdar.

Letters of K. D. Pal to S. C. Mookerjee (Secretary's notes by S C. Sanial, Bengal past and present, Vol. IX, July—Dec. 1914)

স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে (১৮০৬—১৯০১)

ইওয়েলের টমাস হ্যালিডের পুত্র। জন্ম ১৮০৬। সেণ্ট পলস স্কুল ও হ্যালিবারিতে শিক্ষালাভ করেন। ১৮২৫ সালের জুন মাসে বাংলাদেশে আসেন। ১৮৩৬ সালে রাজস্ববিভাগের সদর বোর্ডের সেক্রেটারী, ১৮৩৮ সালে বাংলা সরকারের সেক্রেটারী, ১৮৪২ সালে ভারত সরকারের কার্যকরী সেক্রেটারী ১৮৪৯ সালে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রবিভাগের সেক্রেটারী হন। ১৮৫৪—১৮৫৯ পর্যন্ত ইনি ছিলেন বাংলার প্রথম লেফটেনাণ্ট গবর্নর। সিপাহি-বিদ্রোহ দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর সম্পর্কে লর্ডডালহাউসীর অশেষ শ্রদ্ধা ছিল। লর্ড ক্যানিং এর উপর তাঁর গভীর প্রভাব ছিল। লর্ড ক্যানিং তাঁকে বলতেন—'right hand of the Government'। সিপাহী-বিদ্রোহে বিশেষ ভূমিকার জন্য পার্লামেণ্টেরও প্রশংসা লাভ করেন

স্যার সিসিল বীডন (১৮১৬—১৮৮০)

বাথ ও ওয়েলসের বিশপ ড. বীডনের প্রপৌত্র, রিচার্ড বীডনের পুত্র সিসিল বীডন ১৮১৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। হ্যালিবারিতে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৩৬ সালে ভারতে আসেন। ১৮৪৩ সালে বাংলা সরকারের আণ্ডার সেক্রেটারী, ১৮৪৭ সালে রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী ও ভারতীয় ডাক বিভাগের কমিশনের সদস্য. ১৮৫২ সালে বাংলা সরকারের সেক্রেটারী, ১৮৫৪ সালে ভারতসরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী, ১৮৬০—২ সালের সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্য, ১৮৬২ সালের এপ্রিল থেকে ১৮৬৭ সালের এপ্রিল পর্যন্ত বাংলার লেফটেনাণ্ট গবর্ণর ছিলেন। ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে তাঁর পরিচালনা দক্ষতা সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা হয়। ১৮৮০ সালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আর্থার গ্রোট (১৮১৪—১৮৮৬)

জর্জ গ্রোটের পুত্র ও ঐতিহাসিক জর্জ গ্রোটের ভ্রাতা আর্থারগ্রোট ১৮১৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন ও হ্যালিবারিতে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৩৩ সালে বাংলাদেশে আসেন। ১৮৬১ সালের মধ্যে কলকাতার কমিশনার ও রাজস্ব বিভাগের সদস্য হন। ১৮৫৯—৬২ সাল পর্যন্ত ইনি বাংলার এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। ১৮৬৮ সালে তিনি ভারত ত্যাগ করেন। উদ্ভিদবিদ্যা এবং ইতিহাস সম্পর্ক গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৮৬ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

দ্র.
Dictionary of Indian Biography. C. E. Buckland.